বাংলার
জীবন ও জীবিকা

(প্রথম পর্ব)

আব্দুল জব্বার

বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ৭০০০৯

নিবেদন

জীবনের পথ চলতে নানান সমস্যা-সংঘাত আসে, তবু বহমান নদীর মতো মেশে সাগরে। এসব লেখায় ক্ষুদ্রতার গন্ডি থাকলেও নিবিড় পরিচয় — স্মৃতিকে আয়নায় করে রাখে উজ্জ্বল। বৃহৎ পটভূমিকার সাহিত্যকীর্তির পিছনে রচয়িতা থাকেন আড়ালে — এসব লেখায় কিন্তু হাতে হাতে বন্ধু-আত্মীয়ের মতো।

'পল্লীর পদাবলী', 'গ্রাম গঞ্জের পথে পথে' , 'মানুষের ঠিকানা', 'বাংলার জীবন ও জীবিকা' পর্যায়ভূক্ত এইসব লেখায় লেখকের জীবন কোথাও প্রচ্ছন্ন নেই।

মানুষের মনন নিবেদনের চাইতে তাই এসব অমর স্বাক্ষর — রক্তকালির আঁচড়। মানুষের দুঃখ-বেদনা এতে অকপটে ব্যক্ত হয়েছে।

পৃথিবীর বুকে এসেছিলাম, আবার চলে যাব, সমুদ্র বেলায় কত ঝিনুক-কড়ি কুড়িয়ে ছিলাম তার ঝোলা আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। হয়তো তার কোনো মূল্য নেই — হয়তো অনেক।

পটভূমির এই ময়ূরপেখম পাঠক-পাঠিকাদের জন্য।

আব্দুল জব্বার

সাতগাছিয়া
নোদাখালি,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বাংলার চালচিত্র
বাংলার চালচিত্র (দ্বিতীয় পর্ব)
বাংলার চালচিত্র (উত্তর পর্ব)
ইলিশমালির চর
মুখের মেলা
অশান্ত ঝিলম
গন্ডির বাইরে
বদর বাউল
কনকচূড়া
রাতপাখির ডাক

চরম ঠাঁই চব্বিশ পরগণা ঃ কতটুকু এগিয়েছে তার হিসাব নিকাশ

ছত্রিশ বছরের স্বাধীনতা পুরুষ কতখানি শক্তসমর্থ বা স্বাবলম্বী হয়েছে দেশের একটি আঞ্চলিক চিত্র দেখলে তার সার্বিক রূপ পাওয়া যায় না — বিশেষ করে কেন্দ্রের কাছ থেকে অধিক ক্ষমতা চাওয়া বামফ্রন্টের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের হৃৎপিন্ড কলকাতা যে চব্বিশ পরগণা জেলাটির বুকে বসে আছে তার চেহারা। চেহারায় তার দারিদ্র্য মালিন্য যেমন প্রকট তেমনি কিছু কিছু জৌলুস ফুটে উঠেছে। বাদুরিযা, নৈহাটি, ব্যারাকপুর, বারাসাত, হাড়োয়া, বসিরহাট, হাসনাবাদ, গোসাবা, ক্যানিং, বারুইপুর, সোনারপুর, বজবজ, ফলতা, ডায়মন্ডহারবার, লক্ষীকান্তপুর, সন্দেশখালি, পাথরপ্রতিমা, মন্দিরবাজার, কাকদ্বীপ, কুলপী, কুলতলী, সাগরদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি সর্বত্র থানা-গঞ্জ-উপশহর এলাকা ছাড়া গ্রামের বাড়িগুলোর মধ্যে শতকরা কাঁচা মেটে বাড়ির সংখ্যা এখনো প্রায় আশিভাগ। রাজধানীর ধমনী থেকে শিরা-উপশিরার মতো যেসব প্রধান রেলপথ বা সড়ক ছড়িয়ে পড়েছে তাতে প্রতিদিন যাতায়াতকারী ট্রেন বা বাস-মিনিবাসের যাত্রীরা এখনো বেশির ভাগ ময়লা আড়ময়লা সূতোর ধুতি -লুঙ্গি-চাদর-শাড়ি পরা খালি পায়ের মানুষও বিরল নয় এবং ভিখারীর সংখ্যাও প্রচুর। অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত গ্রামবাসীরা কাঁচা আনাজ-ফল-ফসল-মাছ—ডাব-নারকেল হাজার রকমের জিনিস নিয়ে কলকাতায় যায়। বহুলোক যায় অফিস আদালত বা কল-কারখানা চালাতে। শতকরা দুতিন জন অফিসের বাবু বা কেরানী। পাঁচ হাজারের মধ্যে একজন অফিসার বা বড়বাবু। দশ হাজারের মধ্যে একজন অধ্যাপক বা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যে যান্ত্রিক সভ্যতা আলোক -স্বয়ম্বর হয়ে উঠেছে দেশে-বিদেশে বা তাদের রাজধানী শহরগুলোয়, তার ছিটে-ফোঁটা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামগঞ্জের বাবু-সাহেবদের বাড়িতে বা ব্যবসায়ী টাটে। কিন্তু অধিকাংশ মাটির ঘরে এখনো অন্নচিন্তা চমৎকার, দাবায় বা দরজা-দলিজে কেরোসিনের কুপী-লণ্ঠন-হ্যারিকেন জ্বলে। চারিদিকে বাঁশবন, নারকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল, নিম, বেল, তালের জঙ্গল। মাঝে মাঝে উদোম ঢাকা ধানের ক্ষেত। কয়েক কিলোমিটার দুরে দুরে লৌহচূড়বাহী বৈদুতিকীকরণ ব্যবস্থা। বাস থেকে নেমে পড়ে রিক্সায় বা হেঁটে গ্রামের মধ্যে আসুন, দেখবেন বাঁশের বেঞ্চি পোঁতা মলিন দরিদ্র চা দোকান, মুদিখানা, প্রাইমারী স্কুল, তিন চার মাস জল-না-ওঠা বেকল টিউবঅয়েল, বাঁশের টাটিতে ধান আছড়াচ্ছে 'দশ টাকা রোজ দিতে হবে' বলে জোট বাঁধা ক্ষেতমজুররা। কুমোড় পাড়ার চাকা ঘুরছে না — জাত-ব্যবসা তুলে দিয়ে

বজবজ-বিড়লাপুর কিংবা নৈহাটি কাদাপাড়া, নারকেল-ডাঙ্গা, ইছাপুরের চটকল সূতোর কলে চলে গেছে বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা কাঁচা টাকার প্রয়োজনে চাকরি করতে। শীর্ণ গরু, বাছুর, বিশীর্ণ মানুষ। পৌন্ড ক্ষত্রিয়, নমঃশুদ্র, পদ্মরাজ পাড়ায় গোপন চোলাই মদের অঢেল ব্যবস্থা, কোথাও বা পোলট্রির মুরগীদের করকর শব্দ। মিহি মহাজালে পুকুর ডোবা থেকে বীজ ফেলে বড় করে চারা পোনা ছেঁকে তুলে চালান করা হচ্ছে শহরে। ইন্দিরা প্রয়াণে শুকনো লঙ্কা হয়ে গেছে তিরিশ টাকা, হলুদ কুড়ি, আলু তিন টাকা। কদিন সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গেল — এমন ঘটনার নজির নেই। তখন সবে ধানের বুকে ক্ষীর জমেছে। রাজীব গান্ধী আসতে সেই ধানের গায়ে লেগেছে সোনার রঙ। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে দেয়ালে গাছের গায়ে পড়ে গেল পোস্টার — লোকসভার ভোট। কাস্তে হাতে নিয়ে কৃষকেরা নেমেছে মাঠে মাঠে। ধান কাটা হচ্ছে কচাকচ কচাকচ। মাঠে ধান ফেলে রাখার উপায় নেই, রাতের বেলা পেটের জ্বালায় চুঁচে মেরে দিচ্ছে। বজবজের চটকল বন্ধ আজ তিন মাস। একশো বাহান্ন জন আত্মহত্যা করেছে, তাদের কার্ড জমা পড়েছে মিলে, কাজেই ধান কাটো আর দু একটা রোদ পাইয়ে কাঁচা নল শুকোতে না শুকোতেই তুলে এনে গাদা করে দাও। এমন ফলন বহু বছর হয়নি। ধানবনের মধ্যে দিয়ে ঠেলে এগোনো যেত না, যেন খড়িবন। প্রচুর বর্ষা পেয়ে ধানগাছ বেড়েছে মানুষের মাথা ঝাঁপিয়ে। খড় হবে প্রচুর। কার্তিকে ঝড়-বাদলা হয়নি, পড়ে গিয়ে পচে গলে যায়ও নি। চাষীরা প্রচন্ড বর্ষণে বীজতলা তৈরী করতে পারেনি। অনেকবার বীজতলা করেছিল, সোনাদান বন্ধক দিয়ে বীজতলা কিনে ট্রাকট্ররে জমি চষে যারা রুইতে পেরেছিল তাদের কপাল ফিরেছে। তবে জ্যোতি বসুর সাতগাছিয়া অঞ্চলে যেন ধান ফলেছে তেমনটা আদৌও নয়। সেচমন্ত্রী প্রভাস রায়ের এলাকা পশ্চিম বিষ্ণুপুরে। গোটা বাদা অঞ্চল ডুবে ছিল এক উরু জলের তলায়। বৃদ্ধ অসুস্থ মন্ত্রীমশায় প্রায় বছরের পর বছর থাকেন হাসপাতালে, সেচ ব্যবস্থার সুব্যবস্থার বদলে বরং ডি. ভি. সি-র জলের চাপ আসতে লাগল। হুগলী নদী দিয়ে চড়িয়াল-পূজালী খ্যাংরা মুড়ির খাল বেয়ে পরাশর। বড় কাছারী, রসপূঞ্জীর বাদাতে। যারা হাঁটু জলে ধান রুইল কাঁকড়ায় কেটে ভাসিয়ে দিল সব গোছ, অথবা 'ডব্‌কে' গেল জলের তলায়।

পোলট্রির ডিম সাজিয়ে নিয়ে সাইকেলে করে শহর উপশহরের হাসপাতালে যোগান দিতে যাচ্ছে বেকার শিক্ষিত যুবকরা। তবু গ্রামের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে ঝোঁড়া কাঁখে নিয়ে এখনো দেশী মুরগীর ডিম সঞ্চয় করে নিতে যাবার কামাই নেই বেওয়া-বালতি মেয়েদের।

চাষীদের কপি-মূলো-পালং ক্ষেতে আগে যেমন তালকাঠের ডোঙ্গায় করে ঢেঁকি কলের মতো বাঁশ বেঁধে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে ডোবা থেকে তোলা পাড়া করতে

হত এখন আর তা নেই, পাম্পিং মেশিন চলছে ফট-ফট শব্দ তুলে। ক্ষেত-মাঠ ভেসে যাচ্ছে জলে। ঢেঁকি উঠে গেছে, এসেছে হাস্কিং মেশিন। চাষীরা সিদ্ধ-শুকনো করা ধান আনছে সাইকেলে বা রিক্সা ভ্যানে। বেশির ভাগ লোকেরই গায়ে জামা আছে, পায়ে হাওয়াই স্যান্ডেল। কামার শালায় এখন প্রচুর কাজ, কাস্তে শানানো হচ্ছে, ধান কাটা, নাড়া কাটার জন্যে। দেড় টাকা প্রতিটি কাস্তে। লাঙ্গল ও আছে দু চারখানা করে। ট্রাক্টর এসে মাঠকে মাঠ চযে দিয়ে যায় কয়েকদিনে — তাই কাঠের লাঙ্গল উঠে যাচ্ছে। বেশি জমি না হলে হালের জোড়া বলদ পোষাও এখন কঠিন ব্যাপার।

করাত কল চলেছে জোর হিস্স্স্স্ শব্দ তুলে। গরুর গাড়ি প্রায় উঠে গেছে, আছে এক আধখানা — বাঁশ নিয়ে যায় বেহালায় — তাই হাওয়াভরা মোটরের চাকাঅলা ঠেলা গাড়িতে চলে চাষীদের তাল, নারকেল, আম, জাম, কাঁঠাল কাঠ করাতকলে। আগে চাষীর বাগানের বহু বছরের পাকা লাল হয়ে ওঠা নিম, কাঁঠাল জাম কাঠ হাতে-টানা-করাতে কেটে ছুতোর ডেকে তক্তাপোষের পায়া, দোর, জানালা তৈরী হত মধ্যবিত্ত চাষী এবং সম্ভ্রান্ত বাড়িতেও, এখন আর তা হয় না, কাঠ চলে যায় স্ব-মিলে, চোরাই কাঠ যায় ছুতোর খানায়, আধুনিক ফ্যাশানের আলমারী, খাট-পালঙ্ক, দরজা, জানলা, চেয়ার, বেঞ্চি তৈরী হয়। তবে, একথাও ঠিক যে স্বাধীনতার পর যাঁরা 'গাছেরও খান তলারও কুড়োন' অর্থাৎ ভাল চাকরি আছে, আছে জমি-জায়গা আর ব্যবসা বাণিজ্য, তাঁদের আসবাস পত্র আসে বউবাজার থেকে, অথবা হয় শাল সেগুনের, আর সেসব বাড়ির ছেলেমেয়েরা গেছেন বিদেশে পড়াশোনা করতে। উঁচু ডিগ্রি এনে কেউ কেউ বা হয়েছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক , কেউ বা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার।

পোলট্রিতে এখন আর টাকা দেওয়া হচ্ছে না। কারণ আগে যেসব পোলট্রিতে সাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বা বি ডি ও অফিস টাকা দিয়েছিল সেসব টাকা উদ্ধার করা যায়নি। — পোলট্রিতে নাকি সবই লোকসান গেছে। মৎস্য চাষেও প্রায় ঐরকমই কাছাকাছি অবস্থা। তবে সব গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গ্রামের যুবকদের রিক্সা, ভ্যান দিচ্ছে। করাত কলে টাকা দিচ্ছে। অন্যান্য কুটির শিল্পেও ফ্রন্টের আগেও পাঁচ বছরে কাজ দেখানোর জন্য গ্রামগুলোর প্রায় সমস্ত ছোট ছোট পাড়ার রাস্তাগুলোয় মাটি বা ভাঙ্গা ইঁট পড়েছিল — পরের পাঁচ বছরে বর্ষায় প্রায় তা ধুয়ে গলে বেরিয়ে গিয়ে পড়েছে আবার খালে বিলে, কাঠের কালবুত হয়েছিল, তিন চার বছরেই ভেঙ্গে পড়তে আবার সেরে দেওয়া হয়েছে, মাঝারী ধরনের পুল তৈরী হয়েছে। ইলেকট্রিক লাইন যা কংগ্রেস আমলে পাতা হয়েছিল তা আর বাড়েনি বা তাতে বিদ্যুৎ আসেনি। এলেও রাতের বেলায় ওজন দরে বেচার জন্য চোরে সেসব কেটে নিয়ে গেছে। ঝুলছে হাত দুয়েক করে।

চব্বিশ পরগণার বিরাট সুন্দরবন এলাকায় বজবজ-নামখানা রেললাইন পাতার প্রাথমিক মাপ-জোক-ম্যাপ-বক্তৃতা লেখালিখি অনেক কিছু হবার পরেও কিছুই হল না। বড় বড় জল নিকাশি খাল হবার কথা ছিল হল না। হল না নুনের পিট। তবে আশার কথা ফলতায় আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বন্দর হবার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু হাত মিলিয়ে উদ্বোধন করেছেন। কিন্তু স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ের সাধের সুন্দরবন প্রকল্প এখনো স্বপ্নের জগতেই রয়ে গেল।

চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন এলাকা থেকে যে সুদর্শন গলদা চিংড়ি পঁচাত্তর আশি টাকা কিলো দামে বিদেশে চলে যাচ্ছে, সেখানের সাধারণ গরিব গ্রামবাসীরা এখন অনেকেই শামুক, গুগলী, কুঁচো চিংড়ি আর ধেনো মদ খেয়ে দিন কাটায় — ভাত জোটে না তাদের কপালে রোজ দু-বেলা। রেশনে ক / খ শ্রেণীর লোকেরা যে চাল গম পায়, অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর আর পরিমাণেও তা ইঁদুরের খাদ্য।

তবে এই নৈরাশ্যের মধ্যেও পাকাবাড়ি উঠছে। সাগর দ্বীপের সোজাসুজি পূর্বদিকটা পাথরপ্রতিমা, কুলতলী, মোল্লাখালী, গোসাবার দক্ষিনাংশে এখনো মাটির কুঁড়েঘরের ছাউনি বা চাল প্রায় মাটিতে ঠেকে আছে ঝড়ের জন্য, সে ছাউনি খড়ের। বজবজ এলাকায় প্রচুর ইঁটের ভাঁটি টালিখোলার কারখানা। তাই টালির ছাউনিই বেশি এদিকের মানুষদের ঘরদোর।

প্রত্যেক গ্রামের বিত্তবানদের দু-একজনের বাড়িতে এখন টি.ভি এসে গেছে; অবশ্য যেখানে বিদুৎ পৌঁছেছে। বিড়লাপুরে — জ্যোতি বসুর এলাকার মধ্যে — প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা টি.ভি আছে। আর প্রত্যেক বাড়িতেই আছে রেডিও— সে যত দরিদ্র-ঘরই হোক।

কারখানার মানুষ রোগে পড়লে প্যানেল ডাক্তার আছেন, সাধারণ লোকেরা যায় ছোটোখাটো হাসপাতালে। যদিও রোগীর সংখ্যায় তুলনায় বেড সংখ্যা অতীব নগণ্য। রোগীরা মেঝেয় পড়ে থাকে। আর প্রসবের অন্ত নেই। তাই আরো হাসপাতাল বাড়ানো উচিত।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর গোটা এলাকার মধ্যে কোনো কলেজ নেই। স্কুলও বেশ কম। রাস্তা ঘাটও তেমন কিছু হয়নি।

চব্বিশ পরগণায় অনেক জমি, কলকারখানা, ঘন বসতি, বহিরাগত, এম.এল.এ, মন্ত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, পার্টি, রাজনীতি, থানা-পুলিশ, পঞ্চায়েত, স্টেশন, বাজারগঞ্জ, আদালত, অফিস, অফিসার, নদ-নদী, অরণ্য ইত্যাদি আছে বা আছেন কিন্তু তবু অনেক রোগী বেকার, অশিক্ষিত, ভিখারী, অভাবী মানুষে ভরা এই দখ্নে অভিশপ্ত জেলাটি।

চব্বিশ পরগণায় পাট, ধান, খড়, বাঁশ, ফল, নারকেল, সুপারি, কাঠ, মাছ, সজি, কলাই, চাল অনেক কিছু হয়, অনেক কিছু যায় প্রতিদিন কলকাতা শহরে কিন্তু দুঃখ তার ঘুচছে না। দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের মাথা বিকিয়ে গেছে দেনা আর দুর্দশায়।

দক্ষিণ বাংলায় তাঁতী-জোলা, কামার, কুমোর, জেলে, বারুজীবি, মালী, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, ঘরামী, মৎস্যজীবি, কসাই, বেকারী সবাই মূলত গ্রামের কৃষক, তারা জীবিকার দায়ে কলকারখানায় চলে গেছে। চটকল,তেলের ডিপো, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, অক্সিজেন, এ্যাসিটোলিন্ গ্যাস, কার্পেট, ফাইবার, লুব্রিকেটিং, আইসক্রিম, স্পিনিং ইত্যাদি বহু কারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। বাটা কারখানার জুতো তৈরীর জন্যে আজ ভদ্র শিক্ষিত মানুষদের হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে আছে। চাষে আর মজা নেই, সুখ নেই, অনেক খরচ। সার, কীটনাশক ওষুধ, সেচ-ব্যবস্থা, ট্রাকট্ররে হাল করতে গেলে নগদ কড়ি ফেলতে হয়। তেভাগা আইন পাশ হলেও আধাআধি ধান খড় না দিলে কোন চাষী জমি দেয় না। দশ টাকার ক্ষেতমজুর কাজ না পেয়ে বাধ্য হয়ে পাঁচ টাকা মজুরী খাটে। সাত-আটজনের সংসার তাতে চলে না— তাই মেয়েরাও জনখাটে, পাঁপর ব্যালে, ঠোঙা গড়ে, ঘুঁটে ব্যাচে, কারখানা শ্রমিকের ভাতের ডিস বয়, অনেক তপশিলী আর দরিদ্র মুসলমান বাড়ির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হয় না, তারা — ছুতোর মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি অথবা দর্জির কাজে লেগে যায়। নাবালক শ্রমিকের সংখ্যাও প্রচুর। ধেনো মদ ব্লাডারে ভর্ত্তি করে নিয়ে অনেক মেয়ে বা নাবালক ছেলেরা বাসে ট্রেনে করে চলে যায় শহরের বসতি এলাকায় বা বাবুঘাট, আউটরাম ঘাটে। থানা - পুলিশ হোমগার্ডরা ধরলে লাভের গুড় পিঁপড়েয় মারে। কিছু মেয়ে আবার কলগার্ল হয়ে শহরের সিনেমা, ভিক্টোরিয়া বাগান, ইডেন গার্ডেনসে গিয়ে রোজ কিছু কাঁচা পয়সা রোজগার করে আনে।

সব সংসারেই এখন বিচিত্র মানুষের ভিড়। অভাবে টানাটানিতে একান্নবর্তী বড় সংসার এখন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে — তাই জমি-জিরেতও খুদে খুদে অংশে ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

জমি ফেলে রাখা চলবে না, তিন চাষ দাও, ভারি মোটা গাছপালা থ্রিপিস কাঠের জন্য কাটা হয়ে যাচ্ছে, ফলে জ্বালানী কাঠের অভাব, একশো টাকার বাঁশ এখন এগারোশো টাকা। চাষীর বাড়ি এলে এখন আর মুড়ি-গুড়-নারকেল পাওয়া যায় না — চা বিস্কুট দিয়ে, নমস্কার বাবু আসুন।

চব্বিশ পরগণার একজন ম্যাজিস্ট্রেট, কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এস.ডি.ও, বি.ডি.ও, ও.সি, এম.এল.এ, মন্ত্রী রাতদিন এই জেলার আর্থিক উন্নতির কথা ভাবছেন,

পরিকল্পনা করছেন — উন্নতি হচ্ছেও— কিন্তু গতিটা তার জাত কচ্ছপের মতোই।

চারিত্রিক উন্নতির বদলে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সংখ্যার মতোই ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

তবু আশার কথা, দক্ষিণ বাংলার যেসব কালো কালো মজবুত চেহারার জেলেরা ইঞ্জিনবিহীন কাঠের নৌকা নিয়ে জীবন তুচ্ছ করে বার দরিয়ায় বা বঙ্গোপসাগর ছেড়ে ভারত মহাসাগরে শুটকি মাছ সংগ্রহ করতে যায় মহাজনের পেট ভরানোর জন্য তাদের সাহায্যের কথা বারবার প্রভাস রায় মহাশয় বলেছেন, হয়তো সরকারি ঋণও কিছু কিছু তারা পেয়েছে। কিন্তু এখন জানা গেল একশো জন জেলেকে একশোটা নৌকা দেওয়া হচ্ছে। সে নৌকাগুলো জেলে ডিঙ্গির মতো, একজন বাওয়া শখের শ্যামপান! রায়পুরের জেলেপাড়ায় বাস-করা সি. পি. এম কর্মী মুরারী মুখার্জ্জী জেলা কর্তৃপক্ষকে পরিকল্পনা দিলেন 'নয় পদী' অথবা 'দশ পদী' নৌকা দিতে — তাতে মাছও ধরা যাবে আর অবসর সময়ে ইঁট-কাঠ-বাঁশ-খড় ইত্যাদি মাল বওয়াও যাবে। এক হাজার টাকার নগদ, চার হাজার টাকার দু-বেড় জাল, আর সাত হাজার টাকার নৌকো — এই বারো হাজার টাকার মধ্যে মাঝি মাত্র দশ বা পনেরো বছরে ছ-হাজার টাকা সরকারকে দফায় দফায় শোধ দেবে। কোলাঘাটে সে সব নৌকা তৈরী হচ্ছে। প্রথমে দেওয়া হবে তিরিশজন মাঝিকে। তাদের নাম ফ্রন্টের কর্তারা তৈরী করছেন। যারা নৌকা পাবে বলাই বাহুল্য যে তাদের সংসার স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। জেলে, মালী, রজক, ছুতোর, যে সম্প্রদায়ের লোকই সরাসরি ঋণ পাক, তাকে ক্ষমতায় থাকা পার্টির পতাকাতলে আসতেই হবে। নইলে কোনো করুণা নেই। হয় লাল পথ, নয়তো সাদা — চাষী, শ্রমিক, অধ্যাপক , সাহিত্যিক যাই হোন পথ ঠিক করে নিন! প্রাকৃতিক হাওয়ার আসমান-দোলা লতার মতো স্বেচ্ছাধীনভাবে শূণ্যে দোলার এখন আর উপায় নেই। ভিখারী হলেও তুমি কোন পার্টিকে ভোট দাও তা পার্টির কর্তাদের জানা আছে।

শোলার ফুল আর চাঁদমালা এখন অনেক লোকের রুজি

দোলনায় শুয়ে কচি শিশু ককানি কান্না থামায় মাকে ভুলে হরিদাস বাউলের শোলার ফুল-পাখী দেখে। তার ফোগলা দন্তহীন গালে মিষ্টি হাসি উপচে পড়ে। পাখিরা দোল খায়। নড়ে চড়ে। মাথা নাড়ে। নীল পাখি। লাল পাখি। রাংতার ডানা। কদমফুল দোলে।

স্বাধীনতার আগের শিশুরা শোলার ফুল দেখে মানুষ হয়েছে — পরের যুগে এসেছে প্লাস্টিকের ফুল — বহু বিচিত্র। কিন্তু সুন্দরবনের বাঘ যে শোলার বনে গা ঘষে সেই নাবাল জমির শোলার ফুলের ওপরে টেক্কা মারতে পারেনি এখনো প্লাস্টিকের ফুল। শোলার চাঁদমালা না হলে কোনো পূজো হবে? ঘটভাঁড়ে কিংবা ইতু ঠাকুরের গলায় চড়াবে কোন্ মালা? মনসা ঠাকুরের গলায়? দোলনায় শোলার পাখি নড়া দেখে যে শিশু বড় হয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছে টোপর মাথায় দিয়ে, এখনো যত বড়লোকের বাছাই হও শোলার টোপরই তো পরতে হয়। তবে গরিব লোক হলে একটা টোপর কুড়ি-পচিঁশ টাকা দাম যেমন তেমনি আশি থেকে একশো টাকারও টোপর গড়ে দেন হরিদাস বাউল। আগে অর্ডার দিতে হয়। বরকে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র সাজিয়ে দেবেন তিনি। টোপরে কতরকম নক্শা, কারুকার্য। সোনালী-রুপোলী হীরে- মুক্তোর ঝলমলানি বাহার। বরকে দেখবে না তার মুকুটকে দেখবে? একদিনের রাজার কি সোনার মুকুট হবে? তাও তো পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষ এমন সুন্দর শোলার টোপর তৈরী করবে না ক্ষণস্থায়ী একটা কাজের জন্য মাত্র কিছু টাকার গতর মাটি করে! কে এই টোপর তুলে রাখবে বুড়ো বেলা পর্যন্ত বিবাহ বার্ষিকী পালন করার জন্য? কি হয় টোপরগুলো— বামুনঠাকুর বা নাপিত নিয়ে গিয়ে আবার শোলার ফুলওলার দোকানে বেচে দেন না তো? না,না তা হবে না। একজন পরে বিয়ে করার পর সেই টোপর আর কাজে লাগবে না, অনিয়ম, অশৌচ — বারেক এই নিয়ম ছিল নইলে শোলার কারিগরদের হাঁড়ি শিকেয় উঠত।

শোলার কারিগরদের কাছে অনেক রকমের ছুরি-কাঁচি-ব্লেড-কাঁচ কাগজ থাকে। সারা পশ্চিমবঙ্গের নাবাল নীচু জায়গা থেকে কাঠশোলা কেটে আনে চাষীরা। ধঞ্চে অথবা তেঁতুল গাছের মতো পাতা এর। হলদে ছোট ছোট ফুল ফোটে বর্ষাকালে। ঠাস জঙ্গলের মতো হয় হাঁটু বা কোমর সমান জলে। খানা -ডোবা-বিল-কাদা শুকিয়ে গেলে মূল থেকে বা দানা পড়ে বোশেখ-জষ্টি মাসে চারা গজায়। বর্ষায় জল পেয়ে বেড়ে ওঠে। পাঁচ ছ-হাত থেকে লম্বায় আট -দশ হাত পর্যন্ত হয়। ২৪ পরগণা, হাওড়া,

হুগলী, মেদিনীপুরের নিচু জমিতে কাঠশোলা জন্মায়। হোগলাও জন্মায় এই রকম নিচু জমিতে। শোলা বা হোগলা বনে প্রচুর মাছ থাকে, সাপ-গোসাপ মাছ খাবার লোভে 'আছরা' নেয়। ফুলের মধু নেবার জন্য আসে রাজ্যের মধু-মক্ষিকা আর বুলবুলি টুনটুনি পাখি। শোলার বনে পাখির চিৎকার শুনলে বোঝা যায় তাকে কোন গোখরো বা কাল কেউটে ধরেছে। শীতকালে যখন জল প্রায় শুকিয়ে যায় সোঁদোরবন এলাকার লোকেরা বড়ধারালো কাস্তে বা হেঁসো নিয়ে শালতি ঠেলে শোলা কাটতে যায়। কাঁচা শোলা গাছ কেটে পাঁজা পাঁজা করে কোনো গাছের গোড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে আসা হয়। পাতা ঝরে শুকিয়ে গেলে তড়পা বেঁধে খামারে এনে মাথা ছেঁটে ডালপালা কেটে পাইকেরদের বিক্রি করে দেওয়া হয়। শোলা কাটতে গিয়ে সাপে কেটে বা বাঘের হাতে পড়ে কত মানুষের প্রাণ যায়।

তবু শোলার ফুলের কদর যায় না। শহর নগরের সভ্য মানুষদের সাংস্কৃতিক সভা-সম্মেলনে শোভা বাড়াতে আসে শোলার ফুল।

কি ফুল চাই আপনার ? ম্যাগলোনিয়া, গ্রান্ডি ফ্লোরা, নাইট কুইন, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বেল, বোগনেভিলিয়া, কলাফুল সবই পাবেন।

হরিদাস বাউল কি একা কাজ করছেন? শত শত মানুষ করে খাচ্ছেন এই কুটির শিল্পের দ্বারা। বাংলাদেশের সর্বত্র শোলার ফুলের কদর আছে। হিন্দুরা যতদিন আছে সঙ্গে সঙ্গে আছে তাদের পুজো পার্বণে বিয়ে অনুষ্ঠানে শোলার ফুল। 'বাংলাদেশে' সালুক বা শাপলা ফুল জাতীয় ফুলের মর্যাদা পেলেও শোলার ফুলের মর্যাদার কোনো প্রতীক চিহ্ন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সংস্কৃতিজীবিরা অন্তত দিতে পারতেন। অবশ্য তেত্রিশ কোটি (কোটি সংখ্যক) দেবতার পুজোয় এত ব্যপক এই শোলার ফুল ব্যবহার যে নোটে বা ডাকটিকিটে এর প্রতীক না নিলেও রাগে বা অভিমানে সবুজ শোলার বন শুকিয়ে যাবে।

পুরনো কালের শোলার ফুলের পাকা কারিগররা অহঙ্কার করেন তাঁদের মতো সাত প্যাঁচে একটা গোলাপ বা চন্দ্রমল্লিকা তৈরি করতে পারে না আজকালের ছেলেরা। কিন্তু তারা যে আস্ত একটা শোলার দুর্গা প্রতিমা খাড়া করে দিয়ে হাজার হাজার লোকের ভিড় জমায় তার বেলায় কি? সেই দুর্গা ঠাকুরের ছবি ওঠে খবরের কাগজে, মিউজিয়ামে চলে যায় সেই প্রতিমা, অথবা কোনো বিদেশে।

হাতির দাঁতের মতো ধবধবে সাদা শোলার সরস্বতী স্বর্গলোকে শোভা পাবার মতো করে গড়ে একালের ছেলেরা।

বড় বড় বিকশিত পদ্মফুল নিয়ে গাঁথা চাঁদমালা আপাদমস্তক নামিয়ে না দিলে কোন্ ঠাকুরের শোভা বাড়ে?

এসব তৈরি করছেন গ্রামেগঞ্জে শোলার ফুল ব্যবসায়ীরা রাতদিন ঘাড় গুঁজে বসে ছুরি-কাঁচি চালিয়ে। শোলার ছাল খসিয়ে দিয়ে দরকার মতো একটা ছোট্ট টুকরো করে সুতো দিয়ে মাঝে মাঝে টান দিয়ে কেটে ছেড়ে দিলেই কেমন সুন্দর একটা কদমফুল হয়ে যায় হরিদাস বাউল তার ছোট নাতিটিকে শেখাচ্ছিলেন। ছুরির ডগা দিয়ে হিজিবিজি কেটে তলায় সুতো বেঁধে টান দিলেই যাদুমন্ত্রে হঠাৎ কেমন করে একটা বেলফুল বা গোলাপ ফুল হয়ে যায় তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। হাতঘড়ি ওয়েলিং করতে যান দেখবেন ফুলশোলা দিয়ে যন্ত্রপাতি ঘষছে ঘড়ি মেরামতকারী।

নারকেল ছোবড়ার বোলেনের দাম এখন বেশি বলে কোনো কোনো পানবিড়ির দোকানে শোলার মুখে আগুন লাগিয়ে রাখা হয়েছে। আগুন নিভবে না। একটু ফুঁ দিলেই জমকে উঠবে আগুনটা। (আহা, মুনিঋষিরা যদি ব্যাপারটা আগে জানতেন! চাষী তাহলে তুঁষ-ঘুঁটের আগুন রাখত না প্যাকাটিতে গন্ধক লাগিয়ে আগুন জ্বালানোর জন্যে দেশলাই হবার আগে।)

হরিদাস বাউলের শোলার ফুলের এত নামডাক তবু তাঁর ঠিকানা নেই; পেটে দুবেলা অন্ন নেই। সাতটা শহর থেকে বিদায় হয়ে এসেছেন। পূর্ববাংলার ময়মনসিং জেলার লোক। দেশ ভাগের পর জমি আর পাকাবাড়ি হারিয়ে এসে পড়েছিলেন শিয়ালদায় কুত্তা-ছাগলের মতো। সেখান থেকে মেদিনীপুর শহরে ছিলেন বছর কয়েক। দেনায় ডুবে গেলেন। ন'টা ছেলেমেয়ে। পাঁচটা মেয়ে বিদায় করতেই ফতুর । তারপর শ্রীরামপুরে। সেখানেও দেনা হলো। কাবুলীর দেনা। চক্রাকারে বৃদ্ধির সুদ। হঠাৎ, একরাত্রে এসে উঠলেন বাগনানে। তারপর শিবপুরে, সেখান থেকে একেবারে উত্তর বাংলার কোচবিহারে। এমনি করেই নানান জায়গায় ঠাঁই নাড়া হয়ে চলেছেন। চারটে ছেলে নাকি চার অবতার। বড় দুটো শ্বশুরবাড়ি থাকে। ছোট দুটো বেকার। দুটো মেয়ে তিন চারটে করে বাল-বাচ্চা নিয়ে বিধবা হয়ে এসে তাঁর কাছে উঠেছে। কতবার দোকান হারিয়ে পরের দোকানে কাজ করেছেন। তবে এখন বড় পুজোর সময় আসছে — অনেক কাজ হবে। সেজ ছেলে সুশান্ত সিনেমার অর্ডার এনেছে। সে ঘুরে ঘুরে কলকাতার নানান পুজো প্যান্ডেলের চাঁদমালার অর্ডার আনছে। অনেক কারবারী বাকিতে মাল নিয়ে গিয়ে আর টাকা দেয় না— কাজ ছেড়ে কে আর তাগাদা করে বেড়ায়? ছেলেরা হয়তো আগেই তাগাদা সেরে রেখেছে।

'সরকারি ঋণের জন্য তদ্বির-তদারক করেননি ?'

'অস্থায়ী সরকার, কখন কোন পার্টি আসে — কাকে সমর্থন করি বলুন দেখি?' তাছাড়া টাকা খেয়ে ফেলব। দিতে পারব না। আমি ভবঘুরে লোক, কে আমাকে সমর্থন করবে? হুলিয়া করে ভদ্দরলোকেদের ভুঁড়িওয়ালা সরকার কি আমার পেছনে

পেছনে দৌড়বে?

হরিদাস বাউলের আর একটা গুণ আছে। খুব ভাল ময়মনসিং গীতিকা গাইতে পারেন। অনেক গান তাঁর মুখস্থ। এই গানের বাণীও অসাধারণ।

হরিদাস একটা সুন্দর সাদা গোলাপ দিয়ে বললেন, 'আজকাল আমি একটা স্বপ্ন দেখি : ভাবছি, ইন্দিরা গান্ধীর একটা মূর্তি গড়ব তাঁর চেহারার আর সেটা রাজীব গান্ধীকে দিয়ে আসব কিন্তু রেলগাড়ির ভাড়া নেই। তার ওপর মস্ত ভয় ছোট ছেলে সুমন্তর — সে ব্যাটা কমিউনিস্ট — মূর্তি গড়লে ভেঙ্গে দেবে।

লক্ষীপুজোর দিন, কেবলই চাঁদমালা বিক্রি হচ্ছে দেখলাম। মাত্র দশ পয়সা একটা শোলার মালা। নাতিটি পয়সা নিয়ে জমাচ্ছে একটা সরায়। দশ টাকা হলে চাল আর আলু কিনে নিয়ে যাবে। তারপর খাওয়া দাওয়া।

হরিদাস বাউলের সাদা শোলার গোলাপটা সুন্দর হলেও সেটার দিকে চোখ পড়লেই আমার মনটা যেন ব্যথায় ভরে ওঠে।

হাজার বছরেও এ দেশের রোগ যাবে না

গ্রামের কয়েক মাইল দূরে দূরে হাসপাতাল বসেছে। আগে অবস্থাপন্ন ব্যক্তির কঠিন ব্যামো হলে কয়েক মাইল দূরের উপশহর এলাকা থেকে পালকি চড়ে আসতেন ডাক্তার। কোনও কোনও ডাক্তারের আবার ঘোড়া ছিল। তাঁদের 'ঘোড়া ডাক্তার' বলা হ'ত। রাস্তায় এক হাঁটু কাদা। কোথাও বা এক কোমর কাদা। তার মধ্যে পড়লেই কোমর জখম। সেকাল গেছে। এখন রাস্তাঘাট হয়েছে। সাইকেল রিক্সা, বাস চলছে। তাই গরিব বাড়ির অসুখ বিসুখ করলে মেয়ে আর ছেলের পাল পাকা রাস্তা ধরে রোদে হাঁটতে হাঁটতে বা বাসে চড়ে প্রতিদিনই (রবিবার বাদে) হাসপাতালে যায় রুমালে কয়েকটা শিশি বেঁধে নিয়ে। কিন্তু দুপুর রোদে 'নট্‌কা-মারা' হয়ে ফিরে রোগীরা হাসপাতালে ডাক্তার বা কর্মীদের যেমন অমানুষসুলভ ব্যবহার তেমনি ওষুধ না দেবার অভিযোগ করে।

করিমের বউ বলে, 'মাগো, চারটে ছেলেমেয়েকে লিয়ে গেলুম হাসপাতালে, দুটো টাকা বাস ভাড়া গেল। সেই টাকা দিয়ে যদি মুদিখানা থেকে বড়ি কিনে খাওয়াতুম ছেলেদের ব্যারাম ভাল হ'ত। হাসপাতালে রক্ত আমাশার বড়ি নেই , কিরমির ওষুধ নেই, মাথার যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, বলে লিখে দিচ্ছি, ওষুধ নেই কিনে খাও। একমুঠো লালচে বড়ি দিয়েছিল, দূর করে ফেলে দিইচি। আগের বারেও ঐ বড়ি দিয়েছিল, কিচ্ছু হয়নে যে গা মা। সব্বাইকে ঐ বড়ি দেয়'।

আলকাস বুড়োও হাসপাতালে পেটের যন্ত্রণার জন্যে গিয়েছিল, লেখন নিয়ে ফিরে এসেছে। সে বলে 'হাসপাতালে ডাক্তার নার্স সব্বাই এখন পার্টি করছে' ভাল রোগী দেখার তাদের সময় নেই। একজন বাবু মতো লোক বলল, কেন আসো হাসপাতালে? ওষুধ তো সব বাবুরা বেচে দেয়। ভাল ওষুধ কিছু থাকে না। সরকারও প্রয়োজনমতো ওষুধ দিতে পারে না। টাকা থাকে ডাক্তার ডেকে রোগ দেখাও — নয়তো নার্সিং হোমে ভর্ত্তি হও। কঠিন ব্যামোতে যদি মন্ত্রীর চিঠি নিয়ে হাসপাতালে যাও তবে সিট পেতে পার— তাও পার্টির লোক হওয়া চাই। গরিব লোকেরাই তো এদেশের জঞ্জাল। মরে গেলেই আপদ যায়।.......'

বাঙালির পেটের রোগ পৃথিবীর আতঙ্ক। এই দুর্বহ রোগ সে বহু যুগ থেকে আজন্ম বয়ে নিয়ে চিতায় উঠছে বা কবরে ঢুকছে। সাংবাদিক তরুণ বাগচী পেটের অসুখের কথায় বলেছিলেন, একবার লন্ডনে গিয়ে আমার পেটের অসুখ জেনে বড়

বড় মাইসিন ওষুধের আবিষ্কর্তা জনা সতেরো ডাক্তার এসে আমার পেট-পিঠ যেভাবে টিপতে লাগলেন ভয় হ'ল আমার পেটের মধ্যে ক্যানসার হ'ল নাকি অন্য কিছু বিরাট রোগ— এত ডাক্তার কেন? এক ডাক্তার বললেন, 'জাহাজে আপনাদের গোটা দল যে খাবার খেলেন, আপনিও খেয়েছেন, তাদের কারুর পেট খারাপ করল না, আপানার করল কেন? বললাম, তাই বলুন, পেট খারাপ! এটা তো বাঙালির বংশগত রোগ।'

রাশিয়াতেও পেটের রোগকে খুব বড় করে দেখা হয়। যে কোনও শ্রমিক বা মানুষের পর পর দুবার পেট খারাপ করলে এক সপ্তার মধ্যে তাকে হাসপাতালে যেতেই হবে। চিকিৎসার জন্যে তাদের পয়সা লাগে না।

সমাজতন্ত্রের দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই অথচ যে যা খুশি করতে পারে না, যা খুশি খেতে পায় না, পুঁজি বাড়াতে পারে না, মন্ত্রীর ছেলের পাশে সুইপারের ছেলে শুয়ে এক খাবার খেয়ে মানুষ হয়, বৈচিত্র্য কোথায়?

সত্যি, ভারতের মতো বৈচিত্র্য পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এত জটিল আর দুরারোগ্য রোগ নিয়ে কোনও দেশের মানুষ বাঁচতে পারেন না। ব্ল্যাকমেলিং বা ব্ল্যাকমার্কেটিং অথবা উঁচুপদের চাকরি করে কিম্বা বিদেশের দালালী করে অনেক টাকার মালিক হয়েও হঠাৎ দেখা যায় হাই প্রেসার, ব্লাড টি.বি, থ্রোট ক্যানসার, হার্টের অসুখ। না হয় এক ঢিলে পাখি মরে কিন্তু গরিবদের সাধারণ এবং সামান্য রোগগুলি যখন অর্থাভাবে ওষুধ না পেয়ে ক্রমে জটিল হয়ে ওঠে আর বংশের মধ্যে রেখে যায় সেই রোগের প্রতিকার কোথায়?

ধর্মের গুরদেবরা যে দেশের সংবিধানের মাথায় বসে আছেন ভাগ্যবাদী সেই দেশের ধনী দরিদ্র তো থাকবেই। পাঁচশো বছরেও তাকে হটানো কঠিন।

সমস্ত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হতে কোনও ব্যাঙ্ক আর লালবাতি জ্বালাতে পারে না, লোকসানও নেই, সমস্ত বাসও সরকারি হলে ভাড়া না বাড়ালেও লোকসান হবে না। (অবশ্য চুরি না হলে) সমস্ত নার্সিং হোম, ব্যক্তিগত ডাক্তারী উঠে গিয়ে সরকারি হাসপাতাল হলে এত রোগও থাকবে না। কিন্তু এসব ব্যাপারে ধনীদেরই আপত্তি। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি, ব্যক্তিগত বাস, ডাক্তারী চেম্বার তো তাঁদেরই। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাতেও তাঁদের প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানীর কাছে এদেশের সরকারও ঋণ করে! সরকারই ত্রাণ তহবিল খুলে বসে আছে।

এদেশের সমাজতান্ত্রিক পিউরিটানরা লটারি বা রেসকে স্বীকার করে নিয়েছেন আপাতত নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য। বিনা বিপ্লবে ভোট যুদ্ধে কেন্দ্র জয় করার পর সংবিধান পালটে রাশিয়ার মতো সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত গরিবরা অর্ধাহারে অনাহারে, রোগ, বেকারিতে, মামলা-মোকদ্দমায়, ধর্মের হানাহানিতে মরবে।....

ধর্ম যে পৃথিবীর উন্নতিকে হাজার বছর পেছিয়ে দিয়েছে পাকা সমাজতান্ত্রিক বন্ধুরা একথা জানেন কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে ধর্ম সম্প্রদায় মেনে ভোটে লড়ে জেতার জন্য সংকট অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। প্রাণ খুলে বলছেন না আসল কথাটা।

ধনীর দয়ায় গরীবরা বাঁচবে এই শ্বাশত নীতি সচল বলে ব্যক্তিগত কারখানায় আজ রোগভরা মলিন পোশাকের শ্রমিকদের ভিড়। অনেক রকমের ট্রেড ইউনিয়ন শিল্প-উন্নতির বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের মতো অনেক কারখানার মধ্যে প্রতিযোগিতা করে শ্রমিকরা লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে লাভের অঙ্ক থেকে বেতন বা বোনাস বাড়াতে পারে না। এদেশের কারখানায় বাইরের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এক হয়ে লড়াই না করে পার্টিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেবল দুর্বল শ্রমিকের ঘাড় থেকে চাঁদা তোলেন।

শ্রমিকদের ই.এস.আই হাসপাতালে শতকরা নিরানব্বই ভাগ গ্যাসট্রিক আলসারের রোগ। পেট কাটতে হয়। কম মজুরিতে ভাল খাদ্য তারা কিনে খেতে পায় না। বাজারের পচা ধসা জিনিস কপালে জোটে। পরিবারের লোকসংখ্যাও বেশি। বাচ্চা কাচ্চারা তাদের 'প্রবলেম চাইল্ড'! পড়াশোনার ব্যবস্থা নেই। পোশাক-আসাক নেই। বাবা রোগে পড়লে ডাক্তারি ছুটির সামান্য পাওনায় সংসার চলে না, তাই বার বছরের ছেলে কায়িক শ্রম করতে বেরোয়। কয়লা বয়ে হনুমানের মতো হয়ে যায়।

কত মুসলিম চটকল শ্রমিকের ছেলে চটা, সন্তোষপুর, বটতলা, মেটিয়াব্রুজের দর্জিবাড়িতে বাপ থেকেও চাকরের মতো জল তোলে, চা বয়, ছেলে বয়, বাজার করে, কর্তার পা টিপতে টিপতে আড়ালে চোখের জল মোছে। রাতের বেলা তাদের তাদের কামকাজে বসায়। বোতামের ঘর সেলাই করে। পাঁচ বছরেও দর্জির কাজের 'দ' শেখে না। এক সময় মস্তান হয়ে ফিরে আসে। বাবার কারখানায় যাবার সাইকেল বেচে বা বন্ধক দিয়ে পালায়। তারপর দাগী আসামী। ...

অভিজ্ঞ মানুষ মাত্রেই জানেন, পেটের রোগ হলেই মাথার যন্ত্রণা হয়। তাহলে মাথাও ঠিক নেই আমাদের। এই মাথা নিয়েই ধর্ম করছি, রাজনীতি করছি, আশার স্বপ্ন দেখছি, লটারির টিকিট কাটছি, ছেলের বার্লির পয়সা কেটে নিয়ে কি এমনি? সাট্টা, রেস, জুয়া খারাপ জেনেও আমরা তা খেলছি, শ্রমিক, চাকরিজীবিরাই যখন হালে পানি পাচ্ছে না তখন এদেশে নামী এবং বেনামী কয়েক কোটি বেকারের দিন চলে কেমন করে?

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন 'মন্বন্তরে মরি না আমরা মারী নিয়ে ঘর করি।'

আশার কথা।

হাজার বছরেও আমরা মরব না— জনসংখ্যা রোধের জন্য যদি দেশের নেতারা

হঠাৎ যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে বেশ কয়েক কোটি মানুষ না কমিয়ে দেন।

পৃথিবীর মানুষ কমিয়ে দেবার জন্য যারা ইতিহাসে ধিকৃত ব্যক্তি জনসংখ্যার চাপে আজকের দেশ নেতারা কি তাঁদের অন্য মূল্য দেবেন।

লায়লার বাপ নামাজী শ্রমিক, এখন তার হার্টে ক্যানসার, আমেরিকায় না হলে অপারেশন হবে না, লাখ টাকার দরকার — লায়লার বাপ শাহ্ আলমের সামনে অন্ধকার, প্রভিডেন্ট ফান্ডের কয়েক হাজার টাকা এ দেশের বিখ্যাত হৃৎপিন্ড বিশারদরা খেয়ে নিয়েছেন। লায়লার বিয়ে হয়নি। তার মা কি বাচ্চাদের নিয়ে ভিক্ষেয় নামবে?

সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ায় ছেলেমেয়েদের জন্য ঘরবাড়ি আর তাদের ভবিষ্যতের জন্য জমা টাকা রেখে যেতে হয় না। তাদের রাষ্ট্র দেখবে।

কিন্তু ভারত তো আর রাশিয়া নয়। এটা ধনী-দরিদ্র-রোগী-সুখী-ভোগী-বৈরাগীর বৈচিত্র্যের দেশ। এখানে যার যা খুশি করতে পারে। অসহ্য হলে গলায় দড়ি দাও।

এখন ব্যাঙের ছাতারও দাম লাগে

সাপুড়ে সম্প্রদায়টা বাঙালি সমাজ থেকে আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। গ্রামে আর কেউ সাপ খেলা দেখতে এসে ছড়া গেয়ে সখির নাচ দেখে না। বাচ্চা হলে হিজড়েরা আসে খুব কম। তবে পথেঘাটে বিশেষ করে শহরে জনপদেই মাঝে মধ্যে তাদের ডুবকি বগলে নিয়ে যেতে দেখা যায়। কাহার সম্প্রদায় — যারা ডুলি বা পালকি বইত তারা কলে কারখানায় লেগে গিয়ে রিক্সা বা মোটর হওয়াতে পালকির গান বা কাঁধের যন্ত্রণা ভুলে গেছে। মেয়েরা বালবাচ্চা নিয়ে বেওয়া-বালতি হয়ে গেলে আগে ঢেঁকিতে ধান ভানত, মাঠ থেকে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচত, মুড়ির ব্যবসা করত, নতুবা শহরের বাবুর বাড়িতে কাজ করতে যেত। এখন ঢেঁকি উঠে গেছে, আছে খুব দক্ষিণাঞ্চল সুন্দরবনের দিকে, এখন পাঁপড় বেলার কাজ করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে, নয়তো কাগজ কিনে ঠোঙা গড়ে। কোন কোন মেয়ে ধামাভরা কাচের চুড়ি বা রঙ সিদুঁর বেচে। কেউ বা ডিম, ঝাঁটাকাঠি, লাউ কিনে বেড়ায় গ্রামের পাড়ায় পাড়ায়, পরে শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আসে। মোরব্বার জন্যে গাছ মুড়িয়ে কাঁচা ছাঁচিবেল কিনে নিয়ে যায়। মিছরির মত মিষ্টি বানানোর জন্যে পাঁশকুমড়ো কেনে, ঘরের চালের ওপরে বালিশের মত শুয়ে থাকা চাল-কুমড়োর কদর জানে হিন্দুরাই, নারকেল ছাইয়ের মত এর মিষ্টি করতেই হয় রান্নাপুজোর সময়।

বিনা পয়সায় আগে গ্রাম থেকে কত মানুষ কত কি নিয়ে যেত। এখন পয়সা লাগে। ব্যাঙের ছাতা পচা ধসা কাঠের মধ্যে থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে থাকত — কেউ তার ব্যবহার জানত না। ছেলেমেয়েরা ভেঙে নিয়ে খেলা করত; কেউ আঁশটে গন্ধ বলে বিষাক্ত ভাবত কিন্তু এখন কোনো কোনো মেয়ে তুলে নিয়ে যেতে থাকলে ছেলেমেয়েরা আগেই তুলে রেখে পয়সা চায়। থুলকুনি পাতাও সংগ্রহ করে অনেক মেয়ে—শুকিয়ে গেলেও বিক্রি হয়। ভেষজ ওষুধ হয় শহরের কারখানায় নিয়ে গিয়ে। ভৃঙ্গরাজ বা কেশুত গাছ প্রচুর পাওয়া যায় জলা জমিতে, বিনা পয়সায় পানের মোটের মত বেঁধে নিয়ে অচেনা মানুষেরা বাইরে থেকে আসে। হিন্দুস্থানী মৈথিলী ভাষীরা আসে নিমের দাঁতন কিনতে। হাঁসের পালক, নেভির জুতো, ভাঙ্গা কাচ-লোহা-তামা-কাঁসা-পেতল-কাগজ করমচা বীজ, তেঁতুল বিচি, চুল কেনার জন্যে গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় দোরে দোরে ফেরে গরিব মেয়ে পুরুষরা। কেবল বিনা পয়সার হাড় কুড়িয়ে নিয়ে যায় মুচিরা। মরা জীবজন্তুর চামড়াও ছাড়িয়ে নিয়ে যায় তারা। শামুকের মুটি

কলা বাসনায় বেঁধে ছিপের মত পুকুরে কাঁকড়া ধরে ভাঁড় ভরে চাষীবাড়ির মুসলমান ছেলেমেয়েরা পালপাড়ায় নিয়ে যায়, বদলে মাটির হাঁড়ি-সরা-মালসা-ভাঁড় আনার জন্য।

পুকুরের ছোট জাতের কাছিম সংগ্রহ করতে আসে এক ধরনের দুঃসাহসী ভূতের মতন চেহারার লোক। বনজঙ্গল ভেঙে সাপের ভয় না করে পচা খানাডোবার ধারে নেমে খোঁজ গেঁথে গেঁথে চলে। ঠক করে শব্দ হলে ঠিক বুঝতে পারে কাছিম কিনা। তুলে এনে কোমরের জালের মধ্যে বেঁধে রাখে। বড় সামুদ্রিক কচ্ছপের (জলখাসি) মাংস দশ টাকা কেজি হলে ছোট কাছিমের মাংস বারো টাকা। কাছিম ধরলে মুসলমানপাড়ার কেউ আপত্তি করে না, কেন না তারা খায় না। তবে ছিপে পড়লে 'বাঙালি' পাড়ার লোকেদের একটাকা দেড়টাকায় বেচে দেয় ছেলেরা কিছুক্ষণ খেলা করার পর।

খরগোশ,কাঠবেড়ালি, ইঁদুর, ভাম ইত্যাদি ধরে নিয়ে যায় সাঁওতাল বা বেদেরা। দাঁড়াশ সাপ গোসাপ, খ্যাঁকশিয়ালের চামড়া সংগ্রহ করে কলকাতার ফিয়ার্স লেনের কাঁচা চামড়ার জাব্‌নাদারদের বেচে আসে কিছু লোক। গ্রামের জীবজন্তু কমে যাচ্ছে। শশাক্ষেতে ফলিডল বা এনড্রিন দেওয়া হয় কাঁকড়ার পিঠ ফুটো করে, খেয়ে কাঁকড়ালোভী শিয়ালের বংশ ধ্বংস হতে চলেছে। মানুষও মরছে কম, হিন্দুদের তো পুড়িয়ে দেয়, ভরসা কবরের মানুষদের। মুরগী হাঁসের ভরসায় কিছু কিছু শিয়াল বা খট্টাস এখনও বহু কষ্টে বংশ রক্ষা করে চলেছে। খাসীর মাংসের দাম যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে কুকুরের সংখ্যাও কমে যাবার সম্ভাবনা আছে। খাসী কিনতে এসে অচেনা শহুরে পাইকের বলছিল, 'দাও না মা, অনেক টাকা হবে, পাঁচ ঘন্টা গাঁয়ের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছি, একটা খাসী মিলল না।'

গ্রামের নির্জন বনজঙ্গলের মধ্যে যেসব অব্যবহৃত ডোবা থাকে তাতে কিছু লোক পিঁপড়ের ডিম দিয়ে কই, মাগুর, শিঙি মাছ ধরতে বা চৌকি ছুঁড়ে বড় শোল শাল মারতে যায় যারা তারা বলে দু'তিন বছর আর কোনো কেউটে সাপ চোখে পড়েনি। কার্তিক মাসে ধানক্ষেতে জল হয়ে গেলে চুরি করে মাছ ধরার জন্য কাদায় পুঁতে অনেক ধান নষ্ট হয় বলে রগচটা চাষী এনড্রিন ঢেলে দিয়ে যায়। মাছ সাপ সব মরে ভাসতে থাকে। বকেরাও মরে পড়ে থাকে। তবে লোভে পড়ে আধমরা মাগুর, শোল, ল্যাঠা মাছ এনে গরিবরা খেয়ে দেখেছে, কিছু হয় না। তবে পেট খারাপ করে। হয়ত এনড্রিনের পারসেন্টেজ কম ছিল, কিন্তু বেশি হলেই বিপদ। নাকি রান্নার সময় অগ্নিদেবতা বিষটুকু গ্রহণ করে নেন?

মণকে মণ তেঁতুল বিচি কি হয়? জামের বীজ এবং তেঁতুল বিচি গুঁড়ো করে বার্লির মত খেলে অবশ্য বহুমূত্র রোগ সারে। তেঁতুল বিচি আটার মধ্যে ভেজাল

দেওয়া হয়। একটাকা মাত্র কেজি দিলে ব্যবসায়ীরই লাভ। বারো আনা কেজি করমচা বীজ পিষে তেল (চুলকানোর ওষুধ) বার করে যদি চোদ্দ পনের টাকার সরষের তেলে ভেজাল দেওয়া যায় তবে মোটা লাভ। সমস্ত দোকানের বিশুদ্ধ সরষের তেলই এখন বাড়িতে এনে দু-তিন দিন রাখার পর এমন পচা গন্ধ বেরোয় যে গায়ে বা মুড়িতে মাখা যায় না। গোটা দেশটাই নাকি পচা তেলের উপর ভাসছে। কিছু করার নেই। যারা ধরে তারা ঘুষ খেয়ে ছেড়ে দেয়।

আগে দেখতাম, যারা খুব গরিব লোক, সরষের তেল কিনতে পারে না তারা রেড়ির বীজ পিষে গাঢ় হলদে মত সেই তেলে রান্না করত — চমৎকার তরকারি হয় নাকি। কিন্তু রেড়ির চাষও উঠে গেছে। কেন না 'গাব তেল' বা রেড়ির তেলের প্রয়োজন ছিল গরুর গাড়ির চাকার হাঁড়িতে, রংকিলে দেবার বা মাটির পিদিম জ্বালানোর জন্যে। এখন গরুর গাড়ির জায়গা দখল করেছে মোটরের চাকা লাগানো বাঁশের ঠেলাগাড়ি।

দু'মুখো আটলের মধ্যে কচি মুরগী ছানা দিয়ে গ্রামের পতিত ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে বসিয়ে রেখে মাথায় গামছার পক্কড় জড়ানো কোনো লোক অদূরে বসে বিড়ি টানত। বেজি বা নেউল মুরগী ছানা খাবার রাজা। তার ডাক শুনে পাগল হয়ে ছুটে এসে দু'পায়ে লাফালাফি করার পর ঢুকে যেত আটলের মধ্যে। তারপর পাকড়াও। কি হয় বেজি? চামড়া থেকে ঘড়ির বেল্ট। কিন্তু বিষাক্ত সাপ মারে বেজি। গোসাপও তো সাপ খায়, তার চামড়া থেকে বিবিদের ভ্যানিটি কি না বানালেই নয়। খ্যাঁকশিয়াল বাঘের আগে ফেউ ধরে, তার চামড়ার ঘড়ির বেল্ট নাকি সবচেয়ে বড়লোকের ছেলের হাতের ঘড়ির বেল্ট হলে মানায় বেশি।

গাঁয়ে ছাতারে পাখির দল লড়াই করত বাঁশ বনের তলায় নেমে — এখন আর দেখা যায় না। উপশহরের পাখিরা বন্দুক নিয়ে প্রায়ই আসে সৌখিন ছেলেরা। কাক, চিল, শকুন ছাড়া যে কোন পাখির মাংসের চাট দিয়ে বাংলা মাল নাকি প্রচন্ড লাগে।

দিনের খদ্দের-ভিখারিদের সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু বিনা পয়সায় রাত্রে যারা কবর থেকে কঙ্কাল তুলে নিয়ে যায় তারা কারা? তারা নাকি দিনের বেলা হরদম সেন্ট মেখে থাকে।

তবে কি আমরা কিয়ামতের ময়দানে উঠব মস্তকশূণ্য হয়ে?

ভূতো অমাবস্যার রাতের মাহাত্ম্য

ভূতো অমাবস্যার রাত। ভয়ঙ্কর রাত। ভূত বেরুবে। রাতের বেলা কেউ পায়খানা করতেও যাবে না, শাঁকচুন্নি পেত্নি ধরলে সারা বছর পেটের ব্যামোয় অবস্থা কাহিল হবে। এসব কথা মুসলমান মেয়েরাও বলে। অবশ্যই ভ্রান্ত ধারণা। আধিভৌতিক ধারণা সত্ত্বেও কালীপূজোর রাতে আমরা হরদম চাঁচড় পুড়িয়েছি। প্যাঁকাটির বান্ডিল জ্বেলে 'এজোরে পেজোরে' বলে রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করেছি ছেলেবেলায়। কিছুদিন আগে পাট কাচাও হয়। প্যাকাটির বোঝা পড়ে থাকে। যাদের প্যাঁকাটি নেই তাদের ছেলেরা আগে থেকে তা চুরি করে এনে লুকিয়ে রাখে। ভূতো অমাবস্যার রাতে হরদম আগুন-বাজি করতে হবে।

এই অমাবস্যার রাত কালরাত্রি। বিষম রাত্রি। সুচিভেদ্য অন্ধকার। কালের পুজো হয় চারদিকে, সারারাত পড়পড় চচ্চড় করে বাজি ফাটে, হুসহাস করে তুবড়ি জ্বলে। এক রাত্রে কত লক্ষ টাকার বারুদ -বাজির ছাদ্দ হয়। কত ছেলের হাত উড়ে যায়, চোখ কানা হয়।

প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ওপরে মিলিয়ে হিন্দুদের সব পুজো নির্ধারিত হয়েছে। আশ্বিনে যখন ধান গাছ সবুজ হয়ে উঠে গর্ভকোষে শস্য ভরে নিয়ে জীবনের ভরা আশ্বাসে সমৃদ্ধ তখন সব হারিয়ে আনন্দ করার সময়, আনন্দময়ী আসছেন। তারপর লক্ষীপুজো — ধানের শীষ দেখা দিয়েছে। জলা জমির কাজ নেই, কার্তিক মাসে ডাঙ্গা কোপাও। কন্দমূল উঠিয়ে দাও। খামালু, ওল, ঘোরকচু, হলুদ। এবার মূলো, পালং, কপি, গুড়, বেগুন, নটে শাক, শশা, পুরুল, নাউ, কুমড়ো ফলানোর সময়। সারা বর্ষায় মশা, উই টিংড়ি, ঘুরঘুরে নানারকম পোকামাকড় ছেয়ে গেছে । তাদের হত্যা করবার অগ্নিযজ্ঞ করার দরকার। আর আগুন দেখলেই কীটপতঙ্গ প্রলুব্ধ হয়ে এসে তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। তাই চাঁচড় জ্বালানো।

গ্রামের ছেলেরা কালীপুজোর রাতের আগের বিকেলে কলাগাছ কেটে এনে খাড়া করে পুঁতে তার গায়ে শুকনো কলাবাসনা জড়িয়ে জড়িয়ে দানব চেহারা বানায়। সন্ধ্যার পর তাতে আগুন লাগিয়ে দিলে জমাট অন্ধকার রাত যেন দাঁত মেলে হাসতে থাকে। চারদিকের গাছপালা পাতা আগুনে-ঝড়ে আন্দোলিত হয়। পোকামাকড় হত্যার যজ্ঞ হয়ে যায়।

সামাজিক মানুষকে আনন্দ করতে, অনুষ্ঠান করতে দিতে হবে। তাই ধর্ম অনুষ্ঠানে

পরিণত হয়েছে, সাংস্কৃতিক মেলা বা সভাও ধর্মীয় উদ্বোধনের দ্বারা শেষ পর্যন্ত সংসরাণি্তক হয়ে পড়লে অনুষ্ঠানে বা লোকাচারে পরিণত হয়।

কালীপুজোর তত্ত্ব বহুতর। মোটমাট আদি দেবী কালী। আট প্রকার গুণ লাভ করার পর অসাড় পাথর হয়ে যাওয়া শিবের বুকের ওপর বিপরীত বিহাররতা যে কামদেবী দক্ষিণা কালী নামে সবিস্ময়ে নৃত্যময়ী তাই- সৃষ্টির আদিরূপ। পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর অমর সৃষ্টি 'ভল্‌গা থেকে গঙ্গা' গ্রন্থের মধ্যে একটি কালানুক্রমিক চিত্রে দেখিয়েছেন আদি যুগে ভল্‌গার তীরে পাহাড়ের গুহার মধ্যে একদল নগ্ন মানুষের অবস্থান। তার মধ্যে দলনেত্রী ছিলেন কালী। তিনি সাঁতরে পার হতে পারতেন ভয়ঙ্কর দুর্বার নদী। গাছে চড়ে মধুর চাক ভেঙে এনে খাওয়াতেন দলের অশতিপর লোলচর্ম বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শঙ্খ ধবল চেহারার পুত্র মহাদেব ইত্যাদিকে। তারা পিঠোপিঠি পাথরের অস্ত্র বা কাঠের ডান্ডা নিয়ে চলতেন পশুর আক্রমণের ভয়ে। নায়ক ছিলেন মহাদেব। সাপ বাঘকে তিনি ভয় পেতেন না। এই দলটি ক্রমে ক্রমে কারাকোরাম পার হয়ে এসে ভারতে ঢোকেন। কালী মারা গেলে তাঁর অন্তহীন দুঃসাহসিকতার জন্য পরবর্তীরা মুর্তি গড়েন, পুজো করেন। মহাদেব এরপর বাঘছাল পরে ডান্ডা হাতে নিয়ে গোটা ভারত ভ্রমণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁরও মুর্তি পুজো হতে থাকে। এইভাবে পরে পরে এসেছেন ইন্দ্র, বরুণ প্রমুখ দেবতারা।

হিন্দু ধর্মে দেবতাদের আসা এখনো বন্ধ হয়নি। মানুষই তাঁদের কাছে দেবতা হয়ে যান। একালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তার সাক্ষাৎ প্রমাণ। তাঁরও আরাধ্যা সেই আদি দেবী কালী। মুনি ঋষিরা এই কালীকে ভয় থেকে বাঁচার জন্য ইষ্ট দেবী করে তুলে নানান আখ্যান ও তত্ত্ব আরোপিত করেছেন।

আমাদের ধারণা জগতের যত ধর্ম আছে তাদের সমস্ত দেবতা বা ঈশ্বরের যে ক্ষমতার কথা ভাবা হয়েছে তাঁর দ্বারা সমূহ ব্রহ্মান্ড পরিচালনা অসম্ভব কল্পনা। বিজ্ঞান ধর্মের এই সর্বনাশ ঘটিয়েছে। সে ভূতপ্রেতকেও মেরে দিয়েছে।

এত বড় বয়স হল আমি কখনো ভূত দেখিনি। তবে ভূতে বিশ্বাসী জ্যান্ত ভূতদের সম্পর্কে ভয় আছে। এটা তাদের মূলধন।

ভারতে ভূত এখনো অনেককাল থাকবে, যতদিন শতকরা নিরানব্বইজন মানুষ শিক্ষিত না হয়, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী শিক্ষিত লোকের কি তখন অভাব হবে? অতএব ধর্ম যতদিন আছে ততদিন ভূতপ্রেত সবই থাকবে। প্রেতাত্মার উদ্ধারের জন্য পিন্ডদানের ব্যবস্থা না করলে ধর্মের পান্ডাদের বিনা পরিশ্রমে উদর পূর্তি হবে কি করে?

তাই এইসব ধর্মের পান্ডারা আধুনিক শিক্ষার ঘোর বিরোধী।

যা হোক, হিন্দুদের প্রকৃতি পূজার মধ্যে পার্থিব উপকারকে বড় করে দেখা হয়েছে।

তাঁরা সাপ, গাছ, পাথর, মাটি, আগুন, জল, হাওয়া, শস্য, অর্থ, সম্পদ, যার উপকার পান একটা প্রণাম ঠুকে দেন। এমনকি যার দ্বারা মৃত্যু ঘটতে পারে, ক্ষতি হতে পারে তাঁকেও নমস্কার। শনিকেও পুজো দেন। তাই এঁদের মরণ নেই।

ঐতিহাসিক ডবলু ডবলু হানটার জানিয়েছেন, বাঙালি মুসলমানরা তিনশো বছর আগে কালী পুজোতে অংশগ্রহণ করত। খুবই স্বাভাবিক। এদেশের বহু মুসলমানই হিন্দু থেকে উদ্ভূত। তাঁদের আংশিক আচরণ আজও হিন্দুদের মত রয়ে গেছে।

তবে কাশী বা পুরীর মতে বাঙালি হিন্দুরা হিন্দুই নয়। আর পশ্চিমা মুসলমানদের মতে, বাঙালি মুসলমানরা আস্‌লি মুসলমানই নয়।

এর কারণ শিক্ষিত বাঙালিরা ধর্মভাব হারিয়েছে।

কিন্তু শিক্ষার হার আর আমাদের কত?

ধর্মগ্রন্থের নির্দিষ্ট রীতিনীতি বর্হিভূত অনেক লোকাচার বা মনগড়া চিন্তা-ভাবনা আমাদের মধ্যে জট পাকিয়ে আছে। হিন্দুদের কালীপুজোর রাতে কালীর সঙ্গে তার সাঙ্গ-পাঙ্গ ভূতপ্রেতরা যেমন বের হয় তেমনি মামদো বা মুসলমান ভূত অথবা মৃত আত্মারা বের হয়ে আসেন 'সবে-বরাতের' রাতে। তার জন্য অনুষ্ঠান আছে।

অনেকের ধারণা মৃত আত্মারা আসে ভিখারী বা জীবজন্তুর বেশে। তাই তাদের রুটি হালুয়া-মাংস ফিরনী দান করা হয়।

সব ধর্মই মানুষের মঙ্গলের জন্য। সব অনুষ্ঠানও তাই। মানুষের ঈপ্সিত নানারকম গোপন লিপ্সা আছে, মা কালীর পুজোর দিন তা চরিতার্থ করে নাও। মদ খাও-ম-কারাণ্ত যোগে মস্তান হয়ে যাও। ('মস্তান' শব্দটি কিন্তু ধর্মে আত্মভোলা মানুষ)।

পৃথিবীতে প্রকৃতিকে জয় করে বাঁচার চেষ্টা চলছে। বাঁচা কঠিন ব্যপার। মহামারী ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, রোগশোক, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, বন্যা, ভূমিকম্প. অগ্নি উদ্‌গীরণ, তুষারপাত কত কিছু ভয়াবহ ব্যাপার আছে পৃথিবীতে। তাদের হাত থেকে বাঁচা চাই। ভয়ে-ভরসায় তাই মানুষ তাদের পুজো দেন।

কিন্তু প্রচন্ড শব্দ করে মেদিনী কাঁপিয়ে বজ্রপাত হবার পর বোকারাই ইষ্টনাম জপ করে। কেননা তারা জানে না যে একবার বিদুৎ ঝল্‌কাতে দেখেছে সে আর মরবে না। তার আগেই বাজ যেখানে পড়বার পড়ে গেছে। যার মাথায় বাজ পড়ে সে আলোটা দেখার আগেই খতম হয়ে যায়- শব্দ আসে তো সে অনেক পরে। বিজ্ঞান এসব সত্য জানিয়েছে। এমন কি বিজ্ঞানই লৌহ শলাকা পুঁতে বড় বড় মন্দির -মসজিদ-গির্জা-প্যাগোডাকে বাজ পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ঈশ্বরের অবস্থান হয় যেসব পীঠস্থানে সেখানে ব্রজপাত হয় কেন এও এক প্রশ্ন! অবশ্য ধার্মিকদের উত্তরও খাড়া করা আছে, ওখানে নিশ্চয়ই কিছু অধর্ম হচ্ছিল।

ভূতো অমাবস্যার রাতে আগুন জ্বালানোর উদ্দেশ্যে আসন্ন ফসলের শত্রু পোকামাকড় মারা কিন্তু শব্দ করে বাজি ফাটানোর মধ্যেও বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে। জলা জঙ্গলের মধ্যে মাছ আটকে পড়ে জল ফুরিয়ে এলে। মাছ ধরার জন্য অনেকেই সেদিন 'ডিঙ্গি' দেয়। দুটো বাঁধ দিয়ে মাঝখান থেকে জল ছেঁচে রাখে। শব্দ হলেই ভয়ে মাছেরা লাফ দেয়। অনেক মাছ চলে আসে গভীর জলের পুকুরে।

প্রচুর মাছ খেয়ে সাপেরা এদিন বুঝতে পারে কার্তিকের পর আসছে গর্তে ঢোকার হিমরাত্রির কাল।

চাষবাসের জন্য যে আগুন জ্বালার প্রক্রিয়া তা আধুনিক হয়ে তুবড়ি প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। ঠাকুর গড়ে হিমেল রাতে রাত জাগবে কি নিয়ে? একদা ছিল কবি-গান, তরজা, ভাইয়ে-গান। এখন হয় যাত্রা. থিয়েটার, সিনেমা, ভি- ডি- ও দর্শন।

ভুতো অমাবস্যার দিনে গোয়ালপূজো হয়। গরুর শিংয়ে পাটের থুবি রঙিন করে মালা পরানো হয় স্নান করানোর পর। কলা গাছের খোলায় গোবর, চুল, সিঁদুর দিয়ে পূজো করে পথের ধারে ভূতেদের আহার্য রেখে আসে। অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে ধর্ম হয় না। দেশে দেশে নানারকম লোকাচার, নানাধরণের অনুষ্ঠান। মানুষের নানারকম ধারণা, নানারকম রীতিনীতি। এসব নিয়েই সামাজিক মানুষ বেঁচে আছে। তবে গাছের -ওপরে-বাসা-বেঁধে- থাকা মানুষদের নিয়ম-নীতি এখন পাল্টে গেছে ইমারতে বাস করা মানুষদের কাছে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বাস সহজে যায় না। সুপ্তভাবে তা নিহিত থাকে অবচেতন মনের মধ্যে। ঐতিহ্যকে সে মুছে ফেলতে চায় না।

আগে রোগ শোক দুর্ভিক্ষে মহামারীতে মানুষ মরত ব্যাপকভাবে। ভূতে ভরে থাকত পৃথিবী। ভয় ছিল চারদিকে। পদে পদে। তাই এত পুজো। ভূতো অমাবস্যার রাতে সেসব বিকল্প মুর্তি এসে হাজির হবে এতে আর আশ্চর্য কি!

শিশুশ্রমিক মেলে, বাড়ির 'কাজের-লোক'

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়নি কেন? কিসের অসুবিধা? কাদের মুখ চেয়ে এই ঢিলেমি। যারা নিচের শ্রেণীতে পড়ে আছে আর অভাব অনটন ভাগ্যের ব্যাপার বলে বিশ্বাস করে ঈশ্বরে দোহাই দিয়ে নিজেরাই অসংখ্য সন্তান উৎপাদন করে চলেছে তাদের সব সন্তানকে প্রাথমিক লেখাপড়াটুকু শেখানোর জন্য সরকারের কি আরও অনেক স্কুল বাড়াবার ক্ষমতা নেই, নাকি আলাদা একটা ছেলে-ধরা কয়েদখানা গড়ার প্রয়োজনীয় দপ্তর তৈরির ঝামেলা? নাকি কুলী-কাবাড়ি, শ্রমিক, চাষী, নিম্ন বেতনের মানুষ তৈরির জন্য ভারতের দন্ডমুন্ডের কর্তা শিল্পপতিদের প্ররোচনায় এটা করা হচ্ছে না? সবাই জানে পশ্চিমবঙ্গ একটি শিল্পপ্রধান এলাকা। দর্জিশিল্প, পাঁপর তৈরি, মদ বিক্রি, পাউরুটি বানানো, ডিম কেনা, ঠোঙা তৈরি, ভাত বওয়া, কয়লা বওয়া, হোটেলে বা চা দোকানে জল তোলা, বাসনমাজা বা খদ্দেরের সেবা করা ইত্যাদি বহু কাজে শিশু শ্রমিক লাগে। কোনও দায়িত্বশীল ব্যক্তিই বারো বছরের আগের বয়সের ছেলেমেয়েদের কাজে না লাগানোর জন্যে বদ্ধপরিকর নন, বরং উদ্‌গ্রীব কেননা গরিব ছেলেমেয়েকে দুটি খেতে দিয়ে কম পয়সায় কাজ করিয়ে নেওয়াটাই আমাদের স্বভাব। সুসভ্য কলকাতা শহরের অনেক বাবু বা সাহেব বাড়ির খোপের মধ্যে অপরিণত বালক-বালিকাকে দূর গ্রাম থেকে আমদানী করে এনে কাজ করানো হয়। এই বাড়ির বাবুই হয়তো শিশু শ্রমিক পালনের বিরুদ্ধে রেডিও টেলিভিশনে বক্তৃতা করে আসেন এবং তার জন্য টাকাও পান।

পুকুর গুলিতে মাছ ধরা হলেও কিছু মাছ অনেকের জালের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে বাঁচে। গ্রামে বা শহরের বস্তি অঞ্চলে এখনও বেশ কিছু ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শেখে না। তারা মা-বাবার দয়ায় ঘুরে বেড়ায় বা মারামারি করে। নয়তো বছর বিযুক্তি মায়ের বাচ্ছা বয়। দোকানে যায়। কন্ট্রোল বা কেরোসিনের লাইন দেয়। চুরি চামারি করতে শেখে. পরে এরা জন খাটে, দাঁড় টানে, রিক্সা চালায়, কয়লা বয়, মাটি বয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে যে এসব কাজ আর তাদের দ্বারা হবে না এমন কথা নয়, তবু কিছুটা লেখাপড়া তারা শিখতে পারে। কত নম্বর গাড়িতে উঠতে হবে, ট্রেনের মহিলা কামরা কোনটা, মেশিন বা বিলের নম্বর কত, ভোটপত্রে নাম সই এসব তারা একেবারে ব-কলম হবে না।

সরকার যাঁরা চালান তাঁরা সব সময় সাফাই গেয়ে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যপারে সরকারের লোকেরা অবশ্য বলতে পারেন, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বই পত্র লাগে না, মাইনে লাগে না — বাবা মা যদি ছেলেমেয়েদের সবাইকে স্কুলে না পাঠায় তবে আমরা কি করতে

পারি?

অবশ্যই। গণতান্ত্রিক দেশে কোনও ব্যক্তিকে আমরা কিছু করার জন্য বাধ্য করতে পারি না।

সরকার বইপত্র দেন কিন্তু কতদিন পরে? হয়তো ফাইনাল পরীক্ষার কিছু আগে। তাই পাশ ফেল উঠিয়ে দিয়েছেন। যে ছেলেমেয়ে গ/ঘ/ঙ শ্রেণীভুক্ত হ'ল সে যে কোন বিষয়ে কাঁচা তা বোঝার উপায় নেই। তাছাড়া হাইস্কুলে আবার পরীক্ষায় বসাবে। ঝাড়াই-বাছাই করে ক /খ শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা হয়তো উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সুযোগ পেল, কিন্তু মাইনে না থাকলেও স্কুলের নানারকম ফি-তে গার্জেনের গা গরম। তারপর যে সাবজেক্ট যিনি পড়ান তার কাছে প্রাইভেট টিউশন না নিলে পাশ করা দায়। যে ছেলেমেয়েগুলোকে গ-ঘ-ঙ শ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য কোন স্কুলই ঠাঁই দিল না তারা ভবিষ্যতে কি করবে? তেলকল, চটকল, শ্রমিক হবে? রেল কোম্পানীর ঝাড়ুদার হবে? মিছিলের পতাকা বইবে?

তাহলে কি পাকা মাথায় প্ল্যান করেই যাতে সস্তায় শ্রমিক জন-মজুর তৈরী হয় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে? এ প্ল্যানটা কোন্ দেশের?

যাঁরা আদর্শমুলুকে বৃষ্টি হলে এখানে ছাতা খাটিয়ে বসে থাকেন সেই সমাজতান্ত্রিক বন্ধুদের ক্ষমতায় প্রায় দশবছর শাসিত হলেও পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হ'ল না। গ্রামে গঞ্জে বস্তিতে আজও অজস্র ছেলেমেয়ে প্রাইমারি স্কুলে না গিয়ে শিশু শ্রমিকে বা চোর -ছ্যাঁচোড়ে পরিণত হচ্ছে। তারা একটু বড় হয়েই হিন্দি সিনেমা দেখছে, টি ভি তে বাবুদের বিলাসী জীবন দেখছে, নকল বাবু সেজে টাকা এবং অন্যান্য উপভোগ্য করায়ত্ত করতে গিয়ে অসামাজিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

গদিতে বসা বাবু সাহেবরা সরকারি খরচে সুসভ্য দেশগুলিতে প্রায়ই ঘুরে আসছেন, অনেক দক্ষ সেক্রেটারিরাও তাঁদের বুদ্ধি এবং বিদ্যে যোগাচ্ছেন কিন্তু সিঁড়ির প্রথম ধাপটাও তাঁরা অতিক্রম করতে পারলেন না।

ঈশ্বরের কৃপায় (কমিউনিস্টরা 'হিন্দু' হলে আপত্তি নেই — 'মুসলমান হলেই' আপত্তি কেননা হিন্দুরা ফ্রি থিঙ্কার, কার্ল মার্কসকে প্রাণিপাত করানো যায় কিন্তু মুসলমান আল্লার নামে 'আলিফ' অক্ষরের মতো খাড়া থাকবে)। যে ক-বছর গদি মেলে ভালোয় ভালোয় কেটে গেলেই ভাল, ছবিটা টাঙানো থাকবে। মুর্তি গড়া হলে তো বহুৎ আচ্ছা — এদেশের নব রূপায়ণ নিয়ে মাথা গরম করলেই কি বিবেকানন্দ, সি আর দাশ, সুভাষচন্দ্র, বিধান রায় হওয়া যাবে?

পশ্চিমবঙ্গে কত ছেলেমেয়ে আদৌ স্কুলে যায় না, দয়া করে সরকারি দেবতারা এই পরিসংখ্যাটি জানাবেন কি ? কতজন ভিখারি আছে বিদেশীরা জেনে ফেলার ভয়ে যেমন তার সংখ্যা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ এটাও বোধহয় তেমনি একটা গোলক ধাঁধা?

আলো-আঁধারীতে সাঁতার কাটা আমাদের সরীসৃপ জীবনে কখনও হয়তো একটু ঠাঁই মেলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার — জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা, রোগই যখন সম্বল তখন বন্ধুদের আবেগকম্পিত বক্তৃতাই শুনে যাই।

এবং হাততালি দেবার লোক থাকাও দরকার। তাদের সুদূর অঞ্চল থেকে আহ্বান করে আনতে রুটি আর আলুর দম দিতে হয়। পাঁচ সিকে পয়সা দিলে তারা খালি গায়ে খালি পায়ে ঘামতে ঘামতে হাঁটতে হাঁটতে কলকাতা থেকে পুরুলিয়া চলে যায়। সবাই লেখাপড়া শিখলে এদের এত সস্তায় পাওয়া যাবে কি করে?

কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা খাতে কতটা দেন তার ওপরে প্রদেশের নড়াচড়ার গতি নির্ভর করছে একথা একটা মূলকথা বটে কিন্তু এটাও একটা সাফাই। প্রদেশের হাতে অনেক ক্ষমতা আছে, যে ক্ষমতার একটা ক্ষুদ্র অংশ কেটে নিয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা অবশ্যই করা যায়। এটা অত্যন্ত জরুরী কাজের মধ্যে একটা, সে তত্ত্ব মাথায় না ঢোকাতে পারলে বেনো জল আমাদের নাকে মুখে এখনও অনেকদিন ঢুকতে থাকবে।

এরজন্য ত্রাণ তহবিল খুললে কেমন হয়? ভারতের ভাগ্যবিধাতা শিল্পপতিরা নিজের মঙ্গলময় মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য কিছু কিছু অর্থ ছুঁড়ে দিতেও পারেন। তবে সে টাকায় স্কুল গড়া হবে কিনা বলা কঠিন।

একজন দেশপ্রেমিক বললেন,'মশায়, জায়গা দিয়ে ঘর বেঁধে দশ বচ্ছর প্রাইমারি স্কুল চালাচ্ছি, বোর্ডের অনুমোদন পাচ্ছি না, তাও আবার সেই স্কুল হঠাৎ চলে গেল অন্য পাড়ায়, হঠাৎ অনুমোদন মিলে গেল, সব পুরনো মাস্টার বাতিল। এমন কত স্কুল আছে, অনুমোদনই পাচ্ছে না— তায় আবার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা!'

অবস্থাটা কেমন করে যেন উলটো দিক থেকে শুরু করলে ভাল হয় মনে হচ্ছে। যেমন শিশুরাই হবে মাস্টার আর বুড়োরা যাঁরা দেশ চালাচ্ছেন তাঁরা হবেন ছাত্র। কেন না তাঁদের সঠিকভাবে মানুষ হওয়া হয়নি, অন্তত শিশুদের মতো তাঁরা সহজ ও সরল নন।

একজন প্রবীণ তথাকথিত শিক্ষাবিদ বললেন, 'শিক্ষার একটা ট্রাডিশন আছে। হঠাৎ চাষী শ্রমিকের ছেলেমেয়ের মাথায় উচ্চ শিক্ষার ভার চাপালেই যে তারা তা বইতে পারবে এমন কথা নয়। তাছাড়া মেরিটের ওপর সমাজতন্ত্র করা যায় না।'

বললাম, 'উচ্চ শিক্ষার খরচই বা কোথায় গরিবদের? খায় কি তারা? তবু ক্লাস এইটের মতো একটা স্ট্যান্ডার্ড বিদ্যে তো বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে। তারপর যে যে বিষয়ে পারে দক্ষ হবে। তাদের কাজ থাকবে। ঘর থাকবে। সরকার এসব দেখবে।'

শিক্ষাবিদ বললেন, 'ভারতে ভাগ্যের স্কুল খুলেছেন ভগবান। পুঁজিপতি ধনীদের সন্তানরাই এখানে মানুষ হবে — অন্যরা বাতিল, ঝালঝাড়া — তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ'।

তালাক আল্লারও না-পসন্দ

আল্লার আইন মানুষের কল্যাণের জন্যই। তাঁর বাণী এসেছে মানুষের মাধ্যমে। যুগে যুগে। কালে কালে। দেশে দেশে। ভবিষ্যতে সে বাণী আর আসবে না বললে প্রশ্ন ওঠে অনন্তজ্ঞানের আধার আল্লার ভাঁড়ার কি শেষ হয়ে গেল?

যেসব গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী লিপিবদ্ধ তা আদৌও না পড়ে বা না জেনেও তো মানুষ জ্ঞান অর্জন করছে প্রকৃতি থেকে। কোনটা দিব্য বা বিশুদ্ধ জ্ঞান তা নিয়ে তর্কের শেষ নেই — কোনটা শেষতম জ্ঞান তা বলে দেওয়াও একটা সীমাদ্ধতা।

একযুগে মানুষ তীর ধনুকে যুদ্ধ করেছে, পায়ে হেঁটে দেশ-দেশান্তর ঘুরেছে — আজ আধুনিক বিজ্ঞান সে সব বিদায় করে দিয়েছে। অতীতের আইন অচল হয়ে পড়লে সংশোধনী আনতে হয়েছে।

আল্লার সীল-মারা শরিয়তি আইনের কিন্তু রদবদল অসম্ভব। এ এক সীমাবদ্ধতা এবং আল্লা বার বার বলেছেন, সীমা ছাড়িও না। নিজে কিন্তু তিনি অসীম।

সীমার মধ্যে যে যন্ত্রণা মানুষের কপালে জুটেছে তার দায়ভোগ ঈশ্বরের জন্য নয়। তিনি সব সময় মুক্ত।

হুর হল কিশোরী যা বেহেস্তে পাওয়া যাবে কিন্তু পৃথিবীর আইনে তা অপ্রযোজ্য, অবৈধ।

হুরের কেনো কষ্ট হবে না—আল্লার ইচ্ছায়!

বিয়ে অত্যন্ত পবিত্র জিনিস কিন্তু যদি সেই বিয়ের বাঁধন ছিঁড়তে হয় তবে তাতে নিরাকার দয়াময় আল্লার আরশ্ কুরশী (সিংহাসন) কেঁপে ওঠে। গোটা পৃথিবীর আটচল্লিশটা দেশে হাজার হাজার তালাক হচ্ছে নিত্যদিন — তাহলে তো সেই পবিত্র সিংহাসন সদা কম্পমান!

বান্দাদের যা বলা হয়েছিল তা তারা করেনি — তারা অভিশপ্ত। অভিশপ্তরা যদি অত্যাচারে দুনিয়া ভরিয়ে তোলে পরকালে দোজখেই কি তার শাসন হবে? তাহলে পৃথিবীর সমাজ-শৃঙ্খলার পরিণাম হবে কি?

শরিয়তি বিধান সমস্ত মুসলমান দেশেই অবিকৃত থাকা বা রাখার কথা। ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতে যখন কারো ধর্মীয় বিধানের ওপর কলম চালানো হবে না এমন সংবিধান আছে তবে কেন হঠাৎ মুসলিম পারসোন্যাল ল-এর ওপরে সুপ্রিম কোর্ট খবরদারী করতে গেল? এটাতে কি ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রইল?

এই নিরপেক্ষতা কিন্তু ভারতের সব সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যই।

শরিয়তি বিধান অনুসারে যেভাবে তালাক দেবার কথা তা কি হচ্ছিল? অনেক তালাকই হয়েছে রাগের বসে এবং বিচার করে দেখলে তা অবৈধ।

বৈধ তালাকের পর দেন মোহর এবং পরে ইদ্দৎ পালনের সময় অর্থাৎ তিনমাস তেরদিন খোরপোশ অবশ্যই দিতে হবে। এ দুটি আদায় দেওয়া হলে স্ত্রীর সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকছে না। আট বছরের বেশি বয়সের পুত্র থাকলে বাপের কাছে থাকবে, কন্যা থাকলে থাকবে মায়ের কাছে। তালাক দেওয়া স্ত্রী আবার বিয়ে করতে পারবে।

সুপ্রিম কোর্ট বলছে তালাক দিলে আজীবন স্ত্রীর খোরপোশ দিতে হবে — তার সন্তানাদিকে মানুষ করার খরচ দিতে হবে, শুধু তাই নয় স্ত্রীকে শরিকও দিতে হবে।

বোঝা যাচ্ছে আদালত চায় তালাক আদৌ না হোক। আল্লাও তালাক অপছন্দ করেছেন। যে তালাক দেয় তাকে পৃথিবীর সব চাইতে নিকৃষ্টতম কাজের কাজী বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোনো কারণে স্বামী স্ত্রীতে অবনিবনাও হলে বা তালাক দেবার সম্ভাবনা দেখা দিলে বার বার তিনবার মিল মহব্বতের জন্য আত্মীয়স্বজন বা সমাজের প্রধানদের দ্বারা মজলিশ করার কথা বলা হয়েছে। তাতেও যদি আন্তরিক মিল না হয় তাহলে তালাকের ব্যবস্থা হতে পারে। এক তালাক দেবার পর স্ত্রীকে বুঝে দেখবার সুযোগ দিতে হবে। সময়ের ব্যবধানও আছে। দুই তালাক হবার পর যদি পুনরায় মিল মহব্বতের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে লোকজন খাইয়ে আবার নিকাহ বা সাদী পড়াতে হবে। আবার সময়ের ব্যবধানে তৃতীয় তালাক দেওয়া হয়ে গেলে আর কোনো রকম চারা নাই। স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। যদি সেই স্ত্রীকে নিতে হয় তবে অন্যের সঙ্গে নিকাহ পড়িয়ে সে যদি তাকে ব্যবহারের পর তালাক দেয় তবে নেওয়া যাবে — অবশ্যই আবার বিয়ে পড়াতে হবে।

পবিত্র কোরান হাদিসে কোথাও অমঙ্গলজনক কথা লেখা আছে এমন কথা আমার জানা নেই। বরং শরিয়তি বিধান অত্যন্ত মানবিক। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা মানা হয় না। যেমনভাবে অনেক লোকজন জুটিয়ে বিয়ে করা হয় তালাক দেবার বেলায়ও তেমনি হওয়া উচিত। কিন্তু বউ একটা সরা কিংবা হাঁড়ি ভাঙলে শাউরির গালাগালির পর স্বামী উত্তম মধ্যম ধরিয়ে দেয়। স্ত্রী বিগড়ে গিয়ে হয়ত গালমন্দ করে। কিংবা মারধরের চোটে বাপের বাড়ি পালিয়ে গেল। ব্যস স্ত্রী অবাধ্য, কথামতো চলে না— অযথা ঝগড়া করে— বেপর্দা হয়ে অন্য পুরুষেব সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে। হয়ত গোপন যোগাযোগও আছে। নানান সন্দেহ। তোতো হয়ে যায় প্রেম ভালবাসা। তারপর, তালাক এসে পড়ে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি রাগের বশেই স্বামী তার মোক্ষম ক্ষমতা প্রয়োগ করে পর পর এক মিনিটের মধ্যেই তিন তালাক দিয়ে বসে আছে। অজ্ঞান

দায়িত্বহীন শ্রোতা বা সাক্ষীরা সাব্যস্ত করে নেয় তালাক হয়ে যাওয়ার। বউ কোলের বাচ্চা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ি চলে যায়। অথবা স্ত্রীকে এক বস্ত্রে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবার পর আর নিয়ে এল না। অন্য একটি বিয়ে করে ফেলল। তারপর তালাকনামা পাঠানো হল। দেনমোহর কে আর আদায় দিচ্ছে? সে তো একখিলি পানের বিনিময়ে প্রেম-ভালবাসার সময়ে স্ত্রীর কাছ থেকে দেনমোহর মাফ চেয়ে নেওয়া আছে।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লোয়ার কোর্টগুলিতে হাজার হাজার তালাকের মামলা ঝুলে আছে।

স্বামী যদি হরদম পেটে আর তালাক না দেয় তবে মেয়ের বাবা কোর্ট থেকে তালাক নিলে খোরপোশের দাবিতে মামলা করার পথ বন্ধ।

একজন আলেম ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এবার তালাক বন্ধ হবে তো ?'

উত্তর এলো; 'হাঁ নিশ্চয়ই।'

বললাম, 'তাহলে তো ভাল। তালাক না দিলে খোরপোশের খেসারত বউয়ের বাপের বাড়ি পাঠাতে হবে না।'

একজন বলল, 'আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাব আর স্ত্রীর ওপর আমার খবরদারী থাকবে না--- সে যথেচ্ছাচার করে বেড়াবে?'

'সে যদি বিয়ে করে?' আর একজনের প্রশ্ন।

'খোরপোশের দাবী খারিজ হবে?

'মায়ের কাছে মেয়ে থাকলে তার খোরাকী কোত্থেকে মা যোগাবে?'

'বাবাকে বিশ্বাস নেই তাই বোধহয় মায়ের কাছে থাকার বিধান। আর সৎবাপ ব্যয়ভার না নিলে? কন্যা বড় হলে অবশ্য বাবা তার সাদীর খরচ দেবে। কিন্তু হাজারে একজনও দেয় না। তালাক দেওয়া স্ত্রীর সন্তান নাকি জারজ।'

বউ বলে,'তোমার মাথায় কড়কা পড়বে'

শরিয়ত বলেছে তালাক দেওয়া মেয়ের আবার বিয়ে দাও।

কিন্তু মাসে মাসে টাকা পেলে কোনো মেয়ের কি আর বিয়ে করবে? তাছাড়া বিয়ের বয়স পার হয়ে গেলে?

আসলে তালাকের মামলা গ্রহণ করছিল নিম্ন আদালতগুলি। কিন্তু হালে পানি পাচ্ছিল না। দীর্ঘদিন মামলা চলতে থাকে। চার পাঁচ বছর পর মামলার হয়ত রায় বেরুল। কন্যাকে দশ হাজার টাকা দাও। দেনমোহর এবং বাপের দেওয়া গহনাগাঁটি ও কাপড়-চোপড় বাবদ। নইলে জমি ক্রোক করা হবে। কিন্তু বাপের নামে যখন জমি তখন ছেলে জমি কোথায় পাবে? লোয়ার কোট তালাকের মামলা গ্রহণ করলেও ছেলে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট করে যদি বলত এটা বে-শরিয়তি মামলা তাহলে তা

খারিজ হয়ে যেত। কিন্তু এবার সেই মামলাকে পাকা করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

নুরুদ্দিনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল হাসিনার। একটা মেয়ে হবার পর পর্যন্ত স্বামী গালাগালি দিত। মারত, কানের মাকড়ি দেয়নি বলে। হাসিনার বাপের অবস্থা খুবই খারাপ। একদিন হাসিনাকে মেরে তেড়ে দিল নুরুদ্দিন। তারপর কিছুদিন পরে নুরুদ্দিন তালাকনামার কাগজ পাঠিয়ে দিল। দেনমোহর দিল না। হাসিনা এখন স্টেশনে বসে ডাব বিক্রি করে পেট চালায়।

শত শত নজির আছে এমন যারা তালাক দেওয়া বউকে দেনমোহর বা ইদ্দৎ পালনের খোরপোশ দেয় না।

শরিয়তের মধ্যে ভাল কথা লেখা আছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হচ্ছে না কেন তা নিয়ে তো শরিয়তরপন্থীরা লড়াই করছেন না। করছেন না এই জন্যে যে যারা তালাক দেয় আর মাস খানেক বাদেই বিয়ে করে আনে তারা অনেকে অসামাজিক জীব। মোল্লা মৌলবাদীদের তারা থোড়াই কেয়ার করে।

সুপ্রিম কোর্টের তালাক সম্পর্কিত রায় যে জনসমর্থন পেয়েছে তা বেশ বোঝা গেছে কিছু শরিয়তপন্থীদের বন্‌ধ ডাকা সমর্থন না পাওয়ায়। বহু শিক্ষিতা মুসলিম মহিলাও আদালতের মতকে সমর্থন জানিয়ে সভা করেছেন।

শরিয়তপন্থীদের মধ্যে যাঁরা মুসলমানদের বেশি উপকার করতে উঠেপড়ে লেগেছেন, তাঁরাই ক্ষতি করছেন বেশি। কোনো লোক ভোটে দাঁড়িয়ে যদি তাঁর নিজের ভোটটাই শুধু পান তবে ভোটের পরে তাঁর লজ্জা থাকলে পথে বের হতে পারবেন না।

আমরা এঁদের কথা সহানুভূতির সঙ্গে ভেবে দেখলে বুঝতে পারি অন্য আর একটা দিক আছে। দিকটা হল ঃ তালাক দেওয়া মেয়ে যদি জীবনভোর যৌবনকাল থেকে খোরপোশ পেতে থাকে তাহলে মুসলিম সমাজে বিধবাতে ভরে যাবে। এবং যৌনাচারে সমাজ কলুষিত হবে। যে মেয়ে বসে বসে টাকা পাবে অথচ স্বামীর খবরদারী শুনতে হবে না তার কাছে সংসার করার চেয়ে তো তালাক নিয়ে মামলা ঠুকে খোরপোশ আদায় করা বুদ্ধির কাজ হবে। তাছাড়া যদি যুবতী বিধবা থাকে চিরকাল তার সন্তানাদি না হলে মুসলমানরা সংখ্যায়ও বাড়বে না।

'বাংলাদেশ' মুসলিম দেশ — সে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের জন্য রেডিওতে হরদম আবেদন করছে অথচ ভারতের মোল্লা সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে কেন? ঐ একই ব্যাপার — শরিয়তের দোহাই একটা অজুহাত মাত্র।

এক মৌলবী মনের কথা টেনে বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'পৃথিবীর ম্যাপটা খুলে দেখুন, আলবেনিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলমানদের রাজত্ব — মাঝখানে ভারত কচ্ছপের মতো পিঠ জাগিয়ে আছে, এখানে আমরা সংখ্যালঘু হয়ে আছি। কাজেই

আমাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং করা পাপ'।

কিন্তু সংখ্যা দিয়ে কি শক্তির বিচার হবে? তাহলে জাপান, ইসরাইল, গ্রেট বৃটেন এসব দেশ পৃথিবীর ওপরে কর্তৃত্ব করে কি করে?

পৃথিবী জুড়ে সুস্থভাবে আধুনিক জীবনযাপনের প্রয়াস চলছে। গণতান্ত্রিক দেশের দারিদ্র বিতাড়ন, ভিখারি সম্প্রদায়ের উৎস কেন্দ্রকে নির্মূল করার প্রয়াস অযৌক্তিক নয়। বরং আরো ত্বরান্বিত হওয়া উচিত ছিল।

কে অস্বীকার করতে পারে যে মুসলমানদের মধ্যে ভিখারি সম্প্রদায় বেশি নেই ভারতে? অন্ধ, কানা, খোঁড়া, বিকলাঙ্গ, আতুর, পঙ্গু, জটিল রোগে মুমূর্ষু। পথে পথে তাদের ভিড়? এসব কি আল্লার সৃষ্টি?

সমাজকর্তাদের ভুলের ফসল এসব। অশিক্ষা দূর করতে অর্থনৈতিক মেরুদন্ড শক্ত না করতে পারলে কতিপয় ইউটোপিয়া গ্রস্ত ধার্মিক বগল বাজিয়ে এদের সুস্থভাবে বাঁচার ব্যবস্থা করতে পারবেন কি?

পরকালবাদীদের ভরসা ইহকাল গোল্লায় যাক, ভবিষ্যতে তাদের সোনার কেল্লা কেনা আছে বেহেস্তে। কিন্তু তালাক দেওয়া বউ দেনমোহরের টাকা আদায় না দেওয়ার জন্য এদের ফুলসেরাতের পথে কাঁটার বেড়া তৈরি রাখবে না কি ?

শরিয়তকে বিশুদ্ধভাবে পালন করলে, তালাক বেশি না হলে এবং লোয়ার কোর্টে তালাকের মামলা করে ক্ষতিপূরণ বা খোরপোশ আদায় করা গেলে সুপ্রিম কোর্ট নিশ্চয় এই কড়া রায় দিত না।

শীতভর নলেন গুড় ছেলেপুলেরা গুড়ের নাগাল পায় না

গোটা কার্তিক মাসটাই কামারশালায় কাজের ভিড়। হাপর চলছে। কাঠ কয়লার আগুন জ্বলছে। হাম্বরের ঘা মারার ঠনঠন শব্দ উঠছে।

ধানে সোনা রঙ ধরেছে, কাস্তে কাটানো চাই। খেজুর গাছ দেবার জন্যে শানানো চাই গাছ -কাটারি। ডাঙা জমিতে জো হলেই হাল করে খেসারি কলাই বুনতে হবে, তাই পুরনো লাঙলের আটচাল এঁটে ফাল্‌টা পিটে চরচর করে মাটি ফেড়ে যাওয়ার মতো ধারালো করে আনতে হয়। সারা বছর খড় কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে দাড়-মরে-যাওয়া (খড় কুঁচোনো) বঁটি; বাঁশ মুড়ো, বাবলা কাঠ বা আমকাঠের শেকড়ের টুকরো থেকে বাঁট তৈরি কাটারি পাজিয়ে দিতে হয়। বগলে বাইশের বাঁট চেপে দ্রুত হাতে বাবলা কাঠের গা চটিয়ে মাছ আনাজ কোটার বঁটি বানিয়ে শানে ধরতে হয়। শান ঘোরে। করকর কর — চরচর চক্‌ক। আগুনের ফুল্‌কি ছিটকে পড়ে। কামারশালায় কার্তিক-অগ্রহায়ণ শ্বাসে দম্‌ ফেলার সময় নেই কামারদেব।

পাঁঝা খানেক কাস্তে আর গাছ-কাটারি এসে পড়ে আছে। চাষীবাড়ি থেকে তাগাদা আসে ঃ কই হে উদয়, কবে মালগুলো দেবে।

বড় চাষী, যাদের জমি আর বাগান আছে বেশি, পঞ্চাশ থেকে একশোটা খেঁজুর গাছ মুড়ো দেবার জন্যে আলাদা লোক রাখতে হয়। যারা খেঁজুর গাছের রস সংগ্রহ করে এনে বান জ্বালিয়ে খুলিতে গুড় ফোটায়, পাটালি বানিয়ে দেয় তাদের বলে 'সিউলী'।

চাষী আসমান খাঁ তার সিউলী গোষ্ঠবিহারী হাজরাকে বলে, তুই আগে সব গাছ মুড়ো দে তো, পরে সব গাছগুলো নলালে বেশি রস পড়বে, পালাক্রমে কাটার জন্য গোটা পঞ্চাশ বেছে নিবি। সব গাছ মুড়ো দিলে কাঠপালা তো পেয়ে যাবি? গাঁ গাঁ করে তোর তিন পাকার বান জ্বলবে, তিন মণ রস ফুটবে রোজ — অঘ্ঘাণ-পোষ-মাঘ এই তিন মাসে কত কাঠ পুড়বে বল? তাছাড়াও কাঁটা জঙ্গল কেটে দিতে বলব। ফ্যাকড়া ডাঙা দিয়ে ঠেলে দিবি বানের মধ্যে। শহরের থ্রি-পিস কাঠের আসবাস; ফল আর যন্ত্রপাতি, কাঁচের জিনিসের প্যাকিং বাক্সের জন্যে গ্রাম অঞ্চলের পুরনো গাছ সব সাবাড় হয়ে গেল। আর সরকারি দেড় লাখ দু লাখ টাকার লোন নিয়ে বি এ, বি এস সি পাশ করা জোতদার বাড়ির ছেলেরা ব্যাঙ্কে জমির দলিল রেখে কাঠ চোরাই কারখানা করেছে রাজ্যের। আম, কাঁঠাল, শিরিষ, বাবলা, তেঁতুল, জাম, কথ্‌বেল এসব গাছ

ছাড়াও পাকা তাল, নারকোল, খেঁজুর গাছ কেটে ঠেলায় করে ফেড়ে এনে চাষীরা ঘরের আড়কাঠা ডাঁসা, পাড় বানাচ্ছে। ইলেকট্রিক করাতের মুখে সব গাছ করকর করে শব্দ তুলে ফেড়ে চলে যায়। এ বছর গাছ লাগানোর রাজকীয় হিড়িক গেল। পথের পাশে গাছ লাগিয়েই খালাস। জল দেবার কেউ নেই। অনেক মরে গেছে। শতকরা পাঁচটাও এখন বেঁচে নেই।.....

আসমান খাঁ একবার বকতে পেলে আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত কিছু বাদ দেয় না— শুনতে শুনতে ঘুম পায় গোষ্ঠ হাজরার। কাঠের চ্যাপটা লম্বা বেলেনে ধুলোবালি ছড়িয়ে দিয়ে গাছ-কাটারি ঘষতে ঘষতে তাড়ির নেশায় ঢুলতে ঢুলতে কেবল মাঝে মাঝে 'হাঁ কর্তা'— বলে সায় দিয়ে যায়।

খাঁ বুড়ি মুড়ি দিলে পিঁয়াজ লঙ্কা চিবিয়ে খেয়ে রগে ঘাম বার করে গোষ্ঠ কোমরে তালপাতায় বোনা 'খুঙি' বেঁধে, শিব ঠাকুরের গায়ে যেমন করে সাপ জড়ায় তেমনি করে 'কাছি' জড়িয়ে একাই মাঠে বাগানে খেঁজুর গাছ মুড়ো দিতে চলে যায়। বেলা ন'টা থেকে তিনটে পর্যন্ত যতগুলো পারে গাছ মুড়ো দেয়। চোদ্দ পনেরোটা গাছ তো হয়ই। তার বিশ্রাম নেই। সে ফাঁকি মারার বুদ্ধিও রাখে না। তবে ষাট বছরের পাক্‌তুড়ো বুড়ো হাড়ের গাঁটগুলো মাঝে মধ্যে খ্যাচ্‌ খ্যাচ্‌ করে আঁকড়ে ধরে। আসমান খাঁ তাকে দুপুরে ভাত খেয়ে যেতে বলে কিন্তু গোষ্ট বলে 'সময় পাই কই কর্তা' — তার চেয়ে চাল আনাজ দিও —নে যাবে। সেঁজের বেলা রান্না হলে বালবাচ্চা নে সব্বাই ভাত খাবো।'

গোষ্ঠ এত খাটে তবু তার অভাব জুড়ে আছে হাড়ে-মাংসে। ছোট্ট একটা মাটির কুঁড়ে ঘর। চালে খড় নেই। বউটা নাকি ভীষণ 'ওলুই' । সাত আটটা বাচ্চা। বউয়ের ড্যাবডেবে চোখ। কালো মোষ চেহারা। ঝাল কটকটে কাঁকড়ার তরকারি দিয়ে সেও নাকি এক ঝাঁপ তাড়ি পিয়ে হজম করে দেয়। কি করবে, পেটের জ্বালা। বড় ছেলে জন খাটে। বউ নিয়ে আলাদা খায়। বড় মেয়েটার বয়স কালে বিয়ে দিতে পারলে না — কোথায় চলে গেল।....

গোষ্ঠর গাছ মুড়ো দেওয়া শেষ হতে হতে জাঁকিয়ে জার পড়ে যায়। গাছ নলাবার জন্যে কঞ্চি কেটে নলী বানায়। পাটি চাঁছ দিয়ে প্রথম নলী পুঁতে ভাঁড় বেঁধে যে রস নামায় তাই হগ নলেন রস। এই রস কর্তারা সবাই খায়। কুয়াশায় চাদর মুড়ি দিয়ে যখন পৃথিবী অসাড় হয়ে পড়ে থাকে গোষ্ঠ তার খঞ্জুরে চেহারায় কেবলমাত্র একখানা গামছা জড়িয়ে ভোর চারটের সময় কখন এসে কুমীরের মতো এবড়ো খেবড়ো খেঁজুর গাছে উঠে ভাঁড় ভরা রস নামায়।

বাঁকে করে সব রস বানশালে বয়ে আনে। খুলি বসিয়ে বান জ্বেলে রস জ্বাল দেয়।

যখন তাতা রস ফোটে আসমান খাঁর বাড়ির আনড়া-গুষ্টি আসে পেয়ালা ভরা মুড়ি নিয়ে। তাদের এক 'উড়খি' মালা করে তাতা রস দিতে হয়। মিষ্টি ঘ্রাণে চারিদিকটা ম-ম করে।

'চাল্‌তা ফুট' মরে দুপুর পর্যন্ত। 'সরবে ফুট ' ধরে। গুড় উথলে উঠলে উড়খি মালায় করে এ খুলির গুড় ও খুলিতে চালান করে।

আসমান খাঁর কলেজে পড়া মেয়ে হালিমা চাতুরী করে বেশি জ্বালন-কাঠ বানে ঠেলে দিয়ে আমোদ করে যাতে তাতা রস প্রথম দিকে প্রচন্ড বেগে উথলে উঠে খুলি ঝাঁপিয়ে যাবার সময় গোষ্ঠ হাঁ হাঁ করে ব্যস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করে খেঁজুর পাতার 'ঝাঁটি-পাতা চাপে।

হালিমা বলে, 'তোমার বউটা যেন মাকালী। দারুণ গতর। কত ভাত খায়?'

গোষ্ঠ বলে, 'পাঁচ পো চালের ভাত চিংড়ি শুক্‌টি ভর্তা কিংবা ফ্যান দিয়ে সপাসপ মেরে দেয়। শাক-কচু-শামুক-কাঁকড়া-তাড়ি খায়। গায়ে খুব বল আছে ওর। আমি একবার রেগে গিয়ে এক চড় দিতে আমাকে ধরে নিয়ে পানা পুকুরে ছুড়ে ফেলে দিলে।....

হালিমা হাততালি দিয়ে উঠল।

বিকেলে গুড় ঘষতে ঘষতে আপন মনে মনসার ভাসানের 'ভেন-বাড়ি' দিয়ে গান গায় গোষ্ঠবিহারী। মাঠের খেঁজুর গাছ চাঁছার সময়ও সে ওই একই গান গায়। নয়তো কেষ্ট যাত্রার গান।

পঞ্চাশটা গাছ তিন পালা করে কাটলে কটা করে হয় ঠিক করতে পারে না গোষ্ঠ। পালা মানে পরপর দুদিন কাটবে একই গাছ। প্রথমদিন 'জিরেন-কাঠ'। দ্বিতীয় দিন 'দো-কাঠ' । তৃতীয় দিন ভীষণ গেদে যাবে। তখন বাদ। আবার তিন-চারদিন জিরেন দাও গাছকে অন্য গাছ কাটতে হবে তখন। তারপর আবার অন্যগুলো। প্রথমদিকের গুলো আসবে আবার।

যতদিন শীত ততদিন খেঁজুরের রস। মাঘ মাস পার হয়ে গিয়ে হঠাৎ যখন গরমের হাওয়ায় আকাশে মেঘ দেখা যাবে রাতকালে — কুয়াশায় ভরে যাবে দিক্‌দিগন্ত, খেঁজুরের রস কেটে যাবে। ঘোলা তাড়ি হয়ে টকে যাবে। সেই রসের গুড় টকো হবে।

ফুট একটু বেশি হলেই চিটে হয়ে যাবে। কখন গুড় নামাতে হবে তা জানা চাই। গুড় ঘষে বালি করে কলসী ভরে আসমান খাঁর ভাঁড়ার ঘরে রেখে আসতে হয়। পাতলা গুড়, মাত গুড়, বালি গুড়, চিটে গুড় — গুড় চার রকম। মাতগুড়ে পাতলা আর করকরে বালি বা দানা থাকবে — কালো লাল্‌চে রঙ। বালি গুড় হ'ল সাদাটে — ঘন মিহি বালি বা দানা যুক্ত। পাটালির গুড় আরও ঘষতে হয় শুকনো মত হলে

পাত্রে কাপড় পেতে তাতে ঢেলে দাও। পরের দিন তুলে বাজরায় সাজিয়ে নিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দাও।

পাইকের এসেও নিয়ে যায়। কলসী ভরা গুড় বিক্রি করে আসমান খাঁ বর্ষাকালে যখন বেশি দাম ওঠে। বর্ষায় মাত্ গুড় না বেচেও উপায় নেই, উথ্‌লে উঠে ঘর ভেসে যায়। বালি গুড় 'ডাব্‌রি', বা কলসীর মুখে মাটির খ্‌রি বসিয়ে কাদার লেপন দিয়ে মুখ-আঁটা থাকবে, কোনও ক্ষতি নেই। তবে মাত গুড় উথলে পড়ে গেলেও শীতকালে দেখা যায় শূণ্য কলসীর নিচে মিছরি জমে আছে।

গোষ্ঠর বউ কখনও খাঁ বুড়ির কাছে চাল -আনাজ নিতে এসে গোষ্ঠকে সাহায্যও করে। কানাচি খুলে রসের ভাঁড় ধুয়ে উপুড় করে রাখে কিছুক্ষণ — তারপর বানের আগুনের ওপরে সবগুলোকে সাজিয়ে সাজিয়ে পোড়াতে হয়। রোজই রসের ভাঁড় পোড়াতে হবে— নইলে রস টক হয়ে যাবে।

গোষ্ঠর বউ ভীষণ লোভী। কেউ নেই দেখলে তার আদরের বুড়ো স্বামীর হাতে পায়ে ধরে কেজি খানেক গুড় আদায় করে নিয়ে জিভ দিয়ে তাড়াতাড়ি চেটে মেরে দেয়।

গোষ্ঠ শত মণ গুড় তৈরী করলেও তার ছেলেমেয়েরা তার এক খুরিও খেতে পায় না। তাদের বাবার গায়ে কেবল রস আর গুড়ের কেমন মিষ্টি গন্ধ বের হয়।

সবাই তাই বাবার গায়ে মুখ রেখে ঘুমোয়।

বাজনা হারাম ঃ ব্যান্ড পার্টিও মুসলমানদের হাত থেকে চলে যেতে পারে

কলেজ স্ট্রীট আর চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনুর মাঝখানে মহাত্মা গান্ধী রোডের দক্ষিণ দিকে ব্যান্ড পার্টির বাজনাদার সারি সারি দোকানে বাজনার যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসে আছে। এরা ভাড়াটে বাজনা —'বাজারী বাজা'।

বিয়ে-সাদিতে বা উৎসব -আনন্দে শোভাযাত্রায় বাজনার যে 'জোড় বা পার্টি যায় — তারা হ'ল ছ'রকমের ঃ (১) ঢোল-তাশা, (২) র‍্যাওশোন চাওকী, (৩) নাবত, (৪) তুরহী ও কৃরনা, (৫) ডংকা ও বিগুল, (৬) ইংরেজি বাজনা, যাকে বলা হয় 'আর্গন বাজা'- এর সমাদর দিন দিন বেড়েই চলেছে।

গান বাজনা হারাম হলেও এখনো বড় বড় ওস্তাদ গাইয়ে মুসলমানরা, অযোধ্যার নবাবরা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বিলাসী শরিয়ত বর্হিভূত কার্যকলাপ করতেন। লক্ষ্ণৌ ছিল নবাবদের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান। সেখানে ঘরানা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গায়কদের বংশানুক্রমিক লীলাভূমি। মধ্য প্রাচ্যের বাজনার সঙ্গে প্রাচ্যের বাজনার মিলন ঘটিয়ে, মধ্যপ্রাচ্যের আগত শাসক শ্রেণীর এদেশে সহ অবস্থান বিয়ে-সাদি কুটুম্বিতার পর যে খানাপিনা, পোশাক আশাক, আরবী ফারসী আর হিন্দির মাঝামাঝি উর্দু ভাষার চল্ আর তার কবিদের আড্ডা দিল্লি ছেড়ে লক্ষ্ণৌয়ে বাসা বাঁধল। দিল্লির বাদশাহদের ওপরে আলেম-মওলানাদের প্রভাব থাকলেও অযোধ্যার নবাবরাও তাঁদের বড় একটা পরোয়া করেননি। তাঁরা বাজি -বাজনা গান বাঈনাচ, এমনকি নবাব ওয়াজেদ আলি শা নিজে কৃষ্ণ সেজে ষোলজন সখি নিয়ে যাত্রার দল খুলেছিলেন। পাগলাটে নবাব নাসিরুদ্দিন শা নিজে মেয়ে সেজে বসে থাকতেন। নবাব হায়দরী খাঁ ছিলেন গানের একান্ত ভক্ত। কাজেই শরিয়ত মতো সুন্নীরা গান-বাজনা হারাম করলেও শিয়ারা তা চালিয়ে চললেন। নইলে সংস্কৃতি বাঁচে না। গান-বাজনা হারেম হয়ে যায় সম্ভবত আব্বাস যুগে, যখন ইসলামের স্বর্ণযুগ, খালিফা আল্ মামুনের সময়। তখন কাওয়ালী গান এমন প্রাধান্য বিস্তার করে যে মানুষ গান বাজনায় উন্মত্ত হয়ে ঘর-সংসার নষ্ট করে ফেলে। প্যালা ধরতে থাকে সোনাদানা। জমি-জিরেত, মায়-বউ বা কন্যাকে পর্যন্ত। তখন আইন করে গান -বাজনা হারাম করে দেওয়া হয়। বলা উচিত ছিল গান-বাজনা উন্মাদনা হারাম। কারো কারো মতে মোয়াবিয়া বা এজিদের বংশধররা যাঁরা উমাইয়া বংশ নামে ইতিহাসে পরিচিত তাঁদের সময়ে শরিয়ত বর্হিভূত বহু কিছু আরবী লোকাচার ইসলামে ঢুকে পড়ে— অব্বাস যুগে তা বাছাই করা হয়। আবার অনেক চলেও আসে। শিয়ারা

ইরানে প্রবল হয়ে ওঠেন আর ভারতেও তাঁদের প্রভাব বাড়ে। গান-বাজনা তাঁদের মধ্যে চলতে থাকে। সাদির দরবারে নহবত বাজনা বাজাতে হ'লে তাই মুসলমান খাঁ সাহেবদের আনতে হ'ত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জলসা বসলে লক্ষ্ণৌ থেকে আসেন খাঁ সাহেবরা। খাঁটি ঘিয়ে মোলায়েম করে বানানো আশি পর্দার জালি পরোটা আর তাজা মোরগের সুরুয়া খেয়ে খাঁ সাহেব দরবারী সঙ্গীত আরম্ভ করেন। তানপুরা, সারেঙ্গী, এস্রাজের টংকার উঠতে থাকে।

কাওয়ালীতে তালে তালে হাতের তালি বাজানোর সাথে সাথে তাম্বুরা, ঢোলক ইত্যাদি এমন বাজে যে শ্রোতারা মস্তানা হয়ে গিয়ে নাচতে থাকে। কাওয়ালীর অন্তর্নিহিত বক্তব্য নিয়ে মাঝে মাঝে শিয়া-সুন্নীর মধ্যে মারামারি ফাটাফাটি হয়ে যেত।

খোলা বাজারে বা ধর্মীয় সংসারে সমাজে মুসলমানদের মধ্যে এখনো গান-বাজনার চল্ না থাকলেও জীবনের দায়ে অন্য বাঁকা পথে ব্যান্ড পার্টির বাজনাদার তাঁদের বাজনার চলন টিকিয়ে রেখেছেন। ইংরেজি বাজনাকে মেনে নিয়েছেন। ইংরেজরা রাজ্যপাট কেড়ে নিল, তাদের ধর্ম যীশু খ্রীস্টের, তারা শূকর খায়, তাই ইংরেজি শেখাও এককালে (হারেমের মত) অধম কাজ বলে বনেদী মুসলমানরা মনে করতেন। কিন্তু যা মানুষের ভাল লাগে যার কদর পৃথিবী জোড়া যেমন ইংরেজি ভাষা, তাকে ঠেকানো গেল না। ইংরেজি বাজনার চলও বাড়তে লাগল। যার ছেলে লেখাপড়া ভাল শিখল না, বাজনার পার্টিতে পড়ে থেকে বাজানো শিখে ভাড়া হলে জেলায় জেলায় দূরে দূরে চলে যেতে লাগল। ব্যান্ড পার্টির পোশাক পড়ে যখন বাজনা বাজাতে থাকে তখন মানুষের চোখ পড়ে তাদের ওপরে। খেলার মাঠে ফাইনাল হচ্ছে, ব্যান্ড পার্টির মাস্টার হরমুজ মিয়া রাজকীয় রাংতার পোশাক পড়ে বর্ণাঢ্য হয়ে তালে তালে রূপোলি দন্ড দোলাচ্ছেন, তখন তাঁর কতখানি মর্যাদা। চল্লিশ জন বাজনাদার 'রোওশন চৌকি' বাজাচ্ছে। ড্রাম বাজাচ্ছে তালে তালে। বাজছে কনর্সাট, ফ্লুট, বিউগল। সারি দিয়ে মার্চ করে চলেছে। পার্টি বড় করাও যায়। একশো জন দুশো জন। নানা রঙের সার্টিনের পতাকা হাতে। রাজার বাড়ীর বিয়ে হলে বাজনার পার্টিও তেমনি জোরদার হয়। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের ভেতরে পিয়ারলেস জেনারেল তাঁদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ডবল পার্টির যে ব্যান্ড বাজনা দেয় তা যে কতখানি বর্ণাঢ্য আর গৌরবজনক হয় যেসব মোল্লা-মৌলবী না দেখেছেন, - কে তাদের বোঝাবে। মনে আশা, বেহেস্তে তাঁরা এসব দেখবেন।

ব্যান্ড পার্টি এখন হিন্দি গানের বাজার চালু গানের সুর বাজায়। 'হাওয়ামে উড়তা যায়ে মেরা লাল দোপাট্টা'...... অথবা 'মেরে হমদম'... 'নাগিনওয়ালা আয়েগা'...

মুসলমানদের অনেক ব্যান্ডপার্টি আছে হ্যারিসন রোডে। অনেকেই হাওড়া হুগলির

লোক। এঁরা কলেজ স্ট্রিটের চারপাশে ছড়িয়ে আছেন। অনেকেই জাত ব্যবসায়ী বাইন্ডার, অফ সেলার, বেকারী, পরচুলের কারবারী, দর্জি, ব্যান্ডপার্টির লোক, ঝালাই কারবারি, চামড়ার জাবনদার।

ব্যান্ড পার্টির ডাক পড়ল হয়ত মুর্শিদাবাদে কিংবা জলপাইগুড়িতে। বাজনা নিয়ে পোশাক পরে ট্রেনে চড়ে চলল পার্টি। বিয়ে বাড়ি হলে সেখানে জুটবে উত্তম খানা পিনা। পাঁচশো টাকা ভাড়া হলে অর্ধেক টাকা দিয়ে যেতে হয়। কর্তারা নাম ঠিকানা লিখে রেখে যায়। তারিখ মতো দল গিয়ে 'ব্যাকপাই' ব্যাগ পাইপে চাপ দিয়ে বাজনা বাজায় দড়াদম দড়াদম—ড্রাম পিটতে থাকে। 'ফুলোট' বাজে পোঁ ধরে।

নানান অভিজাত ক্লাবে এখন ড্রাম বাজানো শেখানো হয়। উৎসবে তারা নিজেরাই বাজায়। তাদের এখন রুচিশীল স্কাউট দলের সাদা পোশাক।

হরমুজ মিয়া, কাদের মিয়া, ইয়াসিন মল্লিক, ইউসুফ মল্লিক, গোলামমালীর বাজনার পার্টি এখন নাকি 'হাঁটুধরা' হয়ে গিয়েছে। ডাক না হলে বসে বসে মাইনে দিয়ে লোক রাখা কি চাট্টিখানি কথা! এ তো আর নবার ওয়াজেদ আলি শাহের দরবারী ব্যান্ড পার্টি নয় যে বসে বসে মাইনে পাবে। ভাল বাজনাদার হলে অবশ্যই বড় পার্টিতে তার কদর আছে। কিন্তু মাস মাইনের বাঁধা মানুষটা যদি সংসার রক্ষে করতে হুগলী জেলার কানা নদীর তীরের কোনো গ্রামে চলে যায় তবে হঠাৎ পাওনা দিয়ে অন্য পার্টির লোককে নিতে হয়। অনেকে এখনো ঠিকে ব্যবসা চালান। দূরের ডাকে গেলে তিরিশ টাকা রোজ পাবে। তাদের পয়সাতেই খাওয়া-দাওয়া। পার্টির মালিক নিজেই হয়তো ব্যাঙের মতো গাল ফুলিয়ে কনসার্টে প্যাঁ পোঁ করে দম দেন।

মুসলমানরা খুব বড়লোক হলেও যদি ইমানদার বা ধর্মভাবাপন্ন হন তবে বাজনা হারাম বলে তাঁদের সাদর আহ্বান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ মুসলমানদের কাছ থেকে ডাক আসে শতকরা একটা। বাকি নিরেনব্বইভাগ ডাক আসে অমুসলমান ভাইদের কাছ থেকেই।

একজন ব্যান্ড পার্টির মালিক বললেন, 'আমরা আর পার্টি রাখতে পারব না — বাজনার যন্ত্রপাতির দাম অনেক। তারপর লোক পোষা কঠিন। যত জিনিসের দাম বাড়ছে মানুষ বিলাসিতা ত্যাগ করছে। পরে হয়তো ফোনে বা পোষ্টকার্ডেই বিয়ে সাদি সমাধা হয়ে যাবে। উন্‌কি, মশা, মাছিও নেমন্তন্ন পাবে না। তবে মাড়োয়ারীরা তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়েতে এখনও বাজনা বাজায়। ওদের পয়সাতেই কোনোক্রমে এখনো টিকে আছি। ব্যান্ড পার্টিও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে দেখে যদি আমাদের সরকারী সাহায্য বা ঋণ মেলে তবে বেঁচে যাই। নইলে দশ হাজার টাকার বাজনা কিনে পার্টি চালানো শক্ত। অনেকে আমাদের কাছে বাজনা শিখে সারকাসের বাজনা পার্টিতে চলে যায়

ভাল মাইনের লোভে।

প্রশ্ন করলাম, 'ব্যান্ড পার্টি সংস্কৃতির অঙ্গ বলছিলেন, কোন সংস্কৃতির? মুসলিম সংস্কৃতির বললে তো শরিয়ত পন্থীরা সায় দেবেন না। বাজনা তঁদের কাছে তো হারাম। বরং ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে পারেন।'

উত্তর হল : 'কিন্তু দেশ স্বাধীন হলে তো রেডিও টেলিভিশন অফিস খুলতেই হবে— গান বাজনা চালাতেই হবে। ঢাকা, তেহরান, করাচি, ঈজিপ্ট, বাগদাদ কি করছে? বাদশাদের মাথায় চড়ে মাথাভারি মৌলবীরা যেসব ফতোয়া চালাতেন এখনো তাঁরা আমাদের সমাজের তলায় পড়ে হাত-পা নাড়ছেন। তাঁরাই তো এখন আমাদের নদবদে বনিয়াদ। তাই আমরা শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারছি না। ভাত দেবার মুরোদ নেই কিন্তু তাঁরা কিল মারবার গোঁসাই। তাই আমরা জাতে থেকেও বেজাতীয় কর্ম করে যাচ্ছি। পরে হয়তো মুসলমানদের হাতে ব্যাণ্ড পার্টির বাজনাটাও আর থাকবে না।'

সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই জন্মনিয়ন্ত্রণ অবৈধ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখন দেশের একটা প্রধান সমস্যা। কয়েক বছর ধরে অনেক অর্থনাশ করে এ পর্যন্ত মাত্র ছাব্বিশ লক্ষ লোক জন্মনিয়ন্ত্রণের আওতায় এসেছেন — এদের মধ্যে হয়ত মরেও গেছেন অনেকে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে যত লোক, বোধহয় বিপক্ষে আছেন তার চাইতে বহুগুণ। জন্মনিয়ন্ত্রণ যে দারিদ্র্য দূরীকরণের একটা বড় উপায় এটা সবাই (জেগে ঘুমানোর মত।) বুঝছে না। তাঁদের উপরে হাজারজন গুরুদেব, পান্ডা, মুরুব্বি আছেন যারা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে চালান। এইসব পান্ডা বা গুরুদের বক্তব্য সন্তান ঈশ্বরের দান। তার আসার পথকে নিয়ন্ত্রণ করা অন্যায় এবং পাপ। আহার্য দেবার মালিক ঈশ্বর।

একজন পুরোহিত যখন একথা বলেন তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে তাঁর বা তাঁর উত্তরপুরুষেরা শাখা-প্রশাখায় বাড়তে থাকা শিষ্য বা ভক্তদের ঘাড়ে পা তুলে রেখে খাবার সুরাহায় ভাঁটা পড়বে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করলে। আর মানুষ উচ্চ শিক্ষা পেয়ে আঞ্চলিক ধর্মীয় গোঁড়ামির বাইরে চলে গিয়ে যদি গোটা পৃথিবীর ভাবনা ভাবে তবে এই সব পান্ডাপুরোহিতদের প্রাচীন, সীমিত এলাকা ভাঙবে।

তাই কোনো এক বিখ্যাত মন্দিরের পান্ডাকে তাঁর ধর্মীয় রীতিনীতি না মানাতে বলতে শুনেছি, 'শড়া শিক্ষিত হইচু?'

তবে হিন্দুধর্মে ফ্রি থিংকিং আছে, যে যেমন মতবাদে বিশ্বাস করে করুক। যদি কোন ভক্ত গাধার (উল্টো) পিঠে মহাদেব বা কৃষ্ণকে উল্টো মুখো করে রাস্তার মোড়ে বসিয়ে পুজো করে কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু মুসলমানদের যে পাঁচটি ফান্ডামেন্টাল থিওরির ওপর ইসলাম ধর্ম খাড়া আছে তার বাইরের কোনে বে-শরিয়তি চিন্তাকে স্বেচ্ছায় দাঁড় করাতে যায় বা চায় তবে তাকে অসামাজিক , বাতুল, বেদ্বীন, শয়তান বা কাফের বলে ঘৃণায় পরিত্যাগ করা হবে।

আমাদের সমাজে নিজস্ব চিন্তার কোনো মূল্য নেই। তাই প্রতিভার মৃত্যু ঘটে মায়ের কোলেই।

ইসলাম আসার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। জনসংখ্যা বাড়ানোই তার নীতি ছিল। দেশ থেকে দেশে ছুটে গেছে তার বিজয়ী বাহিনী। দেশ জয়ের পরেই সে দেশে বিয়ে করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে। ইংরেজদের এখানেই হার।

পৃথিবীতে তাদের রাজত্বে এককালে সূর্য অস্ত যেত না কিন্তু এই উপনিবেশবাদ বিংশ শতাব্দীতে উৎখাত হয়ে যেতে তাদের বংশধরেরা ক'জনই বা আর রইল বিজিত রাজ্যগুলিতে। সব ক্ষমতা লন্ডনমুখী করার ফলে হোমের টানে প্রশাসকরাও পলাতক হলেন — রেখে গেলেন কেবল কিছু নেটিভ অ্যাংলো খ্রীষ্টান। দু'শো বছরের শাসনে তাদের সংখ্যা এমন কিছু বাড়েনি। কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা আল্লার কৃপায় বেড়েছে অনেক। অবস্থাপন্ন সৈয়দ-কাজী-মফতি-মীর ইত্যাদি শরীফ বা আশরাফ পরিবারের ধর্মভক্ত কর্তারা বিবিও করেছেন একাধিক। অবস্থা ভাল হলে চার বিবি রাখতে পারায় ধর্মীয় নির্দেশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায় হয়েছে।

তিনশো বছর আগে একজন দরিদ্র মুসলমানকে খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল, কেননা তাঁদের হাতে ছিল রাজ্যপাট। রাজ্যপাট চলে যাবার পরও লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল যেসব পরিবারের তাদের আয়াসে দিন কাটছিল — বিবি আর সন্তানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ভাবনা ছিল না। কিন্তু লাখেরাজ সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। পীরত্বর ভূমিরও শরিক বাড়ল। শরিকের বখরা নিয়ে মারামারি হয় বলে সরকার পেলা বা নজরানা পড়ার সিন্দুক বসালেন। যাইহোক্, রাজত্ব গেলেও মুসলমানরা মাটির অধিকার হারাল না। ভারত তিন টুকরো হয়ে গেল। দু'দিকের দুই পাল্লায় পাকিস্তান আর বাংলাদেশ স্বাধীন মুসলিম দেশ তৈরী হ'ল।

কিন্তু বাংলাদেশ আট কোটি মানুষের দেশ। ছোট্ট একটি প্রদেশের মত দেশে যদি তিন চারটি মিলিত প্রদেশের চাইতেও বেশি জনসংখ্যা হয় আল্লার কৃপায় ভাবের বন্যায় ভেসে যাবার কথা না ভেবে শাসকবর্গ ধর্মনিষ্ঠতার মধ্যে থেকে ফতোয়া দিলেন, আমাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ঢাকার জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচার ভদ্রভাষায় সব চাইতে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

এসব শুনে এখানের মৌলবী আলেম ভাইরা চুপচাপ। তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'ওখানে ওদের প্রয়োজন।'

তাহলে ভারতে মুসলমানদের জন্মনিয়ন্ত্রণের কি প্রয়োজন নেই?

মৌলবী ভাইদের চোখ লাল হয়ে ওঠে এবং যদি কোন বেওয়াকুফ বান্দা দারিদ্রের দায়ে পড়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছেন বলে জানতে পারেন তিনি ক্ষুব্ধ রুষ্ট হয়ে দাওত গ্রহণ করার পরও খানাপিনা না খেয়ে দুপুরবেলা চলে যান।

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে বা পক্ষে ধর্ম কি বলেছে এ নিয়ে হাজার জন হাজার কথা বলেছেন। বিপক্ষে যেসব মত দাঁড় করান হয়েছে তাও অত্যন্ত দুর্বল।

একদিন এক মৌলবীর কথায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'ভাই গোপন কথা আছে এর ভেতরে। পৃথিবীর ম্যাপটা খুলে দেখুন। সুদুর ইউরোপের

আল্‌বেনিয়া থেকে আফ্রিকা মহাদেশ হয়ে আমাদের মুসলিম দেশ সেই ইন্দোনেশিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। মাঝখানে ভারত কচ্ছপের মত পিঠ জাগিয়ে আছে। এখানে আমরা এখন সংখ্যালঘু। এই সংখ্যা লঘুত্বের অভিশাপ খন্ডন করতে হলে আমাদের কিছুতেই জন্মনিয়ন্ত্রণ করা চলবে না। তাই আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণ একটা পাপ কাজ বলে চালাচ্ছি।' তাহলে এটা যতখানি পাপ কাজ বলে চালানো হচ্ছিল, ততখানি নয়? আগে তো মৃত্যুর পর জন্মনিয়ন্ত্রণকারী 'জানানা' পড়াশে পর্যন্ত বন্ধ করছিলেন কোন কোন মৌলবী-মোল্লা সাহেব।

মৌলবীর ঝোলার ভেতর থেকে বিড়ালটি বার হবার পর কোন্ মুসলমানের গর্ব না হয় পৃথিবীর মুসলিম দেশগুলোর দিকে তাকালে?

কিন্তু যে পরিবারে আট-দশজন লোক আবির্ভাব হ'ল তাদের ভরণপোষণের দায় কে নেবে? কি করেই বা ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হ'বে, লেখাপড়া শিখবে? জমিজমা ক'জনেরই বা আছে? আর জমি থাকলেও তো ক্রমে তা বখরা হতে হতে কিছুই আর থাকবে না।

হঠাৎ শুনলাম কোন এক মশহুর নামা পীর পরিবারের ছোট হুজুরের ৬৮ জন সন্তান সন্ততি আছে। সব সন্তানকে তিনি চেনেন কিনা সন্দেহ আছে! চার বিবির এতগুলি সন্তান হওয়া হয়ত সম্ভব নয়, তবে এর মধ্যে গোড়ার দিকে বিবিদের বয়স হলে তালাক দিতেই বা কতক্ষণ, তাছাড়া মরা-হাজাও তো আছে, এবং মরলে বা ছুটে গেলে আবার সেই শূণ্যস্থান পূরণ করে যদি সর্বদা আল্লার ইচ্ছায় চারজন বিবি থাকেন তাহলে শরিয়তের মর্যাদা বহাল থাকবে। (একেই বলে ন্যায়ের ফাঁকি?)

জনসংখ্যার দাবিতে রাজ্যপাট দখলের রীতি রাজনীতিতে একটা বড় হাতিয়ার সত্য কিন্তু সুষ্ঠুভাবে বাঁচার জন্য আজ জাপান বা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের দিকে তাকালে বুঝতে পারি এটা কত বড় বাতিল চিন্তা।

স্বদেশের উন্নতির জন্য গঠনমূলক কাজে ভারতের ক'জন মুসলমান আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। যাঁরা সচেষ্ট তাঁরা বরং স্বসমাজ কর্তৃক নিন্দিত। কারণ স্বাধীন ভূমি না পাওয়া পর্যন্ত তার মঙ্গলের চিন্তা করাটা নাকি পরের ছেলেকে মানুষ করার মত।

সাপের লেখা আর বাঘের দেখা

'সাপের লেখা আর বাঘের দেখা' বহুকালের এই প্রবাদটি আমাদের ভাগ্যবাদী দেশে চলে আসছে পাথরে খোদাই করা অভ্রান্ত বাণীর মত।

শিক্ষিত লোকরা সাপ সম্বন্ধে রাত-বিরেতে যদিও বা সাবধান হয়ে আলো নিয়ে পথ চলেন অশিক্ষিত লোকেরা কিন্তু অন্ধকারে বনঝোপভরা প্রায় নির্জন পথে একাই সাহসভরে যাতায়াত করে, তাদের ধারণা কপালে লেখা না থাকলে সাপে চোট করবে না। হিন্দুরা ভয়ে তবুও মা মনসার ডালা দেয়।

রাতকালে গ্রামের মানুষরা সাপের নাম করে না, বলে 'লতা'।

কপালের লিখন বাজে কথা, বিষাক্ত সাপ দেখলেই তখনি মেরে ফেলা উচিত। সাপ খুব ভীতু প্রাণী। মানুষকে সে খুব ভয় করে। সাপ বহুকাল থেকে জেনে এসেছে মানুষই তাদের প্রধান শত্রু। আর তাদের আস্ত গিলে ফেলে ময়ূর, গরুর পাখি এবং গোসাপ। নেউল ও ইঁদুর ভ্রমে আক্রান্ত হলে নখ মেরে বা কামড়ে সাপকে ঘায়েল করে ফেলে। সাপ ক্ষিদের জ্বালায় ব্যাঙ বা অন্যসব মাছ ধরে খেলেও কখনো কই, মাগুর, শিঙি, ট্যাংরা মাছ খায় না কাঁটা আছে বলে। তাই এসব কাঁটাওলা মাছ অবাধে জলস্রোতে বেয়ে উঠে অন্যত্র চলে যায়।

সাপের ভয়ে ঠুক করে একটু আঘাত লাগলেই তার মেরুদন্ডের গাঁট ছেড়ে যায়, তাই যত দ্রুত পায়ে বনে-ঝোপে-আড়ালে বা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে কিন্তু সে সুযোগ না পেলে আগেভাগেই চোট করে দিয়ে শত্রুকে জখম করে দেয়।

বিজ্ঞানীদের মতে, সাপের বিষ নাকি বিষ নয়, হাই প্রোটিন। মানুষ অতখানি প্রোটিন আকস্মিক শরীরে আয়ত্ত করতে পারে না। রক্তের হিমগ্লোবিন নামক কণিকাকে জমিয়ে দেয়, তাই যন্ত্রণা হয়, পরে পচন ধরে যায়।

নাবাল জলাভূমি অঞ্চলে যেখানে সাপের খাদ্য আছে সেখানে সাপ জন্মায় প্রচুর, আর তাদের কামড়ে মানুষ মরেও কিছু কিছু। সাপে কামড়ানোর যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র। বোড়া সাপ কামড়ালে বরফ চাপানোর মত কনকন করে আর কেউটে কামড়ালে 'জ্বলে গেল পুড়ে গেল' বলে লোকে। তাই ওঝা, গুণীনরা মন্ত্র পড়ে এককালে সাপে কাটা রোগীদের নিয়ে রোজগারও করত। মনসা দেবীর আবির্ভাবও হয়েছে তাই। কিন্তু এ যুগে মন্ত্রে বিশ্বাস চলে গেছে প্রায়। চার ঘন্টার মধ্যে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে রোগী বেঁচে যায়। চাষ আবাদে কীটনাশক বিষ প্রয়োগের ফলে বিষাক্ত

সাপ প্রায় আর দেখাই যায় না। তারা ক্রমেই লোকালয় ছেড়ে দূরের বনজঙ্গল বা জলাশয়ের দিকে সরে যাচ্ছে।

আর বাঘের দেখা কথাটা কিন্তু সত্যি। দেখা হলে আর উপায় নেই। অনেকের ধারণা, যে বাঘ কখনো মানুষ খায়নি সে মানুষ দেখলেও কিছু করবে না। কথাটা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। বাঘ সবসময় ক্ষুধার্ত। তাকে সব প্রাণীই ভয় পায় বলে চকিতেই তারা লুকিয়ে পড়ে। আর বাঘ যদি একটি গরু মারে, টেনে নিয়ে গিয়ে বুক ফেড়ে যকৃৎ, ফুসফুস, পিলে এইসব নরম জিনিস আর রক্ত খেয়ে মাংসকে পচানোর জন্য লুকিয়ে রাখে। কিন্তু ফেউ বা খ্যাঁক শিয়ালরা তাকে চর দেয়, প্রভুর অনুপস্থিতিতে অনেকটাই শেষ করে দেয়। বাঘ পচা নরম মাংস খায় বলে তার গায়ে থাকে দুর্গন্ধ। আর সেই গন্ধ পেলেই তীব্র ঘ্রাণশক্তির অধিকারী হরিণ বা শিয়ালরা সাবধান হয়। কিন্তু মাথা মোটা শূকর তার চর্বিভরা নদবদে শরীর নিয়ে তেমন জোরে দৌড়তে পারে না, সহজে মারা পড়ে। খরগোশও বাঘের খাদ্য। গরুর কানের মতো ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ঝুপ করে লুকিয়ে পড়ে মাথা গোঁজে কিন্তু বাঘের চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন। সুন্দরবনের মেছো বাঘ মাছও খায়।

সুন্দরবনের বাউলী সরদার বাঘ সাম্বন্ধে অনেক কথা বলছিলেন। বই-কেতাব পড়া বিদ্যে তার নয় — হাতে নাতে জানা। বাউলী সরদার বনমালী সামন্ত বলেন, গরুর গাড়িতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছে গাড়োয়ান, বাঘ গাছের ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে তাকে তুলে নিয়ে পালালো, গরুও টের পেল না।... নৌকায় রাতকালে সবাই ঘুমোচ্ছে, বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে কাঠুরে মহাজন, তার একটু চোখ বুজেছে তো একজন মানুষ নেই! বাঘ জঙ্গল থেকে নেমে নাক জাগিয়ে সাঁতরে আসে নদীতে — দূর থেকে ডুব দিয়ে এসে উঠে নৌকার বাড় ধরে ঝুলতে থাকে। যখন ধরে, মানুষের গলাতেই ধরে, যাতে সে টুঁ শব্দটিও করতে না পারে। মানুষকে নিয়ে একডুবে সে বন্দুকের গুলির পাল্লা পার হয়ে গিয়ে ভেসে ওঠে। — একবার জ্যোছনারাতে হঠাৎ পথের ওপরে দেখলাম বিরাট একটা গাই গরু পড়ে আছে। আমরা জিপে আসছিলাম। শব্দ শুনে বাঘ গরুটা ছেড়ে কাছেই কোথাও ওৎ পেতেছে। গাড়ি থামিয়ে রাখলাম পিছু হটে গিয়ে গরুর ওপর লাইটটা জ্বেলে রাখলাম। দেখলাম বাঘটা একটা সামনের পা বাড়াল, তারপর দ্বিতীয়টা, লাঠির মতো সরল হয়ে মাটিতে শুলো। তারপর চকিতে এক ঝটকায় অতবড় গরুটার লাশ যে কেমন করে তুলে নিয়ে সামনের জঙ্গলটার মধ্যে গিয়ে সেঁদিয়ে গেল ভাবাই যায় না।... বাঘ ভীষণ বুদ্ধিমান। উত্তরে হাওয়া বইলে সে জলপানরত চকিত দৃষ্টি হরিণকে ধরার সময় কখনো উত্তর দিকে থাকবে না, গায়ের গন্ধ গোপন করার জন্য দক্ষিণ দিকের ঝোপে ঠিক বিড়ালের ইঁদুর ধরার

মতো খুব সন্তর্পণে ওৎ পাতবে। তারপর সুযোগ বুঝে শিকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। হরিণ বোবা চোখ মেলে থাকবে। রব ফুটবে না তার কিন্তু শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করবে। বাঘের পেট ফেড়ে ফেলবে ব্লেডের মত ধারালো পেছনের পায়ের ক্ষুর মেরে। তাই বাঘও সতর্ক।

তবে কট্‌রা হরিণ ওয়াক্ ওয়াক্ করে ডাকে। মানুষের মাথার উপর দিয়ে লাফ দিয়ে পালায়। এই হরিণ কামড়ায়ও।

বাঘ ভীষণ অহংকারী। সে জানে আমি জঙ্গলের রাজা। মানুষ বন্দুক উঁচোলেও সে তাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিক্রমে গাল মেলে তার ভয়ঙ্কর দাঁত দেখায়। আর গুলি খেয়ে মরে।

বাঘ শিকারের ওপরে ঝাঁপ দেবার আগে ওৎ পেতে বসবেই — আগে গুড়গুড় করে কাছে আসবে, যাতে এক লাফে শিকার ধরতে পারে তেমন ব্যবধানে বসবে — আর মাটিতে লেজের বাড়ি মারবে একবার, দুবার, ঠিক তিনবারের মাথায়। আমরা তখন বাবলার খেঁটে মেরে বাঘের মুখের 'চাবালি' (চোয়াল) ভেঙে দেবার জন্য তৈরি থাকি।

বাঘ সবচেয়ে মানুষের মাংস ভালবাসে। মানুষকে দেখলে আর উপায় নেই। তবে দলছুট একা হলে।

বাঘকে জঙ্গলে মুক্ত অবস্থায় মানুষ দেখলে অনেকেই বুদ্ধি বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় গাছ থেকে ভ্রম হয়ে পড়ে যায়। বাঘ যখন মানুষকে ছেঁড়ে তখন সে দেখতে পেলেও চেঁচাতে পারে না, ভয়ে সে এত নার্ভাস হয়ে যায়।

পুরুষ বাঘ তার বাচ্চা খায়। এ কথাটা ঠিক নয়, মায়ের কাছেই বেশি থাকে, পুরুষ বাঘ শিকারে যায়, তাকে বাচ্চার সঙ্গে দেখা যায় না বলেই লোকে তার নামে বাচ্চা খাওয়ার গল্প বানিয়েছে।

বাঘ খুব রমণ-সংযমী। ক্ষমতা রাখার জন্য প্রকৃতি থেকে এ গুণটা সে পেয়েছে। বারো বছর ছাড়া তার বাচ্চা হয়। বাঘ বাচ্চা খেলে তার বংশ ধ্বংস হয়ে যেত। হুলো বেড়াল বাচ্চা মেরে দেয় তবে তার নিজের ঔরসজাত বাচ্চা নাও হতে পারে।

বাউলী বনমালী সামন্ত বলেন, সুন্দরবনের বাঘ খুব হিংস্র ভয়ঙ্কর বলে প্রবাদ আছে, কিন্তু আমি বলি তার চাইতে বেশি ভয়ঙ্কর আর হিংসুটে মানুষ — কেননা সে তাকে মেরে চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে কয়েক হাজার টাকায় বিক্রি করবে সেই ধান্ধা।'...

গত ৫০ বছরের সমীক্ষায় মাত্র ৪০,০০০ বাঘের সংখ্যা ভয়ানকভাবে কমতে থাকে — তাই আইন করে বাঘ মারা বন্ধ আছে। সরকার সুন্দরবনে ব্যাঘ্র প্রকল্পও করেছে। বাঘ বা বাঘের বাচ্চা ধরে চিড়িয়াখানার জন্য গোপনে বিদেশে পাঠানোও হয়ে থাকে।

ত্রিশূলধারী আদি পুরুষ দেবাদিদেব মহাদেব সাপকে গলার মালা আর বাঘের ছালকে পরণের বস্ত্র বানিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়িয়ে প্রমাণ করেছেন তিনিই প্রথম গণ নেতা এবং সাপ আর বাঘের চাইতে বুদ্ধি বলে মানুষ অনেক বড় — বড়র ধর্ম সবাইকে পালন করা — নিধন করা নয়।

হে দেবাদিদেব মহাদেব, আপনার মতো প্রকৃতিজয়ী মানুষ আর ক'জন আছে?

নলেন গুড়ের গন্ধে মাতাল শীতের হাওয়া

কার্তিক মাসের হিম পড়লেই কামারশালায় ধানকাটা কাস্তে কাটানোর ভিড় লাগে আর তারই মধ্যে গাছ-কাটারি 'পাজানো'র জন্যে আসে 'সিউলিরা'। খেজুর গাছ মুড়ো দেবে। শানে টানা গাছ-কাটারি নিয়ে 'বেলেন'-বালিতে ঘষে ঘষে এমন ধার তুলতে হবে যেন পায়ের চামড়ার ওপরে টানলে ব্লেডের মতো ফড়ফড় করে লোম কেটে আসে।

ঠিক এই সময়ে কুমোড়পাড়ায় রসের ভাঁড় ছোট ডাব্‌রি-কলসী গড়ারও ধূম পড়ে যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চাষীরা নিজেদের আগান-বাগান জল-জাঙ্গালের ভেড়িতে দেড়শো দুশ' খেজুর গাছ থাকলে সারা শীতকালটা সিউলি রাখে। সিউলি এসে বাগানের কোথাও টোঙ বাঁধে।

কম টাকা রোজে বাঁধা কাজ।

কর্তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে করে কুমোড়পাড়া থেকে ভাঁড় কিনে আনে। সেইসঙ্গে আনে গুড় জ্বাল দেবার বড় বড় দু-তিন খানা 'খুলি'।

বাগানে টোঙের কাছে 'বানশাল' বানায়। একটা গড় খুলে উঁচু বড় চুল্লী করে। মোটা ফাঁপা কঞ্চি কেটে 'নলী' বানায়।

সিউলির হাতের পায়ের জিরেন নেই। শুকনো কাঁটা পাতার বোঝাগুলো মাথায় করে বয়ে বয়ে এনে বানের কাছে টাল দিতে হয়। জ্বালানী হবে।

গাছ শুকোলে এবার 'পাটি-চাঁছ' দেবার পালা। হ্যাঁচ্ হ্যাঁচ্ করে চাঁদিতে বসানো গাছ-কাটারি টানে গোষ্ঠ মোড়ল। সেঁটে কাপড় পরে তার ওপরে গামছা কষা। পেছনে বাঁধা তালপাতার 'খুঙি'। তার ভেতরে অস্তর-পাতি। নিচেয় থাকে বেলেন-বাড়ি। একটা গাছ কাটার পরই বালি দিয়ে সেই বেলেন ধার দেবে। চাষীর ছেলেমেয়েরা আসে 'চাঁপালি' খাবার জন্যে।

পাটি চাঁছের গাছে রস গড়ালে দু-পাশে ঘাট কেটে মা-কালীর জিভ বার করার মতো নিচের মাঝখানে ঠকাঠক শব্দে বকের ঠোঁটের মতো সরু নলীর অংশটা পুঁতে দিতে হয়। কপালে যেমন দানা দানা স্বচ্ছ ঘামের ফোঁটা জমে উঠে গড়িয়ে আসে রসও তেমনি গড়ায়। যদি মিনিটে দু-বার ফোঁটা কেটে নলীর মুখ থেকে রস টপে পড়ে তবে সিউলি ভাঁড় বেঁধে দেবে 'ঠিক' পাতার সঙ্গে কানাচিতে। পেছনের 'ঝাটিপাতা'

টেনে এনে তার মুখ চিরে দু-ভাগ করে ভাঁড়ের গলায় টান থাকার জন্যে সেঁটে বেঁধে দেবে। যে গাছে রস হবে সিউলির তা জানা থাকে। তাই আঁক্ড়ায় করে ভাঁড় তুলে নিয়ে যায়। কোমরের কাছির ফাঁস খুলে নেবে আসে। নলী পোঁতার দিনেই যে সব গাছে রস নামবে এমন কথা নয়।

এরপর চাঁদি শুকোলে পয়লা 'জিরেন কাট' শুরু হবে। একদিন হয়তো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা গাছ কাটা হল। গাছেব গোড়ায় সেদিন বাঁকে করে ভাঁড় দিয়ে আসবে সিউলির পেলোমি করা বয়টি। সকাল আটটা-নটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত বুড়ো গেঁড়া গুটকে, চেহারার গুঁফো গোষ্ঠ মোড়ল (বাগ্দি) গাছ কেটে দিতো আমার মামাদের। আমরা তার ভাঁড় বইতুম। খুব 'ঝুঝ্কো' বেলায় জাড়ে কোঁ কোঁ করতে রসের ভাঁড় খুলতে যেতে হত। কুমীরের গায়ের মতো খোপড়া খোপড়া গাছের কোয়ে শিশিরে-ভেজা পায়ের তলায় লাগত। গোষ্ঠ বুড়োর পোড়া বাঁশের মতো কড়া কড়া পায়ে নাকি আদৌ লাগত না। যে গাছে বেশি রস হয়ে ভাঁড় বোঝাই হবার পর 'গাছ বয়ে যেত' — হড়কানো হয়ে গেলে ওঠা দায়। হড়কে পড়লেই ঠ্যাং-ঠোক্না ভাঙ্গবে। হাড় পাকা গোষ্ঠ এসব গাছের রস নামাত। পরে বড় ডাবরি বাঁধত যাতে বেশি রস হয়ে উপচে না যায়।

সব গাছের ভাঁড় খোলা হলে রস ঢেলে ডাব্রি বোঝাই করে নিয়ে বাঁকে করে বয়ে আনতে হয় বানশালে। তখন জাড় কেটে যেত। বুড়ি গাছের লালচে মিষ্টি রস খাবার জন্য গোষ্ঠ রেখে দিত। পয়লা কাট বা জিরেন কাটের রস দারুণ সুস্বাদ। বড়লোকের বাড়ির মেয়ে ফর্সা গোরো গোরো চেহারার মামিরা রস খাবার জন্যে ঘটি পাঠাত। আমরা রস খেতাম সন্ধ্যাবেলা। কারণ ভাম বা উদ্বিড়াল বাদুড় রাতের বেলা ভাঁড়ের ভেতর মুখ গলিয়ে রস খেয়ে যেতে পারে। নিচু ছোট মতো অথবা হেলা গাছ হলে শিয়াল, খ্যাঁক শিয়ালও উঠে রস খেতে পারে। চুরি করে রস পেলে সিউলি টের পাবে। ভাঁড়ের মুখে দাগ থাকবে রস ঢালার। তাছাড়া টিক-পাতার বা ঝাঁটিপাতার গেরো তার মতো নয়। একটু দূরের মাঠে প্রায়ই রস চুরি গেলে কর্তার নির্দেশে ভাঁড়ে গেঁও গাছের আঠা দেওয়া হয়। যে মানুষ খাবে তার মৃত্যু অনিবার্য। নাড়ী পচে পচে বেরুবে। আর ধুতরো বীজ দিলে সেইরস যদি উদরে যায় তবে নটরাজের মতো নৃত্য করতে হবে।

খেজুর পাতার গোড়ায় যে 'চেঁচ্লি' থাকে তাতে দুটো কঞ্চি গলিয়ে ছাঁকুনি বানাতে হয়। বানে পর পর তিনটে খুলি বসিয়ে কোলের ফাঁক-ফোঁকরগুলিতে মাটি লেপন দিয়ে নিয়ে ছাঁকুনি পেতে রস ঢেলে দেয় সিউলি। তারপর বান জ্বেলে দেয়।

হু হু করে যেন রাবণের চিতা জ্বলতে থাকে। রস সাদা ফেণা তুলে তুলে পাক

খেয়ে খেয়ে উথলাতে থাকে। লালচে 'তাতারসি' হলে একথালা মুড়ি এনে আমরা পেট ভরে সিউলির সঙ্গে খেতাম।

ঠেলা বাড়ি দিয়ে কাঁটা পালা ঠেলে বানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে চড় চড় পড় পড় শব্দ করে কাঠ পোড়ে আগুন গাঁ গাঁ আওয়াজ করে। রস উথলে পড়বে দেখলে খেজুরের ঝাঁটিপাতা দিয়ে চাপতে হয়। গোষ্ঠ মোড়ল লাফালাফি করে । হাও, বাবা, হাও! 'উড়খি' মালায় করে প্রথম খুলির রস দ্বিতীয় খুলিতে চালান করে । প্রথম খুলির তাতারস লালচে হলে যখন 'সরষে ফুট' ধরবে তখন আবার দ্বিতীয় খুলির রস আনবে প্রথমটাতে। তৃতীয়টার সাদাটে রস আনবে দ্বিতীয়টায়।

পরে যখন 'চাল্‌তা ফুট ' ধরবে তৃতীয় খুলিটার গুড় দ্বিতীয়তে দিয়ে তুলে দিতে হবে শূণ্য খুলিটা। জ্বাল জ্বলবে মাঝারি তেজে। আর আধঘন্টা পরে দ্বিতীয় খুলির মাল প্রথমটাতে এসে শূণ্য হলে সেটাও উঠে যাবে।

এই প্রথম নলেনগুড়ের সুগন্ধে বাতাস ম-ম করবে। পাঁচশো গজ দুরের লোকরাও ঘ্রাণ পেয়ে জানবে নলেন গুড় ফুটছে।

চালতা ফুট ধরার সময় ভাঁড়গুলোকে জল দিয়ে ধুয়ে 'কানাচি'- দড়ি খুলে ফেলে উপুড় করে রাখতে হয়। গুড় নামলে জ্বালা বন্ধ হবে। তখন ভাঁড় কলসি সাজিয়ে পোড়াতে দিতে হবে বানের ওপরে।

নলেনগুড় সাধারণতঃ সরষে ফুটের শেষে চাল্‌তা ফুট দেখা দিলেই নামিয়ে রাখা হয়। এটা পাতলা গুড়। সরু চাক্‌লি, রুটি, পিঠে, পায়েস ইত্যাদিতে খাওয়া হয়। নলেন গুড়ের সন্দেশ তৈরি হয় মিষ্টির দোকানে। যদি বালি-গুড় বানাতে হয় তবে চাল্‌তা ফুটের পর নামিয়ে নিয়ে ভেনবাড়ি দিয়ে উল্টে পাল্টে রেখে ঠান্ডা হলে কলসীতে ঢেলে খুরি বসিয়ে মুখ এঁটে দিতে হয়। যদি পাটালি বানাতে হয় তবে সিউলিকে অনেকক্ষণ ধরে খুলির গায়ে গুড় ঘষে ঘষে সাদা করতে হবে। এই গুড় ক্রমে ক্রমে ঘন হয়ে আসবে। থালা, বাটি বা যে কোন পাত্রের ওপর পাতলা পুরোনো ধোয়া ধুতি কাপড় পেতে তার ওপরে গুড় ঢেলে দিলে জমে গিয়ে পরে পাটালি তৈরি হয়ে যাবে।

জয়নগরের মোয়া তৈরি হয় নলেন গুড় থেকে। পালাক্রমে কাটা হয় খেজুরগাছ। পয়লা দিনের রস থেকে হয় নলেন গুড়। জিরেন কাটের প্রথমদিনের রসও নলেন গুড় কিন্তু দ্বিতীয়দিনের রসে গাদ থাকে বলে তার গুড় তেমন সুগন্ধযুক্ত হয় না। একটু টকসা লাগে। যত শীত পড়বে তত ভাল রস হবে। মেঘলা হয়ে মাঘ মাসের শেষ দিকে একটু গরম পড়লেই রস ভেঙে যাবে। রেখে দিলেই তাড়ি। তাড়ি খেতে খুব চনচনে আর পচা দুর্গন্ধ। খেলে মাথা ঘুরবে। এরই নাম নেশা। পরপর দুদিন এক গাছ কাটা হয়। তারপর আবার অন্য গাছে জিরেন বা দোকাট। পালাক্রমে চলে গাছ

কাটা। শেষ পালার গাছ কাটা হলে আবার প্রথম পালা। তখন গাছ শুকিয়ে জিরেন কাটের জন্য তৈরি।

মামার বাড়ি বনেদি চাষী সংসারে মানুষ হয়েছি, কাজেই চাষের সবরকম কাজ জানি। আজও হাতে নাতে সব করতে হয়। আমরা ছেলেবেলায় কেবল দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে গোটা একটা 'সামসোড়া' আখ খেয়ে দাঁতের মাড়ি ছড়ে গিয়ে দু-তিন দিন তরকারি না খেতে পাওয়ার স্মৃতি আছে যেমন তেমনি গোটা একটা নারকেল ভেঙে বান-জ্বাল দেওয়া খুলিতে জমে থাকা অবশিষ্ট বালি গুড় কলাপাতায় খাওয়ার মতোই আরো একটা স্মৃতির কথায় মন আজো খুব পীড়িত হয়। বয়স তখন চোদ্দ কি পনেরো। খেজুর গাছ কাটা শেখার জন্য নির্জন এক বাগানে গোষ্ঠ মোড়লের টোঙ থেকে গাছ-কাটারি আর কাছিটা নিয়ে চাঁদি ছোট কুড়ি-একুশ ফুট উঁচু খেজুর গাছে উঠে বুড়ি-গাছটাই কাটতে গেলাম। কোমরে কাছি বেঁধে গাছ-কাটারি দিয়ে যেই ঠকঠক করে চাঁছচি শক্ত চাঁদিতে আটকে গিয়ে ছিটকে উঠে বাঁ হাতের তালুর নিচেটার চোক্‌লা উঠে গেল! তবু ছাড়িনি! অন্যদিকে চাঁছতে গিয়ে আর এক চোক্‌লা গেল ঘাটে পড়ে। নলী বেয়ে রস না গড়িয়ে রক্ত গড়াতে লাগল।

বাপ বাপ করে নেমে এলাম। কিন্তু বিকেলে গোষ্ঠ মোড়ল এসে গাছে উঠেই টের পেল। আমাকে খুব বকাবকি করল। বলল, খেজুর গাছ কাটা শিখবে তো বাচ্চা কচি গাছ কাটতে গেলে না কেন? এখন এই গাছ মেলাব কি করে? অল্পদিনে গভীর করে কাটলে যে পোকা ধরবে গাদ ওঠা গাছে — মাথা উল্‌টে মারা যাবে। ক্ষত রক্ত গাছময়! দাঁড়াও তোমার বড় মামাকে বলে দিচ্ছি।'

কিন্তু নানী বুড়িকে লুকিয়ে গুড়ের কলসি ভরা ভাঁড়ার ঘর থেকে আস্ত একটা মাৎ গুড়ের ভাঁড় চুরি করে নিয়ে বাঁশবনের পাশের মোগল আমলের পোড়ো পাকা ভিটে জোলো জঙ্গলের মধ্যে মামাতো ভাই জলিল আর মামাতো বন জোবেদাকে নিয়ে পেট ভরে নলেন গুড়-নারকেল খেতে গিয়ে ভাঁড় খুলে যে মাল পেয়েছিলাম তার কথা ভোলা কঠিন। দেখি, ভাঁড়ে গুড় কই? মুখ উপচে বর্ষাকালে সব বহিষ্কার হয়ে গেছে কিন্তু তলায় জমে আছে কেবল মিছরির কুঁদো।

সেই অঢেল গুড়-পাটালি খাওয়ার একান্নবর্তী সংসার এখনো যে সব চাষীবাড়িতে আছে তারাই প্রকৃত সুখে আছে। কিন্তু সংসার অনবরত ভাঙছে ছোট হচ্ছে। জমি জায়গার বখ্‌রা হয়ে গাছপালাও কমে যাচ্ছে জ্বালানীর অভাবে। খেজুর গাছও করাত কলে চেরাই হতে চলে যাচ্ছে। মজুরি খরচ-খরচা বেশি বলে খেজুরে-গুড়ের দামও চড়ে যাচ্ছে।

তাই এক কেজি জলের মতো তরল পাতলা গুড়ের দাম এখন চার টাকা। মাৎ

গুড় ছ-টাকা। বালিগুড় সাত-টাকা। পাটালি আট-টাকা। জয়নগরের মোয়া দশ-বারো আর নলেন গুড় সন্দেশ কুড়ি-বাইশ টাকা।

ভাঁড়ার ভরা গুড়ের স্বপ্ন এখন কেবল স্বর্গরাজ্যের রাজা ইন্দ্রের পক্ষেই ভাবা সম্ভব।

গুড় বান থেকে নামারই যা অপেক্ষা — পাইকের এসে বাজরাভরা পাটালি নিয়ে শহরের উপায়দার মানুষদের সন্ধানে চলে যায়।

মর্ত্যে এখন অমৃতের কাড়াকাড়ি।

সবুজ বিপ্লব আরও সাহায্য পেলে হুগলীর মানুষের দুঃখ কষ্ট ঘুচে যাবে

বাস করতে হয় তো হুগলীতে। বালি মাটির দেশ। এই বৃষ্টি হয়ে গেল, জুতো পায়ে দিয়ে চলে যাও, কাদা লাগবে না। ধান ওঠা মাঠের ওপর দিয়ে চলেছি কিন্তু কোথাও পায়ের 'খোজাড়ি' বা গর্ত নেই — যেটা চব্বিশ পরগণার কাদা মাটিতে হয়ে থাকে খেসারি কলাই বোনার সময়। পরে খালি পায়ে হাঁটা দায় হয়।

হুগলীর বালিমাটিতে সব রকমের চাষ হয়। বিশেষ করে আলু পিঁয়াজ। আমন ধান উঠে গেলে জমি চষে সেই ধানের জমিতেই চাষীরা পিঁয়াজ লাগিয়ে দেয়। পটলের ভাঁটির মতো চওড়া ভাঁটি করে তাতে চাষ করা হয় উচ্ছে আর লাউ। বোতলের ধরণের লাউ মাঠের মাটিতেই গড়াগড়ি যায়। লাল কাটোয়া নটের জঙ্গল দেখা যায় — যে নটে গাছ মোটা হয় বাঁশের খুঁটির মতন, মিষ্টি শাঁসে ভরা, মানুষ সমান গাছ। মাটিতেও বীট, গাজর, পালং, চিচিঙ্গে, কুমড়ো, লঙ্কা, পাট, বোরোধান, কপি, টমাটো, ঝিঙে, পটল, বরবটি, ট্যাড়স, সীম, সোয়াবীন, গম সব কিছুই ভাল ফলে। ফলের মধ্যে কলা, আম, নারকেলই প্রধান।

হুগলী জেলার ঘরে ঘরে পাকা চৌবাচ্চার মধ্যে আবর্জনা ফেলে সার তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে। নলকূপ, গভীর নলকূপ হয়েছে অনেক। চোত বোশেখ মাসে শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর, হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর ব্যান্ডেল অথবা শিয়াখালা, চাঁপাডাঙা, আরামবাগ, খানাকূল — যেখানেই যাও — সবুজ ধানের মাঠভরা দৃশ্য আপনার হতাশা হৃদয়ে সান্ত্বনা আসবে। বোধ হয় একেই বলে সবুজ বিপ্লব। শ্রীমতী গান্ধী যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন আমেরিকার কাছ থেকে পি এল ৪৮০ চুক্তিতে গম আনতে মাইলো এনেছিলেন, তাঁর নামে ছড়া বানানো হয়েছিল কিন্তু কয়েক বছর পরে যখন তিনি খাদ্যে দেশকে স্বয়ম্ভর করে তুললেন তখন?

শুধু কৃষিতে নয় হুগলী জেলার ব্যান্ডেলে বসেছে কোক ওভেন — তাপ বিদুৎচুল্লি। শ্রীরামপুরে চটকল, শেওড়াফুলি নানান কলকারখানা। চাপাডাঙ্গার পোনার বীজ, আলু বিখ্যাত। নানান শহর উপশহরে এখন আলু রাখার কোল্ড স্টোর। চাষীদের আলু নষ্ট হয় না। সারা বছর সারা দেশের বুকে এই আলু ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়ে বড় বা মাঝারি চাষীরা আলু তুলে নেবার পর গরিব মানুষেরা মাটি 'হাঁটকে' যে সব আলু পায় তাতে তাদের সারা বছরের আলুর প্রয়োজন মিটে যায়।

তবু সমস্যা রয়েই গেছে। গরিব লোকেদের সংখ্যা অনেক বেশী। যাদের বাস্তুভিটে

ছাড়া চাষ আবাদ করার জমি জিরেত নেই। যা 'ক' শ্রেণীর মানুষ। তাদের রিক্সা চালাতে হয়. জন খাটতে হয়, মোটঘাট বইতে যেতে হয় স্টেশনে। ব্যান্ডেলের কারখানায় বহিরাগত মানুষদেরই নাকি চাকরি হয়ে গেল বেশী। কালো চামড়ার আদিবাসীরা চাষীবাবুদের ক্ষেতেখামারে জন খাটে, সন্ধেবেলায় তাল বা খেজুরের তাড়ি খেয়ে একটু মউজ মতন নেশা হলে ছাগল বাচ্চা আর ট্রানজিসটার সেটটা বগলে নিয়ে বাবুদের মিটিং শুনতে যায়।

পান্ডুয়া থেকে প্রকৃতির দয়ায় চলেছে অজস্র বালি সারা দেশে লরী বোঝাই হয়ে। জমিতে ধান না হোক, পুকুরে কেটে বালি বেচেও মুনাফা হয়।

হুগলিতে প্রতি বর্গকিলোমিটার লোক বসতির ঘনত্ব ৯১৩ জন। চব্বিশ পরগণায় যেখানে ৬০০ জন — শিল্প রাড়ার ফলে বহিরাগতরা এসে এই সংখ্যাকে প্রায় ১০০০-এ ঠেলে দিয়েছে।

কলকাতার ছোটভাই হাওড়া শহর — হাওড়া জেলাটি আকারে ছোট হলেও শিল্পে ভরা আর তার সঙ্গে হুগলী নদীর দুপারে গড়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল। দুই জেলা একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। বিদ্যুৎ প্রকল্পে, ট্রেনে-বাসে, নদ-নদীতে। হুগলী নদীর উভয় তীরে ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া, কল্যাণী থেকে উলুবেড়িয়া, বাটা, ও বিড়লাপুর পর্যন্ত এক সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। এটি 'হুগলীর শিল্পাঞ্চল' নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে পাটকল, সুতোর কল, কাগজের কল, জুতোর কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, মোটর গাড়ির কারখানা, ছোট স্টীমার নির্মান ও মেরামতের কারখানা গড়ে উঠেছে। প্লাস্টিকের কারখানা, চীনামাটির বাসন তৈরির কারখানাও আছে। পশ্চিমবঙ্গের ১০১ টি চটকলের মধ্যে অধিকাংশ চটকল এই অঞ্চলে অবস্থিত। টিটাগড় ও কাঁকিনাড়ায় কাগজের কল, ত্রিবেণীতে নরম টিস্যু কাগজ, হিন্দমোটরসে মোটর গাড়ি নির্মাণ কারখানা, রিষড়ায় ভারী রাসায়নিক কারখানা গড়ে উঠেছে। কলকাতার দপদপা ছোটভাই বা যমজভাই হাওড়াকে নিয়েই।

বাঁশবেড়িয়ার পেতল-কাঁসার থালা-বাটি বিয়ের সময় ঝাঁকা বোঝাই হয়ে আর শ্বশুরবাড়ি যায় না, টাটারিয়া কাঁসরে ঘন্টা বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি আর থালা বাটি লোটা ঘটি ডাবর পান ডাবর ফেরি করে না — এসেছে স্টেনলেস স্টিলের থালা বাসন। কালের পেতল-কাঁসার থালাবাসন ভীম পাউডার দিয়ে মেজে সোনার মতন পুরনো ঝকঝকে করে এখন আলমারীতে সাজানো থাকে।

চব্বিশ পরগণার ডোঙ্গাড়িয়া গ্রামে কুমোরদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এ্যালুমিনিয়াম বা জার্মান সিলভারের হাঁড়ি পাতিল আমদানির পর আপনাদের জাত-ব্যবসায় হাত পড়েনি তো?

উত্তর পেয়েছিলাম, না। কারণ জাত-ব্যবসা তুলে দিয়ে যে সব অল্প কুমোর আছেন তাঁরা মালের চাহিদা মেটাতে পারছেন না।

তেমনি বাঁশবেড়িয়ার বাসনকোষণ তৈরির কর্মচারীরাও বললেন, 'স্টেনলেশ স্টিলের থালাবাসন আমদানির ফলে যে আমাদের পেতল-কাঁসার জিনিসের মন্দা হাল, তা নয়। গরিব মধ্যবিত্তরা কি উঠে গেছে? কাঁসর ঘন্টা কি লাগবে না? ডাকাতে থালা না হলে পুজোর নৈবিদ্দি সাজাবেন কিসে?

হুগলী জেলার হুগলী নদী, দামোদর নদ, কানা দামোদর, দ্বারকেশ্বর নদী থেকে খাল কেটে জেলায় নানান জায়গায় আরো অনেক সেচব্যবস্থা তৈরি করা যায়। বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে জোরদার করে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প গড়ে তোলা যায়। এই জেলায় ধনিয়াখালি, শ্রীরামপুর ইত্যাদিতে যেসব তাঁতীরা তাঁতশিল্প চালিয়ে কলের সুতোর মিহি কাপড়ের সাথে যুদ্ধ করে টিকে আছেন তাঁদের ভাগ্যে সরকারি অনুদান যা জুটেছে তা সমান্যই — আরো ব্যাপকহারে অনুদান প্রয়োজন। নইলে এই কুটিরশিল্পকে ক্রমে ভারি শিল্প এসে গ্রাস করে ফেলবে। স্বাধীনবৃত্তি হারিয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে অভাবী সংসারের যুবকরা জীবিকার অন্বেষণে শহরে নগরে চলে যাচ্ছে।

আরামবাগ, ব্যান্ডেল, শেওড়াফুলি বা খানাকুল থেকে ট্রেনে চড়ে বহু মানুষ প্রতিদিন হাওড়া আর কলকাতায় চাকরি করতে আসছেন, ব্যবসায়ের মালফাল নিয়ে যাচ্ছেন লরী ভর্তি করে। বাস চলেছে চারদিকের পাকা সড়ক দিয়ে। মানুষজনের পোশাকে আসাকে আধা শহুরে ছাপ থাকলেও চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের মতো অতটা দারিদ্র্য-নিপীড়িত নয়। এইসব অঞ্চলের মুসলমান বাসিন্দারা অনেকটা নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। লেখাপড়ার হারও আশাপ্রদ। চব্বিশ পরগণার মতো হাতাশাব্যঞ্জক নয়।

নদীয়া জেলার বিধানচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃষি সমীক্ষায় যোগ দিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম একজন পশু বিশেষজ্ঞকে। তিনি বলেছিলেন, 'গ্রামের গরুগুলো লম্বা দড়ি দিয়ে নাবাল বা নিচু জমিতে বাঁধা থাকে, শামুকের কৃমি যায় তাদের পেটের মধ্যে ঘাসের সঙ্গে। আর অপর্যাপ্ত খায়, কখনো বা নিয়মিত খাবার পায় না। কৃমিতেই গরুর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।'

ব্যাপারটা যে সত্য, যাঁরা খাটো আড়াই হাত দড়িতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জার্সি বা হরিয়ানা গাই পালছেন তাঁরা বুঝবেন। আর এটাও লক্ষণীয় যে কলকাতার ছাড়া গরুগুলোর স্বাস্থ্য এমন চমৎকার কেন? কোথায় সেখানে শামুকের কৃমি? আমরা দেখেছি গ্রামের গরুগুলোর পেটে ঝোড়াখানেক করে লাল লাল ছোট ছোট অজস্র কৃমি থাকে।

আর মানুষদের?

ঐ একই ব্যাপার। রিং ওয়ার্ম ছড়িয়ে পড়েছে এপিডেমিকভাবে গ্রামকে গ্রাম। বিশেষ করে নাবাল ভিজে জায়গা দক্ষিণ বাংলায়। যেখানে সাপের আমদানিও খুব।

হুগলী কৃষিপ্রধান এলাকা হলেও শিল্পের উন্নতি ঘটানোর অব্যাহত চেষ্টা চলেছে সেখানে। পঞ্চায়েত অফিস বা ব্যাঙ্ক থেকে নানা রকম ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে এসব রাজনীতি পক্ষদুষ্ট বলে গণতান্ত্রিক প্রগতিও তেমন সম্ভব হচ্ছে না।

বিদ্যুৎ আর গভীর নলকূপের চাহিদা অনেক। হাসপাতালের সংখ্যা অনেক কম। আরো স্কুল কলেজ বাড়ানো দরকার। দরকার আরো অনেক রাস্তাঘাট, টিউবওয়েল। পাকা বাড়ির সংখ্যা বাড়ছে বটে তবে কাঁচাবাড়িই ছত্রিশ বছরের স্বাধীনতার পর এখনো পঁচাত্তর ভাগ। চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী এবং নদীয়ার কথ্যভাষা মূলত একইরকম।

হাওড়া ও হুগলী মাটির বাড়ির শ্রী কিন্তু কম নয়। দামোদর নদের বন্যায় বাড়িঘর ভেসে যায় বলে এই অঞ্চলের বাড়িগুলোর বনেদ উঁচু হয় প্রায় এক মানুষেরও ওপরে। আর বেশির ভাগই দোতলা মেটেবাড়ি। তুষ, পাটের কুঁচো, দিয়ে সুন্দর উলুটি করা। বড়লোকের বাড়ি বা দলিজ ডিমের লালা দিয়ে ঘষে মেজে মসৃণ করা। বাংলো বাড়ির মতন। এই উলুটির মধ্যে এখন আবার হাল্কা বালি ও সিমেন্ট মেশানো হচ্ছে। ছবিতে দুদিকের কোন নিচু গোলাকার ছাউনির সুদৃশ্য যেসব বাড়ি দেখা যায় তা হাওড়া ও হুগলী জেলার। জ্বালানী কাঠের জ্বালা থাকলেও বড বড় গাছ — তেতুঁল, দেবদারু, আম, কাঁঠাল, বকুল, বেল, পাকুড়, নিম, অশথ, বট আদৌ কাটা হয় না। মহীরুহ নাকি কাটতে নেই। তার মানে বন্যার সময় ঐসব গাছপালায় উঠে প্রাণ বাঁচানো যাবে। থ্রি-পিস কাঠের জন্য চব্বিশ পরগণা জেলাতে আর পুরনো গাছ প্রায় থাকছেই না।

বাটার হাইহিল জুতোর, চামড়া কাটার, কসাইদের মাংস কাটার জন্য চকোর- বার-হওয়া মোটা তেঁতুল গাছের দাম এখন অনেক। তাই চব্বিশ পরগণার লোক হাওড়া-হুগলী এসে সাবেকি মহীরুহ দেখে একটু অবাক হয় বৈকি। ভাবে কি বৈভব তারা হারিয়ে ফেলেছে। কয়লা পোড়াবে গাছ কাটবে না এটা একটা অর্থনৈতিক সংকটও। কিন্তু তা হোক, বৃক্ষ যে দেবতা!

সবার উপরে এখন উল্লেখ্য হুগলীর বোরো ধানের দিগন্তবিসারী সবুজ বিপ্লব। আর মাঠকে মাঠ আলুর চাষ। আরো নিবিড় চাষ আর কুটির শিল্প বাড়লে হুগলীর মানুষদের দুঃখকষ্ট ঘুচে যাবে।

টোকা-পুতুল-একক্কা শাড়ি

তালপাতার টোকা মাথায় বকের সারির মতন একদল নারী-পুরুষ ক্ষেতে পাট নিড়োতে নিড়োতে কীর্তনের সুর তুলত - আহারে নিমাই তুমি ছেড়ে গেলে নদীয়া — গত মরশুমে সে সুর থেমে গেছে — প্রচন্ড খরায় নদীয়ার মাটি ফেটে চৌচির হবার পর অশ্রান্ত বর্ষায় পাট লোপাট হয়ে গেছে। ধান ভাল হলেও সব জায়গা রোয়া সম্ভব হয়নি। বারবার রুইতে গিয়ে বউয়ের গয়না বন্ধক দিতে হয়েছে। চাষীদের এখন বুক সমান ভাবনা, মাথা সমান দেনা।

অবশ্য গাছের ডগা থেকে শিকড়ের কোল পর্যন্ত কাঁঠাল ফলেছে নদীয়া জেলার বাগানে বাগানে — মানুষের গাছে গাছে। মনে পড়ে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট হওয়া নদীয়ার ছেলে সুলতান আলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমাদের কি আছে?' সে বলেছিল, 'কুড়িটা কাঁঠাল গাছ আছে।'

আমি তো অবাক। 'কুড়িটা কাঁঠাল গাছে সংসার চলে?' উত্তর ঃ হ্যাঁ চলে, সেসব গাছে যে কত কাঁঠাল হয় তা তো চোখে দেখেননি। ছোট গেলাসের মতন কোয়া হয়, খাজা কাঁঠাল, লেপা কাঁটা আর ইয়া বড় — এক একটা পনেরো কিলো কুড়ি কিলো ওজন।....... সুলতান আলিকে বঙ্গেশ্বর অতুল্য ঘোষ সোনার কলম দিয়েছিলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন জনৈক মুসলিম মন্ত্রীর নিবাসে রেখে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনোর ব্যবস্থা করেছিলেন, নদীয়ার সেই ছেলে দর্শনে ডিগ্রি নিল, হেগেল-কান্ট পড়াত রবীন্দ্র ভারতীতে, 'শঙ্খচিল' নামে লেখেও সে — তার জেলা নদীয়ায় যখন গেলাম, কৃষ্ণনগরের পান্থনিবাসে শত শত রকমের কি সুন্দর মাটির পুতুল দেখলাম, দেখলাম ন্যাড়া আমগাছ আর মাঠ পড়ে থাকা পলাশীর পথে পথে কাঁঠালের গাড়ি চলছে হাটে-গঞ্জে। গাড়িটার বৈশিষ্ট্য দুটো চাকাওলা ছোট গরুর গাড়ির মতো — সামনে দুই ডান্ডার মধ্যে একটি দেশি ঘোড়া। গাড়ি ঘেরা আছে গোলাকার চোঙ করে। তালপাতা ফুল বাঁখারী দিয়ে বোনা। তার মধ্যে গুনগুন করে কান্নারত নতুন বউ চলেছে নক্‌শী কাঁথা বিছিয়ে বসে হট্‌রা রাস্তায় হেলতে দুলতে — বৃষ্টি এলে গামছা মাথায় সহিস আর রোগা ঘোড়া ভিজবে কিন্তু মানুষের আদরের বউ ভিজবে না।.... কলকাতার চারপাশে যেমন রিক্‌শা চলে তেমনটা নেই, নদীয়া, মালদহ, পশ্চিমদিনাজপুরের গাঁয়ের পথে পথে এমনি ঘোড়ায় টানা গাড়ি --- হাটে-বাজারে বয়ে নিয়ে চলে আম, কাঁঠাল, ধানচাল — মোষের গাড়ি বয় খড় বাঁশ-ইঁট-কাঠ —

রায়গঞ্জ থেকে বালুরঘাট চলে সরকারি বাস। ট্রেন ছাড়া নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট জনসংযোগ মূল ব্যবস্থা মধ্য বাংলা, উত্তর বাংলায়।

শাড়ির নক্‌শাপাড় বুনতে বুনতে শান্তিপুরের তাঁতিরা এককালে গলায় লহরা তুলে চৈতন্য চরিতামৃতের কাহিনী গেয়ে যেত পালাকীর্তনে, তাঁতিদের সহকারীরা তার ধুয়ো ধরত, আজ বড় মন কষাকষি, মালিক নরহরি বাবাজী হাতের দলে তো শ্রমিক তাঁতিরা কাস্তের দলে। গান থেমে গেছে। গোপাভর চৈতন-রাখা তিলক-ফোঁটাকাটা নরহরি বাবাজী 'সিলিকে'র জামা ধুতি পরে নটবর বেশে কলকাতার নামীদামী দোকানে, মাড়োয়ারী আড়তে শান্তিপুরী শাড়ি-ধুতি চাদর দিয়ে এসে ঢেউ তোলেন, রাজীব গান্ধী নেহেরুজীর চাইতেও ভাল হবে, তোমরা দেখে নিও— শুধু যদি ইতরজনের হাতে মা-জননীর মতো প্রাণ না খোয়ায়'। তারপরেই সুর করে গেয়ে ওঠেন, 'ওরে নিমাই, আমার প্রাণের ধন, বিদ্যার বিভূতি, তুই কেন গেলি নীলাচলে।...'হায়রে অবোধ শিশু, চৈতন্য-মহম্মদ-যীশু, সংসার ভরা আছে খলে' চোখের জল মোছা হলে তাঁতিদের প্রতিভূ বলে ওঠে 'আমাদের মজুরিটা আজ না দিলে ভাত হবে না গোঁসাই — দশটা মুদিখানায় দেনা— এক কেজি চাল দেয় না ধারে।'

অমনি শোনা যায়, 'তোমরা রোজের দাম চড়াও, চালের দাম, কাপড়ের দামও বাড়ুক। বাজার ছুটেছে পাগলা ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতন — আমরা তার ল্যাজ ধরে ছ্যারানো গোবর মেখে একেক্কার! হরি বোল হরি! আগে চাষে জন খাটলে আড়াই সের চালের দাম দেওয়া হত, এখনো তাই নেওয়া উচিত — আট টাকা পঁচাত্তর পয়সা' কিন্তু তোমরা যেহেতু সৌখিন কারিগর, কারো কারো রোজ কুড়ি টাকা, পঁচিশ টাকা— তবু তো দুঃখ ঘোচে না রে ভাই! সন্তানাদি কমাও, ভগবানের দান বলে রোজ হাতুরি ঘোরালে ওগুলোকে খেতে দেবো কি আমরা?'... শান্তিপুরে সরকারি সেগুনবন তৈরি হয়েছে। যাদের বাড়িতে মাছ ভাতের জোগাড় আছে তাদের বাড়ির হিন্দি সিনেমা-দেখা- প্রেমপাগল — ছেলেমেয়েরা ঐ শান্তিবনে একদিন হয়ত নব নবদ্বীপধাম গড়ে তুলবে!

নদীয়ার পটলের কথা মনে পড়ে? ঢোড়া ঢোড়া মোটা পটল। ভাজা, মাংসের পুর দিয়ে দোরমা অথবা ভাতে খেতে কার না ভাল লাগে? বস্তার দু'মাথা ফাঁক করে পিছন হেঁটে হেঁটে চোর যদি ভাঁটির ওপর দিয়ে ছুটে যায় রাত্রে, তো বস্তাভরা পটল উঠে আসে।

- বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাদা চেহারা নিয়ে বাগান শোভা করে দাঁড়িয়ে আছে মোহনপুরে, সামনের পাকা রাস্তায় প্রাইভেট বাস চলেছে, পথের গায়ে কালো সাদা ছাপাঅলা হরিয়ানা গাই কোমলে বাছুরের গা চাঁটছে, পটল নিয়ে বসেছে চাষী ব্যাপারীরা,

পাইকারী দাম এক পাল্লা পাঁচ টাকা -- সেটা কলকাতায় এসে ডবল দামে বিক্রি হয়। এক কৃষি সমাবর্তনে বন্ধুবর পার্থ চ্যাটার্জির ডাকে ওখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এক রাত থেকে মশার কামড়ে দিন দুই বাপের নাম ভুলে গিয়েছিলাম। মশারি নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল কিন্তু তক্তোপোষের চারকোণে যে চারটি স্ট্যান্ড বা লাঠি লাগে তা নিয়ে যাওয়া হয়নি বলে দেখি মশারী গায়ে দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট মশাগুলো লুঙ্গি শাড়ির (মহিলারাও ছিলেন) ভিতরে অত্যন্ত সুকৌশলে প্রবেশ করে চকিতে একপেট রক্ত মোক্ষণ করে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় পাখার হাওয়ায়। আবার নতুন একদল চোঁক করে ছুটে এসে পড়ে বিছানায়।

কেন এত মশা, জীবন অতিষ্ট করে ফেলে— একথা শুধোতে যিনি হেসেছিলেন শুধু তিনি আমাদের সাংবাদিককুলকে ডিলাক্স বাসে চড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ফার্ম দেখাতে। সেখানে ছিল কয়েকশত অথবা হাজার কয়েক হরিয়ানা, জার্সি(কপিলা?) গাই। যাদের মাটা তোলা দুধ বোতলজাত হয়ে কুমারী দুধমা-দের হাত থেকে প্রতিদিন ভোরবেলা পান কলকাতার মানুষরা সেইসব সরকারি গরুর গোবর আর মুত্‌চোনার নর্দমাগুলি দেখলাম লক্ষ কোটি মশার 'নিরাপদ'আস্তানা। ফার্মের চারিদিকে সোনালি গম ক্ষেত, সবজির চাষ। কৃষিবিজ্ঞানীদের নতুন নতুন উদ্ভিদ প্রজন্মের প্রয়াস। মোহনপুরের পথে নদীয়ার শ্রীচৈতন্যের দেশে শুয়োর চরতে দেখে একজন চাষীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ,'এগুলো এলো কোত্থেকে, বিশ্ববিদ্যালয় চাষ করেনি তো?'

উত্তর দিল টাক মাথার বড় কপালে ছিটে ফোঁটা কাটা আদুল গা চাষীটি, 'না বাবু, শুয়োরের 'পলট্রি' আছে উদিকে — একটু বেড়াতে এয়েছেন ওনারা।'

শুয়োরের 'পলট্রি'!

হায় নদীয়া, হায় নৈয়ায়িক রঘুনাথ, তুমি না মিথিলা কাশীর পন্ডিত পক্ষধর মিশ্রের 'পক্ষধর পাতন' করে এসেছিলে, হায় পন্ডিত গদাধর, তোমার শিষ্য ভুল শব্দ লিখলে সেই পুঁথির পাতা কেটে কুকুরের ল্যাজে বেঁধে দিলে তুমি 'দুইই হয়' বলে তর্কে না হারলেও যেখানে টোল নয়, বিশ্ববিদ্যালয় পরীর মতন সাদা পাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই শুনলাম 'পিগ্যারি'-কে 'পলট্রি' বলতে। চাষীদের মধ্যে নয়, কথাটা নাকি সামাজিক ভাবেও চল হয়ে গেছে ওখানে। পন্ডিত গদাধর বা রঘুনাথের টোলে চৈতন্যদেবকে নদীয়ায় পড়ে থেকে যেমন বিদ্যাবুদ্ধিতর্ক শিখতে হয়েছিল আজ আর তেমনটা নেই, কেষ্টনগর থেকে শ্যালদার ট্রেন ধরে অথবা বাসে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালগুলিতে পড়তে আসতে হয়। তাতে অবশ্য কয়েক হাজার ডিগ্রিধারী জন্মেছেন কিন্তু একজনও চৈতন্যদেব জন্মাননি' তিনি না জন্মালে নদীয়া জেলার যে অংশটা 'বাংলা দেশের পেটে চলে গেছে সেটুকুও থাকত কিনা সন্দেহ। মদনপুর, চাকদহ,

রাণাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, জীবননগর, চাপড়া,, দামুরহুদা, পলাশী, করিমগঞ্জ — উত্তরে পদ্মা নদী — তার ওপারে রাজশাহী, পাবনা, পূব পাশে নবদ্বীপের কেটে নেওয়া অংশে কুষ্টিয়া যশোর উত্তর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমে বর্ধমান হুগলী, দক্ষিণে চব্বিশ পরগণার উত্তর মাথা— এসব জায়গায় মনমেজাজ অনেকটা মধ্যবাংলার, অনেকটা শহুরে। কলকাতা থেকে বাস ট্রেনে আসে খবরের কাগজ, যায় পাট-চাল-বেগুন। হাজার হাজার লোক প্রতিদিন যাচ্ছেন চাকরি করতে। ফিরছেন আবার সন্ধ্যায়।........

নদীয়ার মাঠের মাটি অমৃত সমান। দু-ফসলী তিন ফসলী চাষও হচ্ছে। বোরো চাষ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। নারকেল গাছ আছে, অনেকটা চব্বিশ পরগণারই অংশ যেন. তবে এই নারকেল গাছ ক্রমেই পাতলা হয়ে গেছে. মুর্শিদাবাদের দিকে আর নেই।

হিমালয় তৈরি হবার সময় যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, যে পাথর-গলা ঢল নেমেছিল তা বোধহয় পুরুলিয়া, বাকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহেই শেষ হয়ে যায়। শিলিগুড়িতে যে পাহাড়ী ঢল চোখে পড়েছে তা পশ্চিম দিনাজপুরে নেই। আবার মুর্শিদাবাদে বহরমপুর হয়ে ফরাক্কায় যাবার পথে দেখছি আম বাগান, ফালগুনের গত ভোটের সময় বউলের গন্ধে মাত্— রাস্তায় আঁকে-বাঁকে সাঁওতাল বা উপজাতি লোকেদের ঝুব্‌ড়ি, পাতকোয়ার ধারে কলসীর ভিড়, আধমরা মোষ লাঙল টানছে, তিসির ফুল ফুটেছে, আশ্চর্য যখন শীত শেষে চব্বিশ পরগণায় খেসারি কলাই উঠে গেছে তখন মালদহ মুর্শিদাবাদের সবুজ খেসারি ক্ষেতে নীলফুল ফুটতে শুরু করেছে, হোগলা গাছের মতো চ্যাপ্টাপাতা ছোট ছোট তিসি গাছের মাথায় সুন্দর ফুল আর যখন আমের প্রায় আঁটি হয়ে গেছে তখন মুর্শিদাবাদে সবে লতানে শীষ মেলে ধরেছে আমের মুকুল। ফাল্গুনের গরমে রাত আটটায় কলকাতার ঘাম দিচ্ছিল। নৈহাটি পার হবার পর ভাগিরথী ব্রিজের ওপরে ঠান্ডা-কাঁপুনি-ধরা-হাওয়ায় চাদর মুড়ি দিতে হল। জলপাইগুড়িতে তখন বেশ শীত।...

নদীয়ার মাটিতে কাঁঠাল ভাল হলেও কৃষ্ণনগর থেকে আমের সময় কতবার গেছি পলাশীর পথে — আমগাছের বৃহৎ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেসব বড় বড় গাছে দুপাশ থেকে এসে জড়াজড়ি করা ডালপালায় বাউল ধরতে দেখিনি।

চব্বিশ পরগণার পান-চাষীরা তাদের পান বরোজ বাঁচিয়ে রেখেছে নদীয়ার পাটকাঠি বা প্যাকাটি দিয়ে। শত শত লরীভর্তি প্যাকাটি চলে যায় চাষীদের বাড়ি ক্ষেত থেকে দাদন ধরানো মহাজনদের গোলায় — পাট কেনে সরকারি সংস্থা, জুট মিলের দালাল — সেখান থেকে যায় নানান দিকে। বমি, হ্যামাৎ-গোড় আর ম্যাস্তা — এই তিনজাতের পাটই এখানে চাষ হয়। বমি-পাট হল লালটাঙি, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি — যা দশ বারো হাত খাড়াই হয়, পাতা মিষ্টি, ভেজে খাওয়া হয় — সোনার মতো রঙ হয়, এর

প্যাকাটিরও দাম বেশি, পণ হিসাবে তড়পা বাঁধা হয়। বীজ হয় কাঁচা লঙ্কা বা গরান গাছের শুটির মতো। হ্যামাৎ-গোড় হল তিতো পাট, যার পাতাকে নাল্‌তে পাতা বলা হয়। পাট হয় সাদা। দানার শুঁটি হয় গোল। আর ম্যাস্তা পাট হয় ডাঙায়। ম্যাস্তা ফল অম্বল রেঁধেও খাওয়া হয়।

নদীয়ার চাষী মাথায় টোকা পড়ে হাল করে জোড়া বলদের বাইরে, লাঙলের মুটো ধরে। যা ছবিতে আঁকা থাকে। ছোট বেলায় এটা দেখে ভাবতাম শিল্পীর বোধহয় ভুল। তা নয়, নদীয়ায় কেন চব্বিশ পরগণা মসলন্দপুর, চাপড়া, রায়পুরের কাছে ক্ষেতে দেখেছি এই রকম দূর ব্যবধানে লাঙল জোড়া । লাঙলের ফাল মাত্র দু-ইঞ্চি চওড়া। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে চওড়া আঠারো ইঞ্চি !

নদীয়ার সাধারণ মানুষেরা এখনো খুব দরিদ্র — শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। ময়লা সুতোর কাপড় পরণে। মাটির ঘর অনেকের। টালি-উলু খড় ছাওয়া। পাকা বাড়িও বাড়ছে। অনেক উদ্বাস্তু কলোনী হয়েছে। অনেক সাঁওতাল উপজাতীয় লোকেরা আছে। কল্যাণী শহর গড়ে উঠেছে বটে সেখানে বাইরের বাবুরা এসে নাকি ঠাঁই গেড়েছেন। দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এই জেলার বুকে অথচ মাঠ ময়দান পড়ে থাকে জলাভাবে বা সার বিহনে চাষ আবাদ না হয়ে। নিম্ন সমতলভূমি মধ্যে নদীয়া, চব্বিশ পরগণা বা হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর — এসব এলাকায় যদি রকফেলার অথবা জাপানীদের মতো আধুনিক প্রক্রিয়ায় চাষ করা যায় তবে বোধহয় এই সমতলভুমিই গোটা ভারতের লোকের আহার যোগাতে পারে। কোথায় ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, সেচপ্রকল্প, পাকা পথঘাট হাসপাতাল বা শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ?

শ্রী চৈতন্যের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে সত্যবাক্য উচ্চারণ করলে বলতে হয় এদেশে যে ছটা মহাপ্রকল্প উঠেছে তার টাকাগুলো কোথায়? মহাপ্রভু, এটাকি শুধু চোরের দেশ?

হলদিয়ার আলো মেদিনীপুরের অন্ধকারে কতটুকু আলো জোগায় ?

সত্তর তালি মারা আলখাল্লা, নক্‌সী কাঁথার ঝোলা, সিঙ্গাপুরী নারকেলের কালো কুচকুচে খোল, রঙ্গিন কাঁচা বা কড়িকুটোর মালা গলায়, বাঁ হাতের কালো তস্‌বিহ্‌-দানা, হাতে পাকানো লতার লাঠি, পরণে লুঙ্গি, মাথায় টুপি, সঙ্গে দুটো ছেলে। মেদিনীপুরের ফকির দোরগোড়ায় এসে সাপ খেলানো সুরে পুঁথি পড়ার মতো লাচাড়ি গাইত আগে — 'মাগো মোরা পাই বড় ক্লেশ, বন্যায় ভেসে গেল দেশ......' নওল কিশোর-কণ্ঠ ধুয়ো ধরত ঃ মাগো ভেসে গেল দেশ....।'

সেইসব বনেদী ফকিরের দল তো আর আসে না বেশি? তবে কি অনেক জমি আছে বলে চাল-ফাল কেড়ে নেয় ধর্মে ভক্তিহীন ছেলেরা নাকি তিন-চারটে 'ফলন' তুলছে জমিতে? অথবা ডায়মন্ডহারবার থেকে দেখতে পাওয়া পশ্চিমের আকাশ আলো করা হলদি আর হুগলি নদীর অববাহিকায় হলদিয়া ডকে লেগে গেল মালখালাসের কাজে? রূপনারায়ণ, হলদি, কংসাবতী, হুগলি নদীর স্টীমার, নৌকায় কাজ পেয়ে গেছে কি তারা?

মেদিনীপুরের যাট-সত্তর-আশি টাকা দামের সৌখীন রঙিন খেজুরপাতার শীতলপাটি মাদুরী বুনছে? সোলার শিল্প কাজ করছে ? রিক্সা ভ্যান টানছে? কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কেউ কাজ পায়নি? হাওড়া থেকে খড়্গপুর মেদিনীপুর হয়ে যে ইস্টার্ণ রেলপথ চলে গেছে বাঁকুড়া হয়ে ধানবাদের দিকে অথবা যে দক্ষিণ পূর্ব রেলপথ উড়িষ্যা থেকে এসে খড়্গপুর ঝাড়গ্রাম হয়ে চলে গেছে টাটানগরে — তাতেও কি মেদিনীপুরের লোকেরা কাজ পায়নি? পেয়েছে, বিস্তর লোক এখন কাজ করছে।

দীঘা জুনপুটের বালিয়াড়িভূমিতে কাজু বাদাম ফলাচ্ছে বহুলোক। দেবদারু, ঝাউবন তৈরি করে ভূমিক্ষয় রোধ করা হচ্ছে। কেয়া আর হরকচে কাঁটার ঝোপ ছাড়া আর কি গাছ আছে এখানে? তাই কাঁথি এলাকার জেলেরা প্রাণ হাতে করে জীবিকার দায়ে তরমুজ. মূলো, কলাই চাষের ফাঁকে বঙ্গোপসাগরের বোতল সবুজ নোনা জল থেকে মহা চুড়াজাল পেতে শিকার করে আনে হাঙর, পমফ্রেট, ম্যাকারেল, টুনি, শংকর, ইলিশ, খোড়ো, 'ভেক্‌কি', চেলা, চিংড়ি মাছ। হাঙরের তেল তৈরি করে বেচে পেট চালায় কত লোক। চিংড়ি শুকনো করে মুরগির খাবার তৈরি করে। নার্শারীর সার তৈরি করে মাছ শুকনোর গুঁড়ো থেকে।

মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষের ভাষায় উড়িয়া টান আছে। গায়ের রঙ নোনা

হাওয়ায় কালো। তাবলে কিন্তু জিওলজিতে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হওয়া কমলেশ মিত্র — ব্রাহ্মণ সন্তান, সাগর দ্বীপের বামনগাছির ল্যাবরেটারীতে গবেষণারত ঝড়ের ভয়ে ভুঁইকুঁড়ের মধ্যে থাকলেও তিনি কালো নন। নিজে খান এ্যালোপাথিক ট্যাবলেট ক্যাপসুল আর গরিব মানুষদের খেতে বলেন হোমিওপ্যাথিক দাওয়াই।

বড় দারোগা শাহাবুল হোসেনের বেগম জাহানারা যখন পান পাঠালেন আমার জন্যে, তক্তাপোষের মতো চারকোণা করে মোড়া দেখেই বলেছিলাম. 'আপনারা মেদিনীপুরের লোক।' — খড়্গপুর রেলওয়ে ইলেকট্রিক অফিসের রেজিস্টার জনাব খায়রুল বাসার যখন সন্দেশ আনতে বললেন, আনলে একটি সাঁওতাল দুহিতা কাঁচা শালপাতায় করে। মেয়েটি নাকি স্কুল ফাইনাল পাশ করে প্রাদেশিক প্রাক্তন বিদুৎ-মন্ত্রী গণিখান চৌধুরীকে ধরে চাকরি পেয়েছে, কিন্তু পোস্ট তখনো কিছু খালি ছিল না, 'তাই লজ্জার কথা' — তিনি বললেন— 'ওকে দিয়ে ফাইফরমাস খাটাচ্ছি আমরা।'

কাঁচা শালপাতায় খাবার দেওয়া মেদিনীপুরের বৈশিষ্ট্য। কাছেই আছে শালবনী, কিছু দূরে শালতোড়া পাহাড় দেখা যায় পশ্চিমে।

বছর খানেক আগে ডিলাক্স বাসে করে মেদিনীপুরে গিয়েছিলাম আল্‌হাজ আবদুল আজিজ আল-আমানের জ্যেষ্ঠপুত্রের সাদি মোবারকে। গোলাপ পানির ছিটে, খানদানী খানাপিনার আসরে অনেক চেনা লোককে চোখে পড়ল— যাদের সঙ্গে কলকাতার পরিচয় হয়েছিল অধ্যাপক হুমায়ুন কবির সাহেবের দরবারে। যেতে যেতে দেখেছি মেদিনীপুরের বহু বিস্তীর্ণ মাঠের আমন ধানের সোনালী ঢেউ। নারকেল গাছের ভিড়। পানের বরোজ। পলিমাটি। এইসব মাঠ ঘরবাড়ি মাঝে মাঝে বন্যায় ভেসে যায়। অধিকাংশ মাটির ঘর পল্লীগুলোতে। পাকাবাড়িও হচ্ছে মাঝে মধ্যে। যেখানে শহর মত সেখানে এসেছে ইলেকট্রিক, আছে হাই স্কুল, প্রাইমারী স্কুল, বাজার-হাট। লোকের জটলা, মেদিনীপুরের দূর গ্রামাঞ্চলে এখনো ঢেঁকির পাড় শোনা যায়। বাবলাকাঠের সাত হাত ভারী ঢেঁকি, যার মুসুলীর মুখে থাকে লোহার সাঁপি। চিঁড়ে কোটা ঢেঁকির মুসুলীর মুখে সাঁপি থাকে না।

প্রায় একশো তিরিশ রকম ধান হয় মেদিনীপুরের পঁচিশটা থানায়। কোলাঘাট, বাসুদেবপুর, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর, কলাইকুন্ডা, তমলুক, মহিষাদল, সাবং, ভগবানপুর, হলদিয়া, নন্দিগ্রাম, কাঁথি, দীঘা, দাঁতন, খড়্গপুর, নারায়ণগড়, গোপীবল্লভপুর, বীনপুর, রামগড়, শালবনী, আবড়াডিহি, দাসপুর, কেশবপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, গড়বেতা, পিংলা, পটাশপুর, বেনাপুর,সুতাহাটা. খেজুরি, রাধামোহনপুর, প্যানচেট, বড়বেড়িয়া, রামজীবনপুর, গোবিন্দপুর, ফুলবেড়িয়া বাজার — প্রায় পঞ্চাশটা শহর উপশহর

মেদিনীপুর জেলায়। অনেক বাজার হাট, ডাকঘর, স্কুল, বড় দারোগা, পুলিশ, পঞ্চায়েত প্রধান, বি-ডি-ও, এম এল এ, মন্ত্রী আর একজন সুদক্ষ জেলা প্রশাসক।

যখন মিটিং মিছিল বেরোয় পঙ্গপালের মতন ক্ষেত খামার গ্রাম শহর ঝেটিয়ে পতাকা বহন করে এসে ওঠে রেলগাড়িতে — চলে যায় কলকাতায়, পয়সা লাগে না— নগ্নপদ জনগণ। কালো কালো মানুষের দঙ্গল। কংগ্রেস (আই), এস. ইউ. সি. আই, সি. পি. আই. এম — সব দলই।

যে লোকটি দাঁতন থেকে মাথায় পানের মোট নিয়ে যাচ্ছে, যে মেয়েটি শালপাতার পেটি নিয়ে যাচ্ছে হাটে, যে খেজুর পাতার চাটাই বা মাগুড় মাছের কলসী কিম্বা শোলার ফুল, মাদুরী, শুকটি (শুটকি নয়, শুকনো থেকে, — ভেট্‌কি নয়, ভেকৃটি —ভেকুট বা কুঁজো) মাছ নিয়ে যাচ্ছে, হাল করছে পাট ফেলার জন্য গরু তেড়ে — সবাই এখন রাজনীতি সচেতন — অন্তত ভোট দেওয়ার ব্যাপারে। তবে বাবুরা বারে বারে ভোট নিয়ে গিয়ে কোথায় যে কি করেন তেমন হদিস পায় না এরা।

শের আলি ঘরামি মাটির ঘর গড়ে, দশটাকা রোজ, একেবারে ফুরসত নেই আমন ধান ওঠার পর এখন। সে বলে, কত ভোটই তো দিলাম — জিনিসের দাম কমে কই? রাস্তাঘাট হল কই? একবার বান এলে মুই যে সব দুশো তিনশো মাটির ঘর গড়ে দিচ্ছি, সব গলে যাবে — ভেসে যাবে। কলাইকুণ্ডায় রোজ রাতে কামান দাগে, খোলার ঘর ঝনঝন করে।...

মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজের আজান শোনা যায় মেদিনীপুর শহরে। — কাতারে কাতারে নামাজ পড়তে যায় মুসুল্লিরা।

কাঁসরঘন্টা বাজে, শাঁখ বাজে সন্ধ্যায় হিন্দুদের বাড়িতে। সাত আসমানের ওপর ফুলের শয্যায় নারায়ণ ঘুমোয় লক্ষ্মীকে নিয়ে, তার টনক নাড়িয়ে ছাড়ে অষ্টম প্রহরে পালা কীর্তনে খোল করতালের জগঝম্প বাজিয়ে।

রহিম সেখকে কাকা বলে ডাকে সনাতন বাগ্‌ড়ি। সাম্প্রদায়িকতার নাম গন্ধ নেই। আলে বসে মুড়ি-তামুক-মুড়কি-বিড়ি খায় হিন্দু-মুসলমানজনেরা। ট্রেনে বাসে রোজকার যাত্রীরা খবরের কাগজ আনে। রেডিও থেকে খবর শোনে। গান শোনে। মেদিনীপুরের শহরে ইলেকট্রিক আলো আছে। সুন্দর আধুনিক বাড়িতে নিয়ন জ্বলে, টিভি চলে। কাজবাড়িতে মাছ আর ব্রয়লার মুরগির মাংসের অভাব নেই। টাকা থাকলে ঝাড়গ্রামের কেঁদুপাতার বনের আস্তানায় মৃগমাংস আর গোবিন্দতুলসী সুগন্ধি চালের পরমান্ন পাওয়া যায়। অভাব আছে গরিবদের জন্য। যাদের সংসারে এখনো একজনও কোনো কাজ পায়নি। গতর খাটাতে হয় যাদের অত্যন্ত কম মজুরিতে, তাও সপ্তায় সব দিন হয় না। টেস্টরিলিফের কাজ হয়েছিল ফ্রন্টের প্রথম পাঁচবছর

— তারপরে আর নয়।

হুগলী, রূপনারায়ণ, হলদি, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, পাবং, সিলি, তারাফেন, দোলাং, রসুলপুর — কত নদী ইন্দ্রজালের মতো ঘিরে রয়েছে মেদিনীপুর জেলাকে — সেচপ্রকল্প হলে পলিমাটি থেকে বিঘেয় ৬/৭ মণ আমনের জায়গায় ২০ মণ বোরো চাষ করা যায় কিন্তু লাটকে লাট, মাঠকে মাঠ আমন-ওঠা জমি জল বিহনে পড়ে থাকে। উদোম ঝড় হাওয়া বয়ে যায় রোদে পোড়ে গ্রামগুলোর মাঠে। ঘাসও জ্বলে যায় গরুর বাথান রোগা কাঠ হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শহরে নগরে চাকচিক্য আছে। বাবুদের গায়ে উঠেছে টেরিকটের জামা। টেরিউলের কোটপ্যান্ট।

মেদিনীপুরে বেশি শিল্প গড়ে ওঠেনি। তাই বহিরাগতদের তেমন বেশি চাপ নেই। তবে ওড়িয়া বেহারী আর কোথাও নেই বলুন পশ্চিমবঙ্গের শহরে উপশহরগুলোতে? কাঁথি জুনপুটের বালিয়ারিতে প্রতি বর্গ কি.মি. তে ১০০ জন করে বসবাস করে। মেদিনীপুরে গড় বসবাস ৪০১ জন। বালিয়াড়ির পাহাড়গুলো ১০/১২ মিটার উঁচু হয়।

কিন্তু হল্‌দি নদীর উৎসমুখে হলদিয়া বৃহত্তর বন্দরে, ডক, নগর, শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠাতে বহু বহিরাগতও এসে পড়েছেন জীবিকার দায়ে। কলাইকুন্ডা বিমানঘাঁটি, কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রেও বহু বহিরাগতের আমদানি।

পাট, নারকেল, রবিশস্য, পান, আউশধান মেদিনীপুরের আসল ফসল। কিন্তু ট্রেনে বা লরি ভর্ত্তি করে কলকাতা বা হাওড়া শহর থেকে যা আনতে হয় তার পরিমাণ অনেক। কাপড়, জুতো, মশলা, আনাজ, সিমেন্ট, লোহা-লক্কর, কাগজ, বইপত্র, বাসন-কোসন, কাঁচের দ্রব্য, নানা রকম তেল, রঙ — হাজার জিনিস।

বহু বিস্তৃত এলাকায় অশিক্ষিত আর গরিব গ্রামবাসীর সংখ্যা শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ। চরম দারিদ্র্যে, অর্ধাহারে, অনাহারের সঙ্গে রোগজীর্ণ শরীরে লড়াই করতে করতে একদিন কবরে চলে যাচ্ছে বা চিতায় উঠছে এরা।

তবু দল চলেছে নগ্ন পায়ে মিছিল করে পতাকা হাতে নিয়ে 'আমাদের দাবি মানতে হবে' — বলে চিৎকার করতে করতে — 'কি দাবি তাদের' শুধোলে বলে, 'তাতো আমরা জানি না— সামনের বাবুরা জানে—...'

কুলআঁটির মতন শুকনো ঠোঁট, গর্তে ঢোকা চোখ, চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে এমন কাপড়, গোড়ালি ফাটা, কড়া কড়া হাত এমন হাজার হাজার মানুষ আজ মেদিনীপুরে— ৩৬ বছর গেল তাদের উপর দিয়ে স্বাধীনতার সুখের দিনগুলোর।

অমাবস্যার অন্ধকার রাতে কেরোসিন কুপি না জ্বাললেও হলদিয়ার আকাশে যে

আলো ভাসে তাতে গরুর চামড়ার মতন মাখন-বিহ্নি কাঁচা আটার রুটি চিবিয়ে খেয়ে খেজুর বা নারকেল পাতার চাটাইয়ে শুয়ে দিন গুজরানের মত সাদাসিধে জীবন বুঝি আর পৃথিবীতে নেই।

ওদের মতো গরীব বোকাদের নিয়ে যতদিন খুশি রাজনীতি করা একটা লাভজনক ব্যবসা।

বীরভূমের শতকরা যাটজন গরিব কি করছে?

সাহেবগঞ্জের ট্রেনে ছোট বগি, ঠাসাঠাসি ভিড়, দোহাতি মানুষ বেশি, সন্ধ্যা নামার আগে অজয়ের চরে দীর্ঘ কাশের বনে যেন সাদা নদী ঢেউ খেলে যাচ্ছে দেখলাম, শ্রীনিকেতনের শাল গাছ, তারপর লোহাচুর, পাথর, কাঁকর, অসমতল ভূমি, কোপাইয়ে এসে আমরা নামলাম। ছোট স্টেশন। চা খাওয়া হল। কোপাই কেন নাম হল? কোপায় নাকি এখানকার লোকেরা?

আবার দুটো বগির ট্রেনে যেতে হবে। একজন বলল, ঐ উত্তর দিকে তারাশঙ্করের জন্মস্থান লাভপুর। অন্ধকারে ট্রেন চলেছে। পাশের লোককে চেনা যায় না। আবার দক্ষিণ দিকে ফিরে চলেছি। আমাদের দলের একজনের পকেটমার হল কিন্তু ব্যাগটা ছিটকে পড়ল এক ভদ্রমহিলার পায়ের তলায়। যিনি পকেট মারছিলেন তিনি প্যান্ট সার্ট পরা ভদ্রবেশী যুবক। তর্ক হল্লার মধ্যে লোকটি এক স্টেশনে দুয়ো পেতে পেতে নেমে গেলেন। কীর্ণাহারে পৌঁছলাম। সেখান থেকে হাঁটাপথে গ্রামের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের গবেষক এম আবদুল রহমানের বাড়ি। দোতলা পাকাবাড়িতে উত্তম খানাপিনা, ফ্যানের হাওয়ায় আরামশয্যা। রহমান সাহেবকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে পরদিন বিকালে কীর্ণাহার হাইস্কুলে। সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন পত্রিকা সম্পাদক, কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিকরা। সকালেই দোতলার জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম পুকুরভরা জল, আম-জাম-বেল-পাকুড়-সাঁইবাবলার গাছ। সাঁইবাবলার ফলকে 'জিলিপি' ফল বলে এখানে। খামারে কবাড়ি খেলাচ্ছে আধবুড়ো ছেলেরা। ছোট ছোট বোরোধান কেটে তুলে এনে টাল দিয়ে রাখা হয়েছে। জামাকাপড় পরে নেমে এসে রহমান সাহেবের উঠোনে মাছ রাখা খালুই, চুবড়ি, ঘুনি, আটল, ধুনুচি ইত্যাদির বুননগুলো দেখলুম। ভারি চমৎকার আর মজবুত। রহমান সাহেবের মেয়ে আর জামাই বললেন, 'এসব আদিবাসী সাঁওতালেরা বোনে।

'বীরভূম জেলাটা ছোট। বিহারের সাঁওতাল পরগণার গায়ে। গোটাটাই ল্যাটেরাইই মাটি। কাঁকড় বালি লোহাচুরে ভরা। রাঢ় অঞ্চল। ইস্ট ইন্ডিয়া রেলপথ চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে বোলপুর থেকে বিহারের সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত। বর্ধমানে নয়, খানা থেকে সাহেবগঞ্জ লাইনে আপনারা কোপাইয়ে এসে নেমেছিলেন। অন্ডাল থেকে কর্ডলাইন সিউড়ি হয়ে এসেছে সাঁইথিয়ায়। নলহাটি থেকে স্টেট রেলপথ গেছে লাহাপুরে। জেলাটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা প্রায় ৫০ মাইল। দক্ষিণটাই চওড়া একটু, মাইল

ছত্রিশ। মাঝখানে মাত্র মাইল বারো। প্রধান শহরগুলো হল বোলপুর, শান্তিনিকেতন, কোপাই, পাপরি, শামুক, বেঙ্গছত্র, বিপ্রটিকুরি, লাবপুর, ছাহ্‌তা, কাষতেড়ি, কুলগ্রাম, সুলতানপুর, অম্মেদপুর, বাতাসপুর, সাঁইথিয়া, মহম্মদবাজার, ভবানীপুর, রাজনগর, বক্রেশ্বর, লকপুর, খয়রাসোল, রসা, কটাশগ্রাম, পাঁছরা, দুবরাজপুর, কষ্টগ্রাম, চিনপাই, সাহাডিহি, মঙ্গলডিহি, সিউড়ি, গানপুর, মল্লারপুর, রামপুরহাট, ময়ূরেশ্বর, নলহাটি, ছত্র, রুদ্রনগর, ভদ্রপুর, টাকিপুর, লাহাপুর, পাইকর, জাজিগ্রাম, সুরারই, নন্দীগ্রাম, বুরসা, রাজ, নানুর। আছে অজয়, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, ময়ুরাক্ষী, পলাশী নদী। লোক বসতির ঘনত্ব প্রতিবর্গ কি. মি. তে ৩৯০ জন। সমগ্র অঞ্চলে ৩০০ থেকে ৬০০ জন।

বললাম, 'সিউড়ি'র বেলের মোরব্বা তো খুব বিখ্যাত, কবিরুল ইসলামকে বলেছিলাম 'যাব একদিন দেখব সব'।

'শুধু বেলের মোরব্বা নয়, এখন লাউ, কুমড়ো, পেঁপে, করলা, আপেল, পেয়ারা কোনো কিছুর মোরব্বা হতে বাকি নেই। তবে সিউড়ির নামে ওসব চলে—অনেক আবার কলকাতাতেই হয়। যেমন আপনাদের জয়নগরের মোয়া'।

'মুর্শিদাবাদের শালার অঞ্চলের লোকেরা বীরভূম আর বর্ধমানের সন্ধিস্থলে — চেহারায় কিছুটা নবাবের দেশের ভাব, কিছু রাঢ়ীয়। বীরভূমের লোকদের ভাষায় বিহারের হিন্দির টান আছে। ছোট ছোট নদীগুলোয় বর্ষাকালে বানবন্যা লেগে যায়। গ্রাম ভাসিয়ে দেয়। ধানই এখনো মূল উৎপন্ন ফসল। সাঁওতাল মুন্ডা আদিবাসী আছে প্রচুর — একই গ্রাম — বাঙালীদের সঙ্গে মিলে মিশে বহুকাল — কালে কালে এরা বাঙালিদের মতো হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক স্কুল, টিউবওয়েল হয়েছে, বাবুপাড়ায় ইলেকট্রিক গেছে। রাস্তাঘাট কিছু কিছু হয়েছে। তবে পাকা সড়ক আরো হওয়া উচিত। গরিব মানুষদের বড় কষ্ট হচ্ছে। দ্রব্যমূল্য বাড়ছে আর তাদের মজুরি কম, কাজও অনেকের হয় না সব সময়। তাদের ছেলে মেয়েরা মানুষ হচ্ছে না, আর মেয়েদের বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, 'অত বড় বড় মাঠ, বোরো চাষও হচ্ছে, জমিগুলো কাদের?'

শিক্ষিকা ফিরোজা বেগম চা দিতে এসে বললেন, 'জমি সব বড়লোকেদের। দেশে তাদের পাকাবাড়ি আছে — থাকেন অনেকে কলকাতায়। সেখানে তাদের দোকানপাট ব্যবসাবাণিজ্যও আছে। কম কম জমি যাঁদের তারা এখনো মাটির ঘরে খড় টালি টিন চাপিয়ে টিকে আছে। বাকিরা তালপাতার কুঁড়ের মধ্যে ধুঁকছে। এরা জেলে, কামার, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, পাতকোয়া খননকারী, ঘরামী, চাষের জনখাটা মানুষ। গ্রামে এখন দু-চার ঘর বাবুলোক — বাকিরা ক্ষেত মজুর, কুলী, ধাওড়া। অনেক লোক কলকাতা কোন দিকে বা কেমন বস্তু নজরেও দেখেনি। তবে শহর উপশহরে সিনেমা দেখতে

যায় দলে দলে।...'

সকালেই আবার ট্রেন ধরে কাটোয়া থেকে সোজা হাওড়ায়। গাড়িতে তর্কবিতর্ক ঃ বন্ধুরা সাহিত্যের বলটাকে সট্ মেরে মেরে ধর্মের পোস্টের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে গোল দিতে চায়। আমার বেইমান মন বলে, তাকি হয়?

আবার জয়দেবের মেলায়। লোকে লোকারণ্য। বাউল দলের উচ্চগ্রামের সুর লহরা — একতারার টংকার, মন ভোলানিয়া মদির অঙ্গভঙ্গি। বাউল বৈষ্ণবীরাও বা কম কিসে? কবি জয়দেবের দেশ অজয়ের চর ধন্য। কবি কুমুদরঞ্জনও এখানের লোক।

শ্রীনিকেতনের শিল্পকাজ, শান্তিনিকেতনের শান্তির আশ্রয়, শালবন, ছাতিমতলা— নানান জায়গায় বড়লোকেদের ছেলেমেয়েদের কাব্যিক ঢং, পোশাক-আষাক কেন জানি না রাঢ়ের রূঢ় মাটির সঙ্গে যেন বেমানান। রবীন্দ্রনাথ কেন পালিয়ে আসতেন তাহলে— এখানে কি ছিল তাঁর জন্য আকর্ষণীয়? তারাশঙ্করের চেহারায় চরিত্রে রাঢ়ের অতি ঘনিষ্ঠ ছাপ ছিল, তাঁর জন্য এই অঞ্চল জলে থাকা মাছের মতন। বোধহয় কলকাতার ভিড় থেকে বাঁচার জন্যে, নীরব তপস্যার জন্যে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের ভাল লেগেছিল বলে বীরভূম আজ ধন্য। সাঁইথিয়া, নলহাটি ঘুরে এলাম কিন্তু বীরভূমের আসল শহর সিউড়ি দেখা হল না।

আব্দুল মান্নান শিক্ষিত ভদ্রলোক, গল্প লেখেন, প্রায়ই চিঠি লেখেন সিউড়ি যাবার জন্য। থাকা- খাওয়া ফ্রি। গাড়ি ভাড়াও দিয়ে দেবেন। 'যদ্দিন খুশি থেকে গ্রামাঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখুন, আর লিখুন আমাদের কথা। বিশেষ করে মুসলমানদের কথা। যাদের কথা বড়রা কেউ তেমন লেখেননি।'....

রামপুরহাটের চাষী গেরস্থ মৌলবী আজিম হোসেন বললেন, 'ভাল রোজগারের চাকরি আর আমরা (মুসলমানরা) পাব না ভাই সাহেব। আমাদের ছোট খাটো ব্যবসাই ভালো। লেখাপড়ার হার বেশি না থাকলেও দেখছেন না শিখরা আর বেকার নেই। তবে টাকাতেই তাদের মাথা গরম হয়ে গেছে। ইন্দিরা গান্ধীকে বোঝার মতন তাদের ব্রেন নেই। — দেশের তলার মানুষদের দুঃসহ দারিদ্র্য। জানেন বীরভূমের বহু ধান চাল গম অন্য জেলায় চলে যায় কিন্তু এখানের গরিবদের দুবেলা ভাত-রুটি জোটে না? আরো কতদিন লাগবে সাধারণ মানুষদের দুঃখ কষ্ট দূর করতে? গ্রামের উন্নতি মানে কি দুটো চারটে টিউবঅয়েল পুঁতে দেওয়া, দুটো চারটে রাস্তা আর স্কুল গড়া? ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছরে বাবুদের বাড়িতে বিদ্যুৎ আর পকেটে টাকার তোড়া আসা ছাড়া গরিবরা কি পেয়েছে? কেরোসিন আর রেশন দোকানে যে সব ক/ খ শ্রেণীর লোকেরা লাইন দেয় তাদের চেহারার ছবি তুলে নিয়ে গেল সেদিন বিদেশি সাহেবরা। এসব দেখাবে বিদেশে। ওইগুলোই তো আমাদের পরিচয়, আমাদের ভারত।....'

ভিখারীদের ছাড় আছে ট্রেনে। আর ধরলে তো তাদেরই লাভ। খেতে দেবে তবু। তাই ধরে না আর। কীর্ণাহার, নানুর, কষ্টগ্রাম, রামপুরহাট থেকে জমি জায়গা বাস্তুভিটে হারিয়ে পেটের দায়ে কত ভিখারী চলে গেছে কলকাতায়। তারাই সাঁইথিয়ায় জেরক্স মেশিনঅলা বড়লোক আকরাম হোসেনের কন্যার বিয়েতে ফেলে-দেওয়া বাসি-এঁটো-উচ্ছিষ্ট খাদ্য কুড়িয়ে খায় পথের পাশের আঁস্তাকুড় থেকে কুকুরের সঙ্গে।

বারেক গরিব-দরদী পৌরপিতারা সঙ্গে সঙ্গে আঁস্তাকুড় সাফ করেন না — এতে অনেক গরিব পথের কুকুর প্রাণ ধারণ করে।

স্বাধীনতার তিনটে যুগ পার হল, কুড়ি হাত অঙ্কের লক্ষ লক্ষ কোটির গোটা ছয়েক পরিকল্পনা রূপায়িত হতে চলেছে, তবু দেশের দারিদ্র্য দূর হলো না কেন? সারা শরীরকে ফাঁকি দিয়ে মুখে রক্ত ওঠার মতো গ্রামকে বঞ্চিত করে শহরগুলো সমৃদ্ধ হয়েছে। বীরভূমের ল্যাটেরাইট মাটিতে কলা, মূলো, আলু, পিঁয়াজ, নারকেল, সুপারি, বাঁশ, শকসব্জি না হলেও নামে বেনামে রাখা অনেক জমির মালিকরা দেশে পাকাবাড়ি রেখে শহরে-নগরে এসে যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন সেই দশ ভাগ লোকের ছেলেরা দুধ-ঘি, মাছের মুড়ো, খাসী-মুরগি ফল-কেক-ডিম, সন্দেশ, পোলাও খেয়ে দেশ বিদেশ থেকে লেখাপড়া শিখে এসে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, জেলাশাসক, এস-পি, বড় দারোগা, সেক্রেটারী, অফিসার, এম-এল-এ, এম-পি, মন্ত্রী ইত্যাদি হয়েছেন। তাঁরাই ক্রিম অব দা কানট্রি। মধ্যবিত্ত, উচ্চ নিম্নবিত্ত থেকে পনেরো কুড়ি ভাগ লোক দেশের কিছু জমি, মুদিখানা কয়লা-কেরোসিন, ইঁট-বালি-সিমেন্ট লোহা চাল-ধান, লরি-বাস, ধানকল-চাকিকল-সার-ওষুধ নিয়ে বসে আছেন, তারপর সত্তরভাগ মানুষ ঘোড়ার ঘাস কাটছে। এদের ভালাই করবার নামে একদল লোক ক্ষমতা লাভ করে থানা, কোর্ট-কাছারী, পঞ্চায়েত ইত্যাদি হাতে পেয়ে দশ বছরেই চেহারা পোশাক চকচকে করে ফেলে জমি আর পাকা বাড়ি করে ফেলেছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের স্বনির্ভর করে দিতে যে একচল্লিশ কোটি টাকার গণঋণ দেওয়া হয়েছিল তা মকুব করে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চাশ টাকা করে বেকার ভাতা দিয়ে ফ্রন্ট সরকারের ঋণ নাকি একুশ কোটি টাকা ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কাছে — আশা করি গরিবী দূর করার জন্য এটাও মকুব হয়ে যাবে। আর গ্রামগুলোতে মুরগি, মাছ, গরু-ছাগল, ধান-পাট, নারকেল, বাঘ-কুমির-ব্যাঙ চাযের জন্য যেসব কোটি কোটি টাকা ছাড়া হয়েছিল তাও আর ওঠেনি, উঠবেও না বোধহয়— সবই লোকসান গেছে, একদিন এসবও মকুব হতে পারে যদি এইসব নিম্নবিত্তদের ভোট পাওয়া যায়। ধনীরা তো শাঁখের করাত হয়ে মিল কারখানার কতই মারেন, এঁরা না হয় কিছু মেরে দেশের দারিদ্র্য-দুর্নাম দূর করবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন কিন্তু যাদের জমি নেই, দলিল বন্ধক রাখতে পারে না ব্যাঙ্কে,

দাদা নেই, নেই মদত দেবার, যারা হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালার জন্য টাকা পেল না, যাদের ডোবায় কই-চ্যাং-ল্যাটা ছাড়া পোনা ফেলার টাকা জোটে না, বাবুদের জমিতে যারা দশ টাকার বদলে পাঁচ টাকায় জন খাটে সপ্তায় তিনদিন মাত্র, তেভাগার জায়গায় আধাআধি ভাগে বছর বছর জমি বদলে চাষ করেও খরচা তুলতে না পেরে দেনায় ডোবে, যাদের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারে না জামা কাপড়, বইখাতা, টিউশনির খরচ, খাবার অভাবে — তাদের সংখ্যা তো শতকরা ষাট পঁয়ষট্টি ভাগের মতন— নাহলে বীরভূমের সাঁওতাল -মুন্ডা-কুলী-ধাওড়া গরিবরা মেয়েমর্দ মিলে বাচ্চাকাচ্চাদের পিঠে বগলদাবায় নিয়ে ঠিকেদারদের শিকার হয়ে ওঠার পর ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়ার ইটখোলা, টালির কারখানায় গতর খাটাতে যায় কেন? প্রকৃতির দয়ার আবার বাবুদের জমিতে চাষ পড়লে কাজের জন্য ছুটে আসে তিন চার মাসের জন্য সংসার পাতে। ক / খ শ্রেণীর প্রতিটি সংসার থেকে অন্তত একজন করে কাজ বা চাকরি পাবার কথা দিয়ে যাঁরা ক্ষমতা লাভ করলেন তাঁদের কথা কি রাখতে পেরেছেন? ডিগ্রি, মেরিট, টাকা না থাকলে চাকরি পাওয়া যায়?

আর্যভট্ট বা ভাস্কর আকাশযান থেকে সঠিকভাবে দেখুন না আমাদের অঙ্ক ভুল কিনা— বীরভূমের শতকরা ষাটজন নিম্নশ্রেণীর গরিবরা কি করছে?

স্বাধীনতা আর পরিকল্পনাগুলো তাদের কাছে ধোঁকাবাজি বা বাবুদের বাড়ির আতসবাজি ছাড়া আর কি ভাবতে পারে তারা?

বাঁকুড়া পুরুলিয়ার মানুষরা কুকুরের ল্যাজ সোজা করে দিন কাটাচ্ছে

দেড় হাজার বছর আগে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে রাজা চন্দ্রবর্মা কি কথা লিখে রেখে গেছেন সাঁওতাল, লোধা, ওঁরাও, মুন্ডা, হো, বীরহোড় মানুষদের জন্যে? তোমরা ধৈর্যশীল হও ক্ষুধার সময় অযোধ্যা পাহাড়ের পাথর কেটে বেঁধে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটলেও বাবা বিহারীনাথের পূজো দিতে কড়া-পড়া কাঁধে বাঁকে করে গঙ্গাজল নিয়ে যেতে ভুলো না; আর আকাশে মেঘ না এলেও শুশুনিয়ার কালো রূপ দেখে বিভোর হয়ে বাঁশি বাজিয়ো — শাল, তমাল, মহুয়া, শিশু, ছাতিম, শিমূল, পলাশের তলায়। মহুয়ার ফুল কুড়িয়ে মহুল তৈরি করে। বনপুঁই আর কুৎসিত ডাল খেয়ে, আখ-ভূট্টা কেটে, গুলতি-তীর ছুঁড়ে ভাম্ ইঁদুর খটাশ, কাঠবেড়ালী, ট্যাপাখি মেরে, ধামসা মাদল বাজিয়ে লেপা-পোঁছা ভুইকুঁড়ের মধ্যে বাস করো— সরদারের কথা মতো চলো — আর এটা সত্য জেনো যে তোমরাই পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে অকৃত্রিম আদিবাসী। তোমাদের কালো চামড়া লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সূর্যের আগুনে ঝলসানো। পাথর কাঁকড় বালির ভূধর ভেদ করে ট্যারা বাঁকা টোল খাওয়া দোল খাওয়া মোটা চামড়ার পলাশ গাছ যেমন মা বসুমতীর বুকের রস শোষণ করে বাঁচে আর সূর্য যখন কাঠফাটা বোশেখে তার রথ এনে দাঁড়ায় মাথার ওপরে — হাড়ে গোড়ে রক্ত ঢালা ফুল ফোটায় আনন্দে — তেমনি হও তোমরা।...

লাল সরকারও তেমনি, হাসি মুখে হাড়ে চটা সাহিত্যিক সাংবাদিক শিল্পীদের ছ'শো জনকে ৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে পুরুলিয়া শহরে নাচতে নেমতন্ন করলেন। যার গালভরা নাম লোকনৃত্য।

বিনয় মাহাতো আমাদের রাহাদার। মহাকরণ থেকে ডিলাক্স বাসে তেইশজন সাংবাদিক —খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি, পি টি আই ইত্যাদির প্রতিনিধি।

রাতে এলাম পুরুলিয়া শহরে। বি টি কলেজে ঠাঁই হয়েছে আমাদের। কল আছে জল নেই বাথরুমে নতুন জালায় খানিকটা করে জল রাখা আছে। হাত-মুখ-ধোয়া, শৌচাকার্য করো — স্নান করা চলবে না। এই গরমে, হায় এই নরকভোগ।

তা হোক। বন্ধুরা তাস খেলতে বসে গেলেন।

ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের মাঠে লোকনৃত্য দেখে এলাম। নানান জেলা থেকে এসেছেন শিল্পীরা। মুন্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও, হো, লোধা, বীরহোড়। হাইস্কুলের খোপে খোপে আশ্রয়। অনেক যুবতী। খোঁপা, পলাশের গুচ্ছ। লাল পাড় শাড়ি। অনেক যুবক।'আর

ময়লা ইস্ত্রিহীন জামা-কাপড়।

রাত্রে শালপাতায় ভাত, হড়হড়ে ডাল, কুমড়োর তরকারি। আমড়ার চাটনি। তাই খাচ্ছেন গরিবরা কনুই ডুবিয়ে সপাসপ — চটাং চটাং শব্দ তুলে। ভাবা যায় এটা আমেরিকা, রাশিয়া, কিংবা জাপান চীনেও — এতজন শিল্পী হো হো গাজনের মতো মাটির খুরিতে জল নিয়ে শালপাতায় যা তা ঘরোয়া খাদ্য খুঁচ্ছেন? তাও কার পাতে ভাত তরকারি নেই চেঁচামেচি।

সকালে আসল পুরুলিয়াকে দেখলাম। পাছার দিকে সরু হয়ে যাওয়া রুগ্ন মোষ আর গরু শুকনো খড় চিবোচ্ছে, রাস্তায় ধারে গরুর গাড়ির মোড়ায় বসে গাড়োয়ান গাঁজা ডলছে, আর দর দস্তুর করছে কাঠ খড় বা হাঁড়ি-কলসী বওয়ার ভাড়া সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে জিউলি গাছের মতো মোটা ছালের টেরা বাঁকা পলাশ গাছ — ডালপালা ভরা লাল ফুল — ফুলগুলো ছোট বাঁকা নাকের মতো। তিনফুল যেমন। পাশে দুটো পাপড়ি। পাতাগুলো বাটির মতো — এক ফলকে তিনটে করে।

জল নেবার লম্বা লাইন। এত বড় লাইন কলকাতায় হিন্দি সিনেমায় শুধু দেখা যায়। লোকের চাইতে কলসীর সংখ্যাই বেশি। বেশির ভাগ মেয়ে। সবই আদিবাসী। একজনও বাঙালি নেই। একজন মাঝবয়সী মেয়েকে জিগ্যেস করে জানলাম, তাদের প্রত্যেকের কুড়িটা করে কলসী বসানো আছে। বাবুদের তারা জল বয়। পাম্পের জল ন-টার পর চলে যাবে— সারাদিন আর মরে গেলেও কেউ জল পাবে না এই 'টিপকল' থেকে।— বুঝলাম এখানে টিউবঅয়েল নেই — যা মাটি ভেদ করে পাতাল থেকে স্বচ্ছ সলিল তুলে আনে।

সকালে অনুষ্ঠান শুরু। রণ-পা নাচ। ছৌনাচ। রায় বেশে। কত কি দেখলাম। মন্ত্রী শম্ভু মান্ডি এসে উদ্বোধন করেছেন। সাংবাদিকরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দোকানপাট বসেছে। হাজার হাজার লোক। যেসব দল নাচবে, বাজাবে, গাইবে অপেক্ষায় আছে। কত শত রকমের বাজনা। বড় বড় ঢাক ঢোল, ধামসা, মাদল, বাঁশি, ঝাঁঝর, চচ্চড়ি, নূপুর, পাঁয়জোর, কর্তাল, শিঙ্গা। এক এক দলে ৫০ / ৬০ জন করে নারীপুরুষ। এসেছেন হুগলি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম নদীয়া থেকে। সকলেই লোকনৃত্য শিল্পী।

জাতীয় সড়ক দু-নম্বর গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক রোড় ধরে চলেছি। সামনে কালো মেঘের চূড়া। ক্রমেই কাছে এলো রঘুনাথপুর পার হতে। ছ'টা পাহাড় এক জায়গায়। একজন বলল, 'এটা শুশুনিয়া পাহাড়।' পরে বাঁকুড়ার সন্তান সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু বলেছিলেন, 'ওটা বিহারীনাথ'। ওর মাথা ৪৫২ মিঃ উঁচু। (উল্টোরথের গত সংখ্যায় দেখলাম 'বাঁকুড়ার এই মাল'টি আমেরিকার একশো পাঁচ তলার ওপরে!) শুশুনিয়া ৪৫০ মিঃ

উঁচু। পাঞ্চেৎ ৬৪৩ মিঃ। পুরুলিয়া শহর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে আকাশের গায়ে হাতে মাথা রেখে মহাদেবের মতো পড়ে থাকতে দেখেছিলাম অযোধ্যা পাহাড়কে।

গাড়ি চলেছে। দুস্তর মাঠ। লালচে মাটি। পাহাড়ের গায়ে ইউক্যালিপটাস জঙ্গল রচনার প্রয়াস চলছে। গলা পাথরের ঢল নেমেছিল কত লক্ষ বছর আগে কে জানে! জমিতে আল বাঁধা সরু সরু, টেবল করে— ধাপে ধাপে নেমেছে। ন্যাড়া খেজুর গাছ। শিশু, শাল, অর্জুন গাছ পথের পাশে এক আধটা। কেবল মাঠ, কেবল মাঠ। সবুজ কিছু চোখে পড়ে না। আমরা সোঁদরবনের দিকে গাছপালা বন-জঙ্গলের সবুজে-ডোবা-মানুষ। ধূধূ শূন্য রোদ পোড়া মাঠের আগুন ঝিলিমিলিতে চোখ পীড়িত হয়। ২৪ পরগণার পথের পাশে কচুগাছ, মালোয়ারী লতা। বনতুলসীর যেন এখন আদর বাড়ল মনের মধ্যে।

এক জায়গায় চারিদিকে লালচে পাথরের পাহাড়ে ঘেরা জলাশয়। একদিকে খোলা। হাঁটুজলে কলসী ভরে নিয়ে আদিবাসী মেয়েরা চলে যাচ্ছে কত মাইল দূরের পল্লীতে। ধারে ধারে সাদা বক চরে বেড়াচ্ছে। রুগ্ন মোষের গাড়ি নামছে জলাশয়ের ধারে — কাদামাটি বয়ে নিয়ে যাবে। দূর্মূল্য মাটি। বাড়ি তৈরি হবে পলাশের ডাল কেটে ছিটে বেড়ার দেয়াল গড়ে। বাঁশ তো কোথাও নেই। আনাজ ফসল কিছুই নেই। দুর্ভিক্ষ বাধলে কচুঘেচু বুনোশালপাতা কিছুই সেদ্ধ করে খেয়ে বাঁচতে পারবে না।

রঘুনাথপুর খানিকটা শহর বাজারের মতো। সিমেন্ট কারখানা গড়ে উঠেছে এখানে।

বাঁকুড়ার এক সাংবাদিক বন্ধু কথা বলছিলেন, এখন কলকাতায় থাকেন, রুক্ষ রাঢ়ভূমি হলেও নিজের জেলাটিকে ভালবাসেন, বলছিলেন, 'জয়পুর, কোতলপুর, ইন্দাস, পাত্রসায়ের, সোনামুখী, বড়জোড়া, মেজিরা, সালতোড়া, গঙ্গাজলঘাঁটি, ছাতনা, বাঁকুড়া, ওন্ডা, তালডাঙরা, ইন্দপুর, খাতরা, সিমলাপাল, রায়পুর, রাণীবাঁধ — এই আঠারোটি থানা আছে আমাদের।'

বললাম, 'বিষ্ণুপুরের মৃৎশিল্প তো খুব বিখ্যাত। ভাল মাটি পায় না বলে এখানের লোকেরা বোধহয় এত যত্ন নিয়ে পুতুল-ঠাকুর গড়ে কিন্তু মাটির ঘোড়ার গলা এত লম্বা, মাথা এত উঁচুতে কেন বলতে পারেন?'

'বন্ধুটি বললেন, 'পাহাড়ের ওপারে কি আছে দেখার জন্যে।'

শ্যাম ছিলেন, বন্ধুটিকে টোক্কর দিয়ে বললেন, 'ঐ ঘোড়ার ডিমও হয় তোদের বাঁকুড়ায়।'

বন্ধু বললেন. 'পুরুলিয়া বাঁকুড়ার এখন অনেক দাম মশায়। সাঁওতাল ডিহির কয়লা পোড়ানো তাপ-বিদ্যুৎ না এলে আপনাদের কলকাতা শহর অন্ধকার হয়ে থাকে। শাল, সেগুন না এলে আসবাব হয় না। ছাতিম, শিমূল না থাকলে দেয়াশলাই কাঠি, প্যাকিং

বাক্স হত না। ইউক্যালিপটাসের কত তেল আর কাগজের মন্ড হয়। কেঁদু পাতার বিড়ি হয়। মহুয়ার মহুল মদ হয়। হরিতকী যত আসে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া থেকে। আর শাল পলাশ গাছে লাক্ষা কীট তৈরি করা হয়। ঝালদায় সব চেয়ে বেশি লাক্ষাকীট জন্মায়। লাক্ষা থেকে গালা হয় — সীল করা হয়। বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ার রেশম কীট পালন হয়, গাছে। ভাল তসর হয় পুরুলিয়ায়। তাঁতের কাপড় আর শাঁখা বিখ্যাত আমাদের বাঁকুড়ার। আমাদের এই রাঢ়ের মালভূমিতে পাওয়া যায় কয়লা, আকরিক লৌহ, চীনামাটি, ফায়ার ক্লে, ফসফেট, সোপ স্টোন, চুনাপাথর, ডলোমাইট। ঝালদা আর হংস পাথর থেকে চুনা পাথর নিয়ে গিয়ে কলকাতার দক্ষিণে বিড়লাপুরে ক্যালসিয়াম গ্যাস তৈরি হয়' — যার থেকে ড্রাই ব্যাটারি তৈরি হয়।

বাঁকুড়ার সাংবাদিক বন্ধুটির কাছে ঘন হয়ে বসে কথা বলতে লাগলেন ঃ

'লাল মাটির দেশের কালো মানুষ ভাই আমরা। কাঁকুরে মাটিতে চাষ আবাদ কঠিন। কংসাবতী আর কুমারী নদী থেকে বাঁধ দিয়ে জলধরা হয়েছে। দামোদরের পাঞ্চেত জলাধার থেকে সেচকাজ হয় উত্তর অঞ্চলে। তারা ফেনী আর সাহাড়জোড় প্রকল্পে পুরুলিয়া মেদিনীপুরের চাষআবাদে সামান্য সাহায্য হয়।

পুরনো খাল আছে বক্রেশ্বর, বাঁকুড়া শাল বাঁধ খাল, মেদিনীপুর খাল।

কৃষি ফসল বলতে ধান, তেলবীজ, আখ, ভুট্টা আর সামান্য গম, আলু।

মানুষের বসতি বাঁকুড়ায় — ২৯৫ জন, পুরুলিয়ায় — ২৫৬ জন প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ তে। দুঃসহ দুঃখ কষ্ট মানুষের। জল নেই, খাবার নেই, কাজ নেই, বৃষ্টিপাত সারা বছরে মাত্র ১৪০ সেঃ মিঃ। গরমের সময়ে ৪৫ সেলসিয়াসে পারদ উঠে যায়, শীতে প্রচন্ড ঠান্ডায় হাড় কনকন করতে করতে অবশ হয়ে গিয়ে বস্ত্রহীন গরিব মানুষেরা কত মারা যায়। আমি ছেলেবেলায় আখ চিবিয়ে ভূট্টা পুড়িয়ে খেয়ে কত দিন অনাহারে কাটিয়েছি।

কুঁড়েঘরের দেয়ালে দেয়ালো যে নানান পার্টির বড়বড় মানুষদের লেখা দেখলাম।

ওঁরা স্মরণীয় ব্যক্তি, ভোটের সময় অবতারের মতন ফিল্‌ডে নামেন। তারপর ভাল পোশাকে ভাল ঘরে ভাল খাবার খেয়ে সুখের শয্যায় রাজধানী দিল্লী বা কলকাতায় থাকেন। এঁদের পুরনো মাথায় আসে না কি করে রূঢ় রাঢ় অঞ্চলের মাটিতে সোনা ফলানো যায়, কি করে এই পাথরের তলা থেকে আরো বহু খনিজ পদার্থ উদ্ধার করা যায়। পাম্পের জল সংগ্রহ করার জন্য এরকম লাইন মেরে বসে থাকা ছাড়া ঐ মূর্খ বেকার মানুষগুলো কি করবে? টিউবওয়েলের দশটা ট্যাপ করে দিলে তো অল্পক্ষণেই জল নিয়ে আবার জড়ো হয়ে হল্লা করতে করতে কাজ চাইবে। তাই কুকুরের ল্যাজ সোজা করতে দিয়েছে। আগে খনি ছিল বাবুদের, এখন সরকারের কিন্তু এই অঞ্চলের

কোটি কোটি টন খনিজ সম্পদ বেচা টাকা যদি এরা সবাই নিজেদের অঞ্চলের ব্যয় করার জন্য ধরতে পারে তেল ব্যবসায়ী আরবদের মতো তাহলে তো সোনার পালঙ্কে এয়ার কন্ডিশনড বাড়িতে বাস করতে পারে।...'

'গ্রানাইন, নিস কালো পাথর আর বেলে পাথর, শেল, কংগ্লোমারেট দামোদর উপত্যকায়— কংসাবতী আর সুবর্ণরেখার মাঝখানটা সবচেয়ে উঁচু জায়গা। অযোধ্যা পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গোর্গাবুরু ৬৭৭ মিঃ উঁচু। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান আর বীরভূমের খানিকটা করে কেটে নিয়ে পুরুলিয়া তৈরি হয়েছে। আসলে এটা বিহারী আবহাওয়া অঞ্চল। পুরুলিয়া, মানবাজার, বড়ভুন, ঝালদা, আদ্রা প্রধান শহর। শহরে ধনীরা থাকে। দক্ষিণ পুর্ব রেলপথ উড়িষ্যার ভেতর থেকে এসেছে মেদিনীপুর, সেখান থেকে বাঁকুড়া। বাঁকুড়া থেকে ইস্টার্ন রেলপথ গেছে পুরুলিয়ার আদ্রাতে, বাঁকুড়া থেকে বর্ধমান জেলার রামনগর পর্যন্ত।'

শিবনাথ আবার ভৌগোলিক কথায় ফিরে যেতে চাইছিল, 'কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, দ্বারকেশ্বর, দামোদর, কুমারী, শিলাবতী, সব নদীই দক্ষিণ পুর্বে নেমে এসে ভাগিরথীতে মিশেছে। সবুজ জলসেচ এলাকা বলতে ভারতে বেশি অংশ পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব। এরাই দুধের মাটা তুলে নিয়েছে।'

রাত্রে বাড়ি ফিরলেও পুরুলিয়া বাঁকুড়রা পাহাড়গুলো মন থেকে সরছে না দেখলাম। দুঃসহ গরমে জ্বলে পুড়ে গেছি। নগ্নপদ কালো কালো মানুষরা ভিড় করে আছে মেলায়, গ্রামে, রাস্তায়। তারা পাথর কাটছে, সিমেন্ট গুঁড়োচ্ছে, লাক্ষাকীট তুলছে, তসর বুনছে। কাঠ চেরাই করছে, রেলবগী ঝাঁটি দিচ্ছে, কাদা বইছে মোষের গাড়িতে, জল বইছে কলসীর ওপরে কলসী সাজিয়ে, তারা পঙ্গপালের মতো হাজার হাজার আসে শহরে কাজের জন্য। আসে ট্রেন ভর্ত্তি হয়ে কলকাতার মিটিংয়ে। পাউরুটি , জিলিপি আর কাশী বিশ্বনাথ জলছত্রের জল পায় — হাতে পায় বোধহয় পাঁচটা টাকা। দশ টাকা পেলে আবার নেতার হাফ সিয়ার। হ্যাঁ, তা নেবে বৈকি, কত মাথা খরচ করে...

কয়লা, চুন, পাথর, আকরিক লৌহ, লাক্ষা, ডলোমাইট, চীনামাটি, ফায়ার ক্লে, ফসফেট সোপ, স্টোন, শাল-সেগুন-শিশু-ইউক্যালিপটাস কাঠ, তসর, রেশম, শাঁখা, পুতুল বেছে বাৎসরিক কত টাকা আয় হয় রাঢ় অঞ্চল থেকে ?

সভ্যতা কি শুধু কলকাতার চারপাশটা ঘিরে যাঁরা পাশ করায় বড় বড় ল্যাজ গুঁজে বসে আছেন, যাঁদের আছে বাড়ি গাড়ি ব্যবসা আর রঙিন পুতুলের মতো মেম সাহেব?

হায় চন্দ্রবর্মার শিলালিপি, কি লিখেছে তাতে হিজিবিজি — পড়া যায় না। শুধু ছাতি ফেটে যায় পিপাসায়।

বর্ধমানের সমস্যা ক্রমেই বর্ধমান

সুন্দরী নূরজাহান শের আফগানের বউ হয়ে প্রথম যৌবনকাল কাটিয়েছিলেন বর্ধমানে। বাদশা জাহাঙ্গীর তাঁকে লুটে নিয়ে গেলেন। আতর, গোলাপ, পানি আরো নানান খোসবু তৈয়ারকারিণী বিধবা নূরজাহান হলেন ভারতসাম্রাজ্ঞী। বর্ধমানের মাটি-জল-হাওয়া তাঁর রূপবতী কোমল শরীরের পেলব স্পর্শ পেয়েছিল।

শিল্প রসিক বর্ধমানের মহারাজা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যে মর্মরমূর্তি কলকাতার যাদুঘরকে উপহার দিয়ে গেছে তাও বিস্ময়কর।

'বর্ধমান' মানে বেড়ে যাওয়া— পশ্চিমদিকে সরু হয়ে ক্রমেই বেড়ে গেছে বলে কি এরকম নাম? সবটা রাঢ়ভূমি বললেও লাটেরাইট অঞ্চল পশ্চিমটা, পূর্বাংশ ক্রমশ ঢালু - লাল মাটি। জলা বিলও আছে কিছু।

বর্ধমান বেড়ে গেছে একটা ব্যাপারে, তা' হল ভারতের সবচেয়ে বড় লোহা আর ইস্পাতের কারখানায় — বনজঙ্গল কেটে জ্বলন্ত হীরের বৈজয়ন্তী মুকুট পড়েছে রাজরাণীর মতন দুর্গাপুর। তাপবিদ্যুৎ কারখানাও আছে। আসমান আলো করে থাকে। হিমালয়ের ছাইভস্ম মাখা দেবতারা বোধহয় কড়া শীতের রাতে আজকাল গা গরম করতে আসেন এখানে। সুদুর উত্তর পশ্চিম কোণে যেখানে সীতারামপুর বরাকর আর রূপনারায়ণপুর সেখানে হয়েছে বিখ্যাত রেল ইঞ্জিন কারখানা। হায় রাণীগঞ্জের কয়লা-গেলা জাহাজ-সমান রেল ইঞ্জিন, তোমাকে অনেক জায়গা থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎচালিত জাপানী 'তোসিবা' ইঞ্জিন এসে পড়াতে। বর্ধমান ধানে-চালে শুধু বেড়ে নেই। শিক্ষাদীক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাও গড়েছে প্রচুর। দুর্গাপুর আর আসানসোল এখন পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় শিল্পাঞ্চল।

তবু বর্ধমান থেকে রোজ কলকাতায় চাকরি করতে আসা রেলগাড়ি-ঠাসা লোকের যাতায়াতের কামাই নেই। বর্ধমান কলকাতা যেন এপাড়া ওপাড়া।

প্রধান অতিথি হয়ে প্রথম বর্ধমানে যাই কুলগড়িয়া হাই মাদ্রাসা স্কুলের নবী দিবসে। বাসে উঠে দেখি মেয়েরাও চলেছে, বালিকারা, মুসলমান মেয়েগুলো চকচকে — অবস্থা ভাল। বাকি সব দেহাতি — সাঁওতাল- মুন্ডা-তপসিলী-গরিবলোক।

একটি মেয়েকে শুধোলাম, 'কি নাম তোমার, কোন ক্লাসে পড়'? সে বলল, 'নাম রিজিয়া খাতুন, ক্লাস ফাইভে পড়ি।'

অন্য একটি মাগুরে রঙের মেয়ে — নাম হামিদা খাতুন সে বলল সেভেনে পড়ে। রিজিয়া বেশ ফরসা। হামিদা বলল, 'ওর দাদু টিপসই দিয়ে হাজার মণ ধান ব্যাচে।' রিজিয়া রেগে গিয়ে বলল, 'আমার ভাইয়া এম বি বি এস ডাক্তার!'

ওরা জানত না আমিই ওদের নবী দিবসের প্রধান অতিথি। আমাকে সেই সভায় যখন দেখল ওদের তো গাল হাঁ!

খাবার ঘরে রিজিয়া তার দাদুকে নিয়ে হাজির। বলব কি মশাই বর্ধমানী প্রোহিন্দু মুসলমান দাদুর অদ্ভুত পোশাকের পারিপাট্য। কালো ঋজু চেহারা বুড়ো। ভোগের চেহারা, কিন্তু ভুঁড়ি নেই। হাতে ছড়ি। মুখে খন্ডতয়ের মতন ঝুলন্ত দাড়ি। আর দীর্ঘ কোঁচা দেওয়া ধুতি ভুঁড়ি পরণে। গায়ে হাফ সার্ট। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে বোঝা যায় মাদ্রাসায় তাঁর দান আছে।

সেলামালোকম জানিয়ে হাতে হাতে মেলার পর তিনি জানালেন, প্রচুর মাছ খেতে হবে পেট ভরে। শুধুই মাছ খাও, ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেকে দু-কেজি করে মাছ এনেছে। (নবী দিবসেও গরু জবাই হয়নি। গরিষ্ঠ সংখ্যক হিন্দু এলাকা নাকি ?)

দাদুর হাতের হাল্‌কা ছড়িটা কি কাঠের হতে পারে আন্দাজ করছিলাম। বললাম 'হেতাল' না 'রডোড্রেনড্রন!' তিনি বললেন, বাঁশের শিকড়ের।'

'আশ্চর্য, বাঁশের শিকড়ের ছড়ি হয়!'

এক মাস্টার মশায় ফোড়ন দিলেন, 'ধানগাছের তক্তা হয় একালে খড়ভূষি জমিয়ে।'

বুড়ো জোতদার (আমীর হামজা?) রেগে গেলেন শিক্ষিত লোকেরা টিটকারি মারছেন ভেবে। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতার জ্ঞান মুহূর্তেই আমাদের ধারাশায়ী করে দিল। বুড়ো গজগজ করে বললেন, 'আল্লার দুনিয়ায় সব জিনিসের হদিস কেউ পায় না। ত্রিপুরার পাহাড়ের গায়ে এক রকমের বাঁশ হয় যার ঠেসমূল এই ছড়িটা। এক শালা চাষীর পিঠে মেরে 'ডাঁড়া' ভেঙ্গে দিচ্ছিলাম মুই, লেভির ভয়ে ধান গছিয়ে ছিলাম, পরে দিনও মিথ্যে, রাত ও মিথ্যে করে দিতে চাইল, তা মোর এই ছড়িটা একটু মচকায় নিও।

বুড়ার ডাক্তার ছেলে এসে করমর্দন করলেন। অবিকল শরৎচন্দ্রে শিবনাথের মতন, কালো মানুষ যে এমন সুন্দর হয় শিবনাথকে না দেখলে যেমন বোঝা যায় না। বাইরে এসে চষা জমি থেকে একটুকরো তুলে নিয়ে দেখলাম খয়রা-খইছড়া মাটি। লালচে কালো। এতেই এত ধান হয়?

বর্ধমানের লোকেরা নাকি সব তরকারিতেই পোস্ত খায়? যত বড় পোনা মাছই হোক তাতে একটু টক দেয়। গরম জায়গা বলে? তামিলরা যেমন 'রসম' দেয় সব তরকারিতে। পোস্ত-চচ্চড়ি কিংবা সুক্তোর বাহাদুরী ছাপোষা বাঙালি হিন্দুদেরই —

মুসলমানরা এটা তেমন জানে না—অথবা লাইক করে না—তাদের খাবার কোর্মা-কাবাব-ভুনা-ভাজি।

বর্ধমানে কালনা হয়ে সাংবাদিক হিসাবে ডিলাক্স বাসে চড়ে আবার এলাম ষষ্ঠ যোজনার শুরুতে এক কৃষি সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী কমল গুহের আমন্ত্রণে। অনেক রকমের আধুনিক যন্ত্রপাতি দেখলাম। বক্তৃতা শুনলাম। কিন্তু মনে একটা নৈরাশ্য। জমি কোথায়? বেশি লোকের তো জমি নেই। তেলা মাথায় তেল ঢালো। রেডিও থেকে কৃষি বিজ্ঞানীরা খুব বকেন, এতবার চাষ দিন, এই এই সার দিন. 'রোয়া করুন'। — কার জমিতে কে চাষ দেবে, সার ঢালবে. রোয়া করবে? 'রোয়া করা' ভাষাটা পশ্চিমবঙ্গে অচল।

কলকাতার বাড়িগুলোর টবে ধানচাষ হয় না?

যাদের জমি নেই শতকরা ৬৫ / ৭০ জন লোক তাদের জন্য এসব উপদেশ বাণী নয়। ভূমি-সমস্যা বর্ধমানেও যেমন, ২৪ পরগণাও-হাওড়া-হুগলী মেদিনীপুরে তেমনি। জমিদারী গেলেও বেনামে বা পরিবারের সবার নামে ৭৫ বিঘে করে জমি রাখলে অনেক রাখা যায় তো? শিল্পপতিদের কত জমি আছে এই প্রদেশে? শিল্পকাজে রাখতে পারেন? আইন আছে আবার আইনের ফাঁকও আছে।

কি কারণে বর্ধমানের রাণীগঞ্জের মাটির নিচে এত কয়লা জমা হল? ভূ-ত্বকের আলোড়নে অগ্নি-পাথর গলে জমে গেল. না খান্ডবদাহের পর বনজঙ্গল পুড়ে মাটিতে চাপা পড়ে থেকে হাজার হাজার বছর পরে কয়লা হয়ে গেল— তার তেলটা কি সুড়ঙ্গ-স্তর বেয়ে আরব দুনিয়ায় চলে গেল? আর যেখানেই মুসলিম দেশ সেখানেই তেল— মুসলমানদের তলায় এত তেল দেয় কেন আল্লা? ভারত টোপকে [illegible] আবার মালোয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় তেল! প্রাকৃতিক উপায়ে যেখান থেকে তেল চুরি গেছে সেই রাণীগঞ্জের কুলী-ধাওড়ারা বোতল, ক্যানাস্তারা নিয়ে রোজই প্রায় তেলের লাইন মারে। এ লাইন যেন অভিশপ্ত ভগবানের ল্যাজ, পকেটে পুরতে পারলে ভারতের মান বাঁচে।

আউসগ্রাম, অন্ডাল, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, সীতারামপুর, চিত্তরঞ্জন, কুলটি, রূপনারায়ণপুর সর্বত্র তরঙ্গায়িত টিলাভূমি—টিলার গায়ে ঝোপঝাড়। শাল পলাশের গায়ে।..

বর্ধমান, কালনা, শক্তিগড়, রায়নগর, দশঘরা, খন্ডকের থানা, পূর্বস্থলী, নেগুন, কাটোয়া, মানকর, অনেকটা সমতল—উঁচু থেকে নেমে এসেছে। আম জাম কাঁঠাল বাবলা গাছ আছে। তার মধ্যে বাড়ি ঘরদোর-পাড়া-মানুষ গরু কুকুর মুরগি ভরা গ্রাম।

গাড়ি চলেছে হু হু করে। ক্ষুধার্ত চোখে তাকিয়ে আছি। মাটের পর মাঠ। গরিব নিম্নবিত্ত লোকেদের পাড়া-খড়ের ছাউনি — মাটির বাড়ি। বিত্তবানদের পাকাবাড়ি

মাঝে মধ্যে।

খড়ের চালে, বেড়ায় বা ভারায় শুকোতে দেওয়া ছেঁড়া ময়লা কাঁথা পথের পাশে— এতেই গ্রাম বা পাড়ার দারিদ্র্য বোঝা যায়। অগ্রহায়ণ পৌষে ধান কাটা হলে কাঁড়ি ওঠে খামারে, 'পাটা' ফেলে ধান ঝাড়া হয় পটাপট শব্দে। আদিবাসীরা কাজ করে ক্ষেতে খামারে। গরুর বাথান চরে বেড়ায় মাঠে। দক্ষিণ পূবের দিকটায় গম হয় বর্ধমানে - আখ আর আলু হয়। বোরো চাষ আরো ব্যাপকভাবে হতে পারে যদি পরিমিত জল পাওয়া যায়। আলুর অনেক হিমঘর আছে মেমারীতে।

কালনার এক চাষী-ভাই বলেছিল, 'বোরো ধান, বড় সৌখিন চাষ। ৪০ টাকা কুইন্টাল দরে ওজনে বোরো বীজতলা বিক্রি হয়। ৪০ পয়সায় এক কেজি আঁটি। আর মাত্র চারটে গাছ পোকা লাগলে দুদিন অবহেলা করলে সর্বনাশ। মেঘলা থাকলে আরো। আর সার বা জল দিতে দেরি হয়েছে তো গেছে। বিঘে ৭০০ টাকা খরচ। ২৫ মণ ধানে ১৪০০ টাকা পাওয়া যায়। অবশ্য নিজের জমি হলে।' গঙ্গা, ময়ূরাক্ষী, দামোদর, কংসাবতী সেচ প্রকল্প হয়ে এখন তবু চাষ আবাদ বেড়েছে। কিন্তু চাষীর ছেলেরা লেখাপড়া শিখে আর কাদামাটি বা কিটোনো ধানের ধূলো মেখে গা চুলকোতে চায় না। বাংলাদেশ থেকে ফারাক্কার তলা দিয়ে যেসব চোরা চালানি মার্কিন বা জাপানী কাপড়ের প্যান্ট শার্ট আসে মুর্শিদাবাদে — কান্দি সালার কাটোয়া হয়ে চলে আসছে বর্ধমানে — সেসব পরে এখন বাবু বনে গেছে হাফচাষী ফুলচাষীর ছেলেরা।

গ্রামের অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলোয় বন্যার পর কয়েক লক্ষ করে টাকা এসেছিল, সিংহভাগটাই নাকি মাননীয় সদস্যরা মেরে দিয়ে লাল হয়ে গেছেন। বি ডি ও আর থানার ওসিরাও তাদের পকেটে।

খন্ডঘোষের রামহরি দারোয়ান বড় রসিক লোক। মাথায় টিকি। কপালে ছিটে ফোঁটা। পরণে খাটো ধুতি, গায়ে উড়ানী। কুমড়ো বিক্রি করতে এসেছে ইস্টিশন শহরে। সে বলে, 'পূর্বপুরুষদের কার করে 'কোষ' খন্ডিত হয়েছিল এখানে, সেই জ্বালায় মরছি এখন আমরা। এদেশে চিনি হয়, চিনি পাই না। কয়লা হয়, কয়লা পাই না। পঞ্চায়েতের টাকা তছরুপ হয়ে গেল স্বজনপোষণে। যে বারো বুড়ি সেই তিন পণ। এক বাপের চার ছেলে চারটে পার্টি করে। বাঙালির স্বভাবের দোষ ঝগড়া করে—তাই নাকি দিল্লি থেকে তেড়ে দিয়েছে এবার ঘর সামলাতে। কার ঘরে কে আগুন দেয় দেখা যাক। কুমড়ো বেচতে এলেও হেঁ হেঁ... আমার বাবার পাকাবাড়ি, আঁটকুড়ো মানুষ, বুড়োবুড়ি নুড়োনুড়ি করে যাবার সময় সব মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের বিস্কুট কারখানায় দান করে যাবে। অবশ্য ৫০ লক্ষ টাকার ডাউনে আছি আমি—ঘেন্নায় যদি এ্যালাউ না করেন অনাথ আশ্রমের 'দয়ার অবতার'দের কাছে ফেলে দিয়ে যাব। আমার পত্নী দুলালী বউ বলে,

একটা টিভি করে দাও, হাত পা তুলে দেখি। গরিবের দেশে টিভিতে বাবুদের মেয়েরা নাচে ভাল।...

স্টেশনের ভেন্ডারে রহমত আলি জমাদার বলে, 'আমার একান্ন বছর বয়সের জীবনে একবারও কোথাও চাকরি পাইনি। রাণীগঞ্জের রাণী পাতালে ঢুকে কয়লা হয়ে গেছে। কয়লা হল ব্ল্যাকডামন্ড। বাবুদের খনি গেছে কিন্তু যারা কয়লার হোল-সেলার এজেন্ট, তাঁদের ঘরে এখন সুখের স্বর্গ। আমেরিকা থেকে মাসে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে তাদের বাড়ির ছেলেরা। কিন্তু যারা সেই কয়লা তোলে খনি থেকে, জানেন তাদের দুঃখ কষ্ট? তাদের মতো কুলীধাওড়া, কোল-ভীল, সাঁওতাল-বীরহোড়দের কথা কই কেউ লেখে? হাঁ, শৈলজানন্দ মুখার্জ্জী লিখেছিলেন। বিচিত্র মহৎ সমাজের দায় নিয়ে যখন লাট মন্ত্রী নেতা হয়েছ— তখন অন্তত গরিবদের দু-বেলা দু-মুঠো খেতে দাও। আমার জমি-জায়গা ঝান্ডা পুঁতে দখল হয়ে গেল, ভাগচাষীরা এখন বড়োলোক—ইঁট আর টালির ঘর বেঁধেছে—আমি ভিক্ষে করি—দেবেন বাবু দুটো টাকা—শুনবেন আমার কবিতা?

'দামোদরে বন্যা আসে
ভাসে মাটির ঘর
তিনশো কোটি টাকা আসে
দিল্লি কি ভাই পর?
সেই টাকাতে দালান কোঠা
বানিয়ে নিল কেউ
বানে ভাসা গরিবরা সব
কাঁদে ভেউ ভেউ
আসছে আবার ভোট
জোরসে পাকাও জোট...'

দুটো টাকা দ্যান বাবু, শরিফ জোতদারের ছেলে ছিলাম, ঘোড়ায় চড়ে বিচারে যেত আমার বাবা, কাপড় চোপড় সাফ করব ইস্ত্রি করব, খাব...

দুঃখ হয় রহমত আলির জন্যে—এ সব চরিত্র দিকহারা হয়ে গেছে। রহমতকে দুটো টাকা দিতে বলেছিল, মূর্খরা চেয়ারে বসলে আমি মারা যাব স্যালুট করব না। তবে বাবু এটা অভিশম্পাত কবিগুরুর : যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে টানিছে যে নীচে / পশ্চাতে টানিছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'...

পানাগড়ে সৈন্যদের ব্যারাক, কত দাড়ি আর পাগড়িওয়ালা সৈন্য যায় রোজ জাতীয় সড়ক ধরে, হেলিকপ্টার নামে। (কলাইকুন্ডার) কামানের গর্জ্জনে ঘুমন্ত বাচ্চা কেঁদে

উঠলে শের আলির বউ গালাগালি করে ঃ কামান মারানির ব্যাটারা কামান মারছে, মোর 'ছাবালে'র কিচ্ছু হলে ছাবাল করিয়ে লিয়ে ছাড়ব।...'

তেলি, মালী, জোলা, গাড়োয়ান, জেলে, নিকিরি, মুচি, কুমোর, তাঁতী, দাড়িওলা মোল্লা, পৈতেধারী বামুন — সবার ঘরে কাঁচা পাকা দেওয়ালে, গাছের গায়ে, পায়খানার পিঠে এখনো পোস্টার ঝুলছে দিল্লির সিংহাসন জয়ের।

পানাগড়ে কারেন্সি নোট ছাপার কারখানাটা হবে তো?

শের আফগানের বুক থেকে রূপবতী নূরজাহানকে কেড়ে নিয়েছিলেন দিল্লি তখ্‌তের সুলতান জাহাঙ্গীর — শের আফগানের কবরে কি এখনো কান্না শোনা যায় বর্ধমানের মাটিতে কান পাতলে?

প্রজাদের গলাকাটা টাকায় বর্ধমানের মহারাজার যে ভিক্টোরিয়া মর্মর মূর্ত্তি গড়া আছে যাদুঘরে, সেটা লন্ডন মিউজিয়ামকে বেচে টাকা এনে পঞ্চায়েতে দিলে কেমন হয়? কিন্তু মিউজিয়াম বোধহয় সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের। তাই বোধহয় দিল্লি জয়ের কথা বারবার বলছেন বন্ধুরা।

বর্ধমান থেকে ফেরার গাড়িতে আবার মুসাফির মীর সোলেমানের সঙ্গে দেখা।

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'রাজীব গান্ধী বোধহয় দ্বিতীয় জওহরলাল নেহেরু হতে চান। চাষী আর গরিবদের জন্য ভালই করবার কথা বলছেন। খেটে মরবে হাঁস আর ডিম খাবে দারোগাবাবু।

মুর্শিদাবাদের উমিচাঁদ ও জগৎশেঠরা এখনো মরেনি

আংটির ভিতর দিয়ে শাড়ির কোণা গলিয়ে টানলে যদি হড়হড় করে বেরিয়ে আসে তবে সেটাই হবে মুর্শিদাবাদের সিল্ক। নইলে বড় বাজারে তিনজনকে তিন গেলাস লস্যি খাওয়ালেও নবাবের দেশের মানুষ চাঁদ মিয়া মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী-বুদ্ধিতে ফাঁসছেন না। তিনশো টাকার মাল শেষ বেলায় দেড়শো টাকায়।

মুর্শিদাবাদের মানুষ আজ আরব, ইরাক, ইরাণ, মিশরে আছেন। আছেন পাকিস্তানে, বাংলাদেশে। তাঁদের দেশের ফরাক্কা বাঁধে প্রতি রাত্রে এখন শতখানেক করে চাঁদ ওঠে দুই সারিতে। বহরমপুর থেকে উত্তরবাংলা স্টেট ট্রান্সপোর্ট বাসে যেতে যেতে ফরাক্কার আলো দেখে তাজ্জব হয়ে ভেবেছি বেহেস্তে নেমে এলাম নাকি!

পলাশীর ন্যাড়া আমগাছ শুকনো জলা পার হয়ে বহরমপুর যাবার পথে চোখে পড়েছে আকন্দ-ঝোপ - মাঝে-মাঝে বাবলা গাছ - আম, জাম, লিচু, শিমূল, পলাশ গাছ - বাঁশের ঝাড়। উত্তরবাংলায় চলে যাওয়া রেল লাইন। বহরমপুরের কয়েদখানা। তারপর আঁকাবাঁকা পথের দুপাশে গরিব আদিবাসীদের কুঁড়েঘর। বড় বড় নিম, মহানিম গাছ। হঠাৎ ভেসে ওঠে ফারক্কার সোজা লাইনে সারিবন্দী চাঁদের মতো গোলাকার ডুম্ লাগানো আলো।

জমির লড়াইয়ের অংশীদারদের দেখবার জন্য সরকারি আমন্ত্রণে বালুরঘাটে যাবার পথে বহরমপুর টুরিস্ট লজে দুপুরের খানাপিনা সেরেছি সাংবাদিকরা। ফেরার পথে মাঝ রাত্রে বহরমপুর-পলাশীর পথে আকন্দ ঝোপের পাশে হঠাৎ হঠাৎ এক একটা আওরত বসে থাকে কেন? দূরপাল্লার লরী বাঁধে তাদের দেখে। এইসব দুঃসাহসী যুবতীরা সমাজকে পদদলিত করে তবে নাকি এখানে মাঝরাত্রে আসতে পেরেছে ভূতপেত্নীর মতন পেটের জ্বালায় কিছু রোজগার করতে।

আম হয় জাহাঙ্গীর, তোতাফুলী, বেগনফুলী, ফজলী, সুর্মা ফজলী, কালাপানি, ধড়বোম্বাই - কিন্তু আমের বাগানগুলো কাদের? দশবারো হাত উঁচু ক্ষেতভরা পাট লরী ভর্তি হয়ে যায় কাদের গো? আখমাড়াই হয় কাদের? তাঁরা নাকি বড় লোক। মস্ত মস্ত দালান কোঠা তাঁদের। আকন্দ ঝোপের পাশে পাঞ্জাবীদের কাছে দেহদান না করলে যাদের ভাত হয় না তাদের ওপরে মৌলবীদের ধর্মীয় শাসনের চোখ রাঙানিতে কি আকাশ কড়কড়ায় আর? তাহলে জমি দাও না। পাহাড়ী ঢলের গায়ে জমি 'নেবেল' করেও চাষআবাদ করে বেচারারা। লালগোলা ঘাট পেরিয়ে রাজসাহী থেকে যে সব

সাহেবী পোশাক আসে তা ছড়িয়ে পড়েছে মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, আজিমগঞ্জ, সালার, কান্দি, নোয়াদ, বহরমপুর, লালবাগ, ভগবানগোলা, জঙ্গীপুর, সুতী, জলঙ্গী, জিয়াগঞ্জ, তেনিয়াতে।

লাল, এঁটেল, পলি, বেলে, দোঁয়াশ, কাদামাটি বাবু-বনে যাওয়া হালে ফ্যাসানের ছেলেরা আর ধান, পাট, আখ, খেসারি, তিসি, তুঁত, রেশমকীট চাষ করতে চায় না। নদীর ছেড়ে-যাওয়া নাবাল 'বাওড়ে' কাদা মেখে কে আর মাছ ধরবে?

চাকরি দাও রেলে। কলকাতার ট্রামে। নয়তো বাসে, কাগজ কলে, জাহাজে অথবা যে কোনো দু-চুলোয়। বাপের সিল্কের তাঁতে অঞ্চল পঞ্চায়েত ৯ হাজার টাকা ঋণ দিলেও ছ হাজার টাকা শোধ দেওয়া হয়নি — হবেও না — পেটে খেয়ে ফেলেছে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। হাতে দড়ি পরবার জোগাড় করে দিয়ে গেছে যারা গরিবদের ভালোই করতে গিয়ে তারা তো উড়ো পাখি, হাওয়া তাদের কখন কোনদিকে ঠেলে নিয়ে যাবে কে জানে— বাবার জমির দলিল তো বন্ধক রইল ব্যাঙ্কে।...

বাঁশলোই, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, ময়ূরাক্ষী, পাগলা নদী পাগলা ঝোরার মতো নেমে এসেছে ভাগীরথীতে। ফরাক্কার বন্দী জল 'পানি' হতে চলে যায় বাংলাদেশে — অজস্র ফেনা পাক খায়-চড়া-হয়ে যাওয়া চরে। এ পারের পদ্মার জেলেরা ইলিশ আনে বাজারে, ওপারের মানুষরা থাকে ওপারে। জেলেরা গান গায় ঃ 'অকুল দরিয়ার পানি ছলাৎ ছলাৎ করে, কার বন্থড়ি গহিন রাতে একলা কাঁইদ্যা মরে...'

মুর্শিদাবাদের ভেলা ভাসানো দেখেছেন? নদী খাল বিল পুকুরে কলার ভেলার সিন্নি বাতাসা পিঠে পায়েস ফুল আলো ভেসে যায় ভরা ভাদরে। শত শত - হাজার হাজার।

গামারা হয়। লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা হয় মহরমের সময়। দুলদুল ছোটে।

ঈদের জমাত হয় গ্রামে গ্রামে।

খুলনা এলো না ভারতে, মুর্শিদাবাদ গেল না পূর্ব পাকিস্তানে। তাহলে উত্তর বাংলার সঙ্গে পশ্চিম বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। একেই তো ছিনে হয়ে গেছে মুর্শিদাবাদ-মালদহের সীমানায়।

এপারে ঢাকা রেডিওর আজান বাজে। গান হয়। উত্তর বাংলায় কলকাতা সেন্টারের আওয়াজ থই পায় না। তাই শিলিগুড়ি ভরসা।

হাজার দুয়ারীর হাজারটা দুয়ারের পাল্লা খুলে এখন বিদায়ী ইতিহাস হা-হা করছে। শত-শত তসবীর এখন কালের অশ্রুজলে সিক্ত। সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরো নাকি মুছে ফেলতে চায় মুসলিম ঐতিহ্যকে।

ফিরোজ মিনারের মাথা আর একটু হলেই আকাশে ঠেকে যেত!

নবাব সিরাজ কবরের মধ্যে এখনো কি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দাবি করছেন? মীরজাফর কি জুতোর মালা পরে এখনো কান ধরে ওঠবোস করছেন ক্লাইভের সামনে?

সিরাজউদ্দৌলার ফোর্ট দেখেছেন কলকাতার এক নম্বর স্ট্র্যান্ড রোডে — যাতে এখন টাকার ঝনঝনানি বাজছে ব্যাঙ্কের। ঘোড়া উঠে যেতে পারে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি দিয়ে।

মুর্শিদাবাদ মুসলমান প্রধান জেলা - আজান শোনা যায় পাঁচওয়াক্ত প্রতিদিন। কিন্তু শাঁখও বাজে এখানে। বহু ওপার বাংলার আগত অতিথিদের স্থায়ী কলোনী হয়ে গেছে। ওঁরাই এখন শিক্ষিত, সংঘবদ্ধ, সুযোগপ্রাপ্ত সুযোগ্য পাত্র-পাত্রী।

পুরনো বদ্বীপ অঞ্চল মুর্শিদাবাদে এখন ৫৫২ জন লোকবসতি প্রতি বর্গকিমিতে।

বনভূমি নেই। বৃষ্টির গড় ১২৫-২০০ সে মিঃ। গরম ঠান্ডা বেশি নয়। শীতকালেও বৃষ্টি হয় কখনো কখনো। দঃ পঃ মৌসুমী বায়ুর তাড়নায় বৃষ্টি হয়।

আবহাওয়া এমন সুন্দর বলেই নবাবরা বসবাসের জায়গা করেছিলেন মুর্শিদাবাদে.

ঘোড়ায় টানা এক্কা চলেছে পথে। কাঁঠাল আম বয় তাতে। গরুর গাড়ি চলে। বাস চলে মানুষ ভর্ত্তি হয়। ওপারের চোরাই চালান হয় না — যায় না এপারের মাল ওপারে?

নবাবের দেশে এত জমি, এত বাগান, এত ছোট ছোট শিল্পী তবু এত গরিব লোকের মেটে কুঁড়েঘর কেন? ছেঁড়া চট কাঁথা ঝোলে কেন দুয়ারে-খামারে? লাখেরাজ সম্পত্তির জালা ভেঙে নাকি খোলা হয়ে গেছে? হীরাঝিলের দু-লক্ষ টাকা যায় কার পকেটে?

তুঁতগাছ তৈরি করে যারা, গুটিপোকা তোলে, সুতো বানায়, কাপড় বোনে, যারা এদেশে কাজ করে তারা ক / খ শ্রেণীর (ফার্স্ট ক্লাস / সেকেন্ড ক্লাস) লোক-জমি-জায়গা আছে তাদের? নিষ্কর ভুঁইকুঁড়ে তাদের - খাজনার রশিদ পর্যন্ত নেই, পুর্বপুরুষদের দলিল ঝরে-গলে নষ্ট হয়ে গেছে কি — ডকুমেন্ট আছে তাদের, খাটবার গতর ছাড়া? তা দেখে কি ব্যাঙ্ক ঋণ দেবে?

কাংলামারী, দমকল, বাগডাঙ্গা অথবা দৌলতবাগ, নবগ্রাম, অনন্তপুর, কোংলা, নিমতিতা, গোকর্ণ, বারওয়ান, সুন্দরপুর, বেলডাঙ্গার মাঠে যেসব হেলো লাঙ্গল চষছে ধান ওঠার পর পাটক্ষেতের, মাথার টোকায় রোদ আড়াল করে তাদের কি ধান জমি আছে এক কাঠাও? তারাতো জোতদার চাষীবাবুদের ফুরণ করা নাগাড়ে জন। তাই রোজ একটু কম। হেলোর ক'জনের লাঙ্গল গরু আছে। নিজের জমি নিজে চষে, মানে, টাকা দিয়ে ক / খ শ্রেণীর লোকেদের জন খাটান। বড়জোর কাজী, খোন্‌কার, মীর্জা, গাজি, মীর পরিবারের বড় কর্তা চাঁদ মিয়া, সুলতান মিয়া ছাতা মাথায় দিয়ে

ক্ষেতের আলে আসেন। মেয়ে পুরুষ সুন্দর সারি বেঁধে ভাদু গান গাইতে গাইতে পাট নিড়োয় কাঠফাটা রোদে।

কোন মুর্খ ধুয়ো তুলেছিল লাঙ্গল যার জমি তার? লাঙ্গল গরু তো জোতদার মহাজনের! ভাগচাষীরা তেভাগা আন্দোলন করল বৃথাই। লেখাপড়া না করে আধাআধি ভাগে বা আগাম টাকায় জমির মালিকরা জমি চষতে দিয়ে ধানকল, লরী, মুদিখানা, করে এম-আর-ডিলার হয়ে বসে আছে। তারাই নাকি সমাজের হেঁতো জোঁক। পায়ে বেড় দিয়ে ধরে আছে, রক্ত শোষণ করছে, ছাড়ানো যায় না। পাঠান আমল, মোগল আমল, ইংরেজ আমল, গণতন্ত্রী আমল মহাকালের দীর্ঘশ্বাস ফেলে গড়াতে চলে। এর কি শেষ নেই? ছেদ নেই? এরা 'ক' শ্রেণীর লোক। এদের বাচ্চারা বাবুদের বাগানের একটা আম পাড়লে চড় খায়। পেটের দায়ে একটা কাঁঠাল চুরি করলে বহরমপুর জেলে আসতে হয় ফাঁড়ি বা থানায় হরদম ধোলাই খাবার পর।

সালারের মাঠে কারা ঝরে-পড়া ধান কুড়োয়, গোবর কুড়োয়?

সেচখাল, গভীর অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে কোন শ্রেণীর লোকদের পাট্ আখ্ বোরো ধান ক্ষেতে জল যোগান দেবার জন্যে?

হঠাৎ সিরাজের নাটকীয় কণ্ঠস্বর শোনা যায় ঃ বাংলাদেশকে ভালবেসেছিলাম আমি, নবাব ছিলাম বলে কি একটা মুর্তি গড়ে দিতে এতই বাধল তোমাদের গণতন্ত্রে? তাহলে শতকরা ষাটজন গরিব মূর্খ অর্ধাহারে দুর্দশায় মরছে কেন? তারাই তো ক্ষেত খামারে খাটে। তাহলে এখনো কি উমিচাঁদ, জগৎশেঠরা মরে নি মুর্শিদাবাদে?

তবু বলব মুর্শিদাবাদ সোনার দেশ—সোনা ফলানো যায় এখানে।'

পশ্চিম দিনাজপুরের মানুষের কাছে কলকাতা বহু দূর

গৌড়-পাণ্ডুয়ার ধূসর-রুক্ষ্ম ফসল শূন্য মাঠ ময়দান পেরিয়ে হঠাৎ গাড়িরে কাঁচের ভেতর দিয়ে প্রাণ-ভেজানো চোখ-জুড়ানো সবুজ সজীবতা ভেসে উঠল — পশ্চিম দিনাজপুর। বেগুনগাছ, গাছভরা পেঁপে। নটেশাক। আম, জাম, কাঁঠাল, বাঁশ, বকুল, তাল, নারকোল গাছের ভিড়। যেন ২৪ পরগণা। সমতল মাটি।

কলকাতা থেকে রায়গঞ্জ সাড়ে বিয়াল্লিশ টাকার টিকিট, আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে নর্থ বেঙ্গল স্টেট বাসের কন্ডাক্টরবাবু এককথায় বাতিল করে দিয়ে বলেছিলেন, আপনার তো টিকিট লাগত না। ভি, আই, পি মানুষ! — রিফান্ড হবে কিনা শুধোতে তিনি শ্যেনের চাল দুর্বাবাড়িতে ফেলে দেবার মতন মাথা নাড়লেন। তাঁর চোখে আমার বোকামি ধরা পড়েছে। তবু বাঙালিদের মধ্যে হৃদ্যতা হতে কতক্ষণ। অনেক গল্প। হঠাৎ আমি মালদহে নেমেই উধাও।...

পরদিন সকালে শিলিগুড়ি বাস ধরলাম। আর টিকিট নয় বাছা! আমি যে যাচ্ছি সেটাই তো উত্তরবঙ্গ সরকারি পরিবহন সংস্থার ভাগ্য!

রায়গঞ্জ শহর, বাসের জটলা, মানুষের ভিড়, অনেক বাতিল সরকারি বাস পড়ে আছে। ডালখোলায় আবার খানিকটা গাড়ি থামল। উত্তরদিকের আকাশের তলায় কি পাহাড়ের রেঞ্জ ওটা? পাহাড় নয় — পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিন্দুদেশ পর্বতময় নেপালের কোনো মেঘগম্ভীর উত্তুঙ্গ শিখর রেখা নাকি ওটা।

তারপর এপারে বিহারের কিষাণগঞ্জ, রেললাইন—ওপারে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা —পশ্চিম দিনাজপুরের কেটে কুরে নেওয়া অংশ। বিহারের সীমান্তে ছেলেরা বড় বদমাস। ফাগুয়ার দিনে রঙিন-জল-বেলুন ছুড়ন্ত হয়ে এসে একটা সুন্দরীর গালের উপর ফাটল। এ হে হে—লালে লালে লালাক্কার।...

ট্রেন চলে যেতে তবে আটকে পড়া বাস ছাড়ল। কাঁচের সার্সি নামল। দিনাজপুর শহর পূর্ব পাকিস্তানের বাসরশয্যা হতে রাজধানীর গদি পাততে হয়েছে এখন ইসলামপুরে। গরুখেকোরা নির্মম ছোরা চালিয়ে চাচার ঠ্যাংয়ের বাগ্‌লা কাটার মতন এমন সোনার জেলাটার তিনভাগ 'রমপো' টেংরি ছাড়িয়ে নিয়েছে।

দেড় টাকায় পেট-ফুরোন যখন মুসলিম হোটেল হলেও জাত-না-মানা ক্ষুধার্ত বাঙালি বাসকর্মীরা যেন হামলে পড়ে। তার সঙ্গে আমিও? কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। বিদেশ বিভূঁইয়ে কি অপমান দেখুন! হোটেল মালিক সিরাজ সাহেব কিছুতেই পয়সা নেবে

না। উল্টে এটা সেটা খাওয়ায়। অমন জানলে আগে চর্ম থলিটির মধ্যে তাড়াতাড়ি ডাল-ভাত ঠেসে ফেলতুম না। উত্তরবঙ্গে নাকি 'ইলিশমারির চর' যাত্রার খুব নাম হয়েছে।... দাম দিয়ে দিলাম। জলপাইগুড়ি থেকে ফেরার পথে আবার যখন খাব, কথা দিলাম, দাম দেবো না—অবশ্য পেট ভাল থাকলে।..

বাগডোগরায় অর্ধ চক্রাকার র‍্যাডার ঘুরতে দেখলাম।

উত্তর-পশ্চিমে ফাঁসি দেওয়া, নকশাল বাড়ির পথ। তার ওদিকে নেপাল।

চা -বাগান দেখলাম। সমান করে মাথা ছাঁটা এক বুক গাছ তিন-চার হাত ছাড়া ছাড়া। হাতের মতন মোটা গাছ। গাছের গায়ে সাদা সাদা ওষুধ লাগানো। ঢেউ খেলানো পাহাড়ী জমি। চা-বাগানের মধ্যেই মাঝে মধ্যে দূরে দূরে সরু সরু শালগাছ। যা পরে কেটে ফেলে পথের ধারে পাইলিং করার জন্য বিক্রি করা হবে। একই সঙ্গে দ্বি-ফসলী চাষের মতন। একটাই তো জীবন. ডবল করে মওকা মেরে নাও। চা-গাছ কি রকম? বেড়ার পাশে আস্ত আছে যেগুলো, ছাঁটা হয়নি, দেখেছি, ঠিক কচি বা আধলা জাম গাছের মতন। কিন্তু মাথায় 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি কই'?

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একা বেচারা মাঠের মাঝখানে পড়ে থাকতে দেখে মায়া হল। রাজা রামমোহনপুর জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে? রামমোহন আরবী ফারসী জানতেন ভালই— মুর্শিদাবাদ থেকে গোটা উত্তরবঙ্গে এখনো মুসলমানরাই শাঁসাল আর শিক্ষিত ব্যক্তি —যদিও নিজেদের আখের পরকাল গুছিয়ে নেবার জন্যে মাল-সম্পত্তি বিল্ডিং-বালাখানা বেচে বা লিজ দিয়ে সুখের মুলুক 'বাংলাদেশে' পালিয়েছে অনেকে — তবু যাঁরা রইলেন রামমোহন নামটা তাঁদের ধাতে সয়েছে তো? কেননা রামমোহন বলেছিলেন, 'কোরাণ বিধর্মীদের জন্যে কঠোর।' রংপুরের মৌলবাদীরা তাতে চটে গিয়ে তাঁকে মারবেন জানাতে, রাজা মশায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তারা কি খায়'?

অর্থাৎ রামমোহন রায় একাই একশো—কোমরে তলোয়ার ঝোলানো থাকত (হাঁ হাঁ—লাইসেন্স ছিল!) — এক পট্‌কানেই তিন-চারটে মৌলবীকে আজন্ম খোঁড়া - ন্যাংড়া করে দেবার হিম্মত ছিল নাকি তাঁর। ২৪ ঘণ্টায় তিনি দশ সের দুধ খেতেন।

'তুহ্‌ফাতুল্ মুওহেদিন' ফারসী গ্রন্থ লিখলেও রামমোহন যে ইসলামের দীক্ষা নেননি এটাও ঠিক — তবে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন— অতএব থাক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রাজা রামমোহনপুরে।

শিলিগুড়িতে এসেছি ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক বেয়ে ফরাক্কা ব্যারেজ ধরে মালদহ পশ্চিম দিনাজপুর হয়ে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে নাকি এখান থেকেই তুষারমৌলী বাবা হিমালয়ের ঊর্ধ্বপ্রদেশ নজরে আসেন—তাঁর তলায় গরমের সময় প্রাণ বাঁচানো আরাম-আয়াসের জায়গা দার্জিলিং, বড় লোকেরা আসেন পালে পালে— ফড়াৎ করে

বান্ডিল থেকে একশো টাকার নোটকে ছেঁড়েন যাঁরা এক টাকার মতন— ঝুক-ঝুক —টুস—ঝুক ঝুক —টুস শব্দ করে ছোট ট্রেন ওঠে পর্বতের গা বেড় করে—চারিদিকে নেপালী—সে এখন একশো উনিশ কিঃ মিঃ দূরে। তবে দার্জিলিং জেলার সদরমুখ এই শিলিগুড়ি। ভদ্দর লোক আর কুলি-ধাওড়া ভর্তি হিলি শহর।

মহানন্দা মহানন্দে ঘুরপাক খেতে খেতে মালদহ থেকে এসেছে শিলিগুড়িতে। বিরাট সাপের মতো কালো কালো রবারের নল পড়ে আছে মাঠে—আনারাস বাগানে পানি দেওয়া হচ্ছে মহানন্দা থেকে আনারসের চওড়া মোটা ভাঁটি আছে। দু-পাশের ভাঁটি থেকে ঝুলে ঝুলে আনারস হয় নালার মধ্যে। ওখানে পাইকিরি আট আনা দাম—যেটা কলকাতায় এসে আমাশা রোগীদের পেটের পীড়া দূর করার জন্যে কিনতে বাধ্য করে তিন-চার টাকায়। তা হোক, কালো আনারসের স্বাদ যা (টাকুস টাকুস?) বোধহয় স্বর্গেও এটা গ্রহণযোগ্য হবে রাজা মহারাজাদের জন্য। (দুর্ভাগ্য, ইন্দ্র চিরকালই স্বর্গের রাজা থাকবেন, সেখানে আর গণতন্ত্র হবে না, কমিউনিস্ট বন্ধুরা যদি কোনোক্রমে ওখানে যেতে পারেন তবে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।)

পাটচাষের মাটি তৈরি করছে চাষীরা। আঁচড়া টেনে টেনে। তাতেই লাঙল দেওয়ার কাজ হয়ে যাচ্ছে এমন মোলায়েম মাটি।

পশ্চিম দিনাজপুরের পথে ঝোবড়া-বস্তি, হাটের পাশ দিয়ে বাঁক কাঁধে বড় বড় গোলাকার খালুই ভরা মাছ নিয়ে যাচ্ছে ওরাওঁ, গারো, রাভা, মেচ, তফসিলী উপজাতির লোকেরা। গাছপালা ভরা জায়গাগুলোর ভেতরে মানুষের ঘরদোর। পথের মোড়ে দোকানপাট। কলকাতার রেডিও টিভি এখানে থই পায় না, খবরের কাগজ আসে একদিন পরে।

তাহোক, জমি আছে, ধান আছে মানুষের ঘরে।

রায়গঞ্জে ফেরার পথে এক হোটেলে রাতে ছিলাম। পরের দিনটাও। লোহাচুরভরা জল। গ্লাসে দাগ ধরে। সারা সকাল দুপুর পদচারণা করে রায়গঞ্জের শহরটা ঘুরেছিলাম। হাফ্‌গেরস্থ পল্লীর মধ্যে ধেনোমদ আর তিন-চার টাকায় উপজাতীয় অভাবী কিশোরী দেহ বিক্রি হয় দেখলাম।

বিকেলে সিদ্ধার্থবাবুর বক্তৃতা শুনতে ছুটেছে লোকজন—বসন্তের ঝড়ে গড়ানো ঝরাপাতার মতন। মাঠভরা লোক। গাড়ি-ঘোড়া-দোকানপাট। জয়নাল আবেদিন সাহেবের পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেইমাঠে। ঝড়ে হেলে-পড়া গাছের মতন বক্তৃতা করছিলেন সেদিনের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী।

মানুষের ক্ষোভ-দুঃখ। ... গোটা জেলায় অরণ্য নেই। পলিমাটিতে আউস আমন বোরো ধান হয়। আলু, পটল, বেগুন, কপি, পালং, আখ, পাট, তামাক, মেস্তা আর

কচু হয়। পশুপালনের জন্যও বিখ্যাত। গরু, ঘোড়া, মোষ, ছাগল চরায় কত লোক। হাটে হাটে গরু, ছাগলের ভিড়। পশুর সমুদ্র (তবে কি পশ্চিম দিনাজপুরের মানুষরা পশুপালক হয়েই থাকবে?) তুঁত গাছের চাষও হয় এখানে। বৃহৎ কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি। ক্ষুদ্র শিল্প আছে কিছু কিছু। পুনর্ভবা আর আত্রেয়ী নদী চলে গেছে। হাসপাতাল হয়েছে রায়গঞ্জে।

তবু মানুষের অনেক ক্ষোভ দুঃখ হতাশা—কলকাতা কত দূরে—উত্তরবঙ্গের মানুষ বঞ্চিত — মফস্বলী — অথচ 'সূর্য' ওঠে এইদিক থেকেই—হিমালয়ে বাধা পাওয়া মেঘ বৃষ্টি ঝরায় এখানে— সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তরে বলে তাপমাত্রাও কিছু কম— আরামদায়ক আবহাওয়া— কিন্তু প্রতিভাধররা কলকাতায় গিয়ে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলে তো তবেই মন্ত্রী-মহাজন হতে পারবেন।

পশ্চিম দিনাজপুরের গরিবদের সাধ্য কি সেই স্বর্গে হাত পায়। ফ্রন্ট সরকারের আমন্ত্রণে বালুরঘাট সার্কিট হাউসে খানা খেয়ে আবদুল্লাহ্ রসুলের সঙ্গে জমি চাষ আবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। বালুরঘাটে শ্বেতপাথরে উৎকীর্ণ নামের তালিকা দেখেছি। গরিব চাষীদের জমি দখলের রক্তাক্ত ইতিহাস।

পশ্চিম দিনাজপুরের কামার, কুমোর, জেলে, ছুতোর, মেথর, মালী, তেলি, তাঁতী, চাষী, শ্রমিক সবাই এখন 'মানুষ' হতে চায়—সেটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার—কিন্তু তার প্রয়োজন কই স্বাধীনতার এই আটত্রিশ বছরে?

সবুজ-সজীব মাটি আর প্রকৃতিই এখনো তাদের নির্বোধ আশার ঠাঁই—এখানেই তারা জন্মেছে আর এখানেই নীরবে কবরের অন্ধকারে গিয়ে ঢুকবে অথবা তাদের পিঠের নিচে চিতা জ্বলে উঠবে।

ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় জলপাইগুড়ি

শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি দু-টাকা ক-পয়সা সরকারি বাসভাড়া। হিলি শহর। বাগান গাছপালা। পাকাবড়ি। এক বাড়ির সদরে খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে জানলাম সেটা এম এল এ সেনের বাড়ি। সেনমশায় নাকি চটে আছেন জেলেদের দামকড়ির আন্দোলনঅলা আমার উপন্যাসের যাত্রারূপ দেখে। বাড়ির বুদ্ধিপাকা মেয়েরা সিটির ভেতরে গিয়ে হোটেলো উঠতে বললেন।

'নিরালা' হোটেলে খাবার-দাবারের দাম বেশ চড়া। চা-বাগান মালিকেরা অঢেল টাকা ঢেলে থাকেন এখানে হিলি শহরে। সামনের রাস্তার ওপারে সাদাবাড়ি থেকে সাদা বনেদী চেহারার এক বৃদ্ধ মাঝে মাঝে চকচকে মোটর ঢোকা বাঙালি সাহেব-মেমদের অভ্যর্থনা করছেন আর বিদায় দিচ্ছেন।

কদমতলার এক বাড়িতে মায়া রায়ের খোঁজ নিতে গিয়ে আবার যাঁদের দেখলাম তাঁরা মানুদার ভাই আর তাঁর স্ত্রী। তাঁরা জানালেন, আনোয়ার বসে আছে আবুল সাহেবের বাড়িতে। পকেটে চিঠি। মিসেস রায় একটু বাইরে বেরিয়েছেন। মাসির বাড়ির সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসবেন ঘণ্টাখানেক। অতএব ততক্ষণ আবুল সাহেবের বাড়ির খোঁজ করা যাক।

কদমতলার মোড়ের লোকেরা যে বাড়ি দেখিয়ে দিল সেখানে যেতে একটি খুকি ছোট আপাকে ডেকে আনল। বছর ২৫-এর নাতিদীর্ঘ সুন্দরী যুবতী। কলকাতা থেকে এসেছি জানিয়ে বললাম, 'আপনার মার্জিত ভাষা আর শ্রী দেখে মনে হয় ভাল লেখাপড়া জানেন'।

'আমি উত্তরবঙ্গ ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলা এম. এ পাশ করেছি। আপনার নামটা যদি একটু বলেন।'

বললাম।

রিজিয়া তো অবাক। ছুটে গেল ভেতরে। আনল এক বালিকাকে। 'এ কোন ক্লাসে পড়ে?' রিজিয়া বলল, 'এর নাম শিরিন। এ ইংলিশ এম এ, বি টি দিয়ে মাস্টারি করছে। বসুন আপনি কি। আমাদের কী ভাগ্য!'

একটা ঘরের তক্তাপোষের ওপর পা তুলে বসা গেল। ভাইয়া এলেন এবার। তরুণ ছেলে কিন্তু অকালে চুল পেকে গেছে। বললেন, 'অধম আকরাম হোসেন। প্রফেসারি ছেড়ে স্বাধীন ব্যবসা করব বলে ল পড়ছি।'

'আপনারা তিন ভাই বোন এম এ পাশ—এমনটা তো আমাদের ওদিকের মুসলমানদের মধ্যে দেখিনি। এদিকে এত এম এ পাশ মুসলিম মেয়ে পাওয়া যায় জানলে আগে বিয়ে করতাম না।'

দুইবোন খিলখিল করে হাসল। অবশ্য লজ্জায়—দুজনে পিছন ফিরে একদিকে হয়ে।

এক ডিশ রসগোল্লা এসে গেল। হঠাৎ লোডশেডিং। মোম জ্বালতেই আবার বিজলী এসে গেল। জলঢাকা প্রকল্পের এইরকম নাকি রসিকতাবোধ।

আকরাম আমাকে রিক্সায় তুলে নিয়ে আমার হোটেলের সামনের বাড়িটাতে সেই সুপক্ক আমটির কাছে আনলেন। যাঁকে দেখালেন তিনি আনোয়ার সাহেব—কংগ্রেসের ট্রেজারার তখন—জয়নাল আবেদিনের ভাই আনোয়ারুল আবেদিন নন।

বৃদ্ধের নাম আবুল হাসানাৎ। আনোয়ার সাহেব সার্কিট হাউসে যাবার আমন্ত্রণ দিয়ে চলে যেতে বৃদ্ধ আমাদের নাবালক ভেবে বলতে লাগলেন, 'মানুকে তো আমি মালদা থেকে জিতিয়েছিলাম। তাকে আমিই মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছিলাম। বলুন তো এটা কার ছবি?

'ফজজুল হক আর রবীন্দ্রনাথ।'

'এই হক সাহেবই মুসলমানদের মানুষ করার চেষ্টা করেছিলেন।'

বৃদ্ধকে রাগাবার জন্যে বললাম, 'কিন্তু নজরুলের পায়ের জুতোর সুক্তলা ক্ষয়ে গিয়েছিল, ফজজুল হক একটা সাহিত্যিক পেনসনের ব্যবস্থার কথা দিয়েও করেননি—একথা কবির চিঠিতে পাওয়া যায়।'

'হি ওয়াজ এ লায়ার!' কত টাকা তাঁকে দিয়েছেন হক সাহেব, আর সি আর দাশ।'...

একটা লোমশূন্য বিরাট আকারের মাদী কুকুর এসে আমার হোটেলের দোতলার দোরগোড়ায় শুয়ে থাকে। প্রথমে ঘৃণা আর ভয় হয়। কিন্তু নিরীহ। হোটেলে পাঁচজনের কাছে খায়। রাগী হলে কি চলে? কিন্তু লোম উঠে গেছে কেন? যাকে বলে 'ঘিয়ে ভাজা' কুকুর। পেটে কি অসংখ্য ক্রিমি হয়েছে? চোঁক চাঁক করে শব্দ হচ্ছে। গ্রামের কুকুর হলে ঘাস খেত।...

সন্ধ্যার পর কদমতলার লাইব্রেরীতে নিয়ে আসলেন আকরাম হোসেন। অনেক লোক জুটলেন। তাঁদের লাইব্রেরীর কালেকশন দেখালেন। দেখালেন অধমের কীর্তিলিপিগুলিও। বন্ধু অজিতেশ ব্যানার্জি এসেছিলেন ক-দিন আগে নাটক করতে। দূরের কলকাতা শহর বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করে। কাগজ আসে পরেরদিন। অথচ বইপত্র বিক্রি হয় উত্তরবঙ্গেই বেশি।

বিট্রানিয়া বিস্কিটের সেই করজোড়ে নমস্কার করা বিজ্ঞাপনকারিণীটির হঠাৎ সম্মুখে

উদয়; একটু আবির-পরাগ দেবো হাতে!' কি মিষ্টি হাসি। পুতুলের মতো মেয়ে।

ফাগুয়ার দিন। মেয়েটির নামও পুতুল। বলল, 'আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করি —না সাহিত্যে নয়—অর্থনীতি। বাবা আপনার 'ভীষণ' ফ্যান। যাবেন আমাদের পর্ণকুটিরে?— কাল থাকবেন তো?'

আকরাম মনে করিয়ে দিলেন, 'যাবেন কি করে? দোল আছে তো?'

পুতুল বলল, ঠিক আছে। সকালে নিমন্ত্রণ করতে যাব।'

অজানা অচেনা জায়গায় চট করে ঘুম আসে না। রাত্রে জেগে জেগে গাছ থেকে শিশির ঝরার টুপটাপ শব্দ শুনছিলাম। ঝাউ, গাব, শিশু, ইউক্যালিপটাস, মেহগনি, খিরিশ, পাইন,বট, নিম, আম, জাম আরও কত রকমের বিদেশি গাছ এখানে। কুকুরটা ঘড়ঘড় শব্দ করছে। কেন হতভাগার বক্না হামলাচ্ছে সারারাত— পাল ধরতে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

সকালে স্নান সেরে জামা-কাপড় পরেছি সবে—নিচের কলিং বেল বেজে উঠল। দুজন মহিলা এসেছে একসঙ্গে। দুজনের হাতেই রজনীগন্ধার গোছা। রিজিয়া আর পুতুল। পুতুল নিজেই মোটর চালিয়ে এসেছে। পান্নার মতন সবুজ চকচকে মোটর।

ওদের চা খাওয়ালাম। দুজনে খুব আলাপ আছে। পুতুল নেমতন্ন করতে এসে একেবারে পাক্ড়াও করে নিয়ে গেল। রিজিয়াকে কদমতলায় 'উলিয়ে' দিল। তার চোখে রাগ —অভিমান।

এই পর্ণকুটির? শ্বেতপাথরের বাড়ি। সামনের বাগানে নারীদেহের সৌন্দর্য দেখানো নগ্ন মর্মরমূর্ত্তি। গেটে বন্দুকধারী দারোয়ান।

পুতুলের বাবা বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। ঠিক যেন বাদশা আওরঙ্গজেব।

অঢেল খানাপিনা। দিলখোলা গল্প। পুতুলের আসল নাম নাদিরা বেগম। আর একটা ভাই আছে— মাকে জড়িয়ে জড়িয়ে চলে। বৃদ্ধ ইমতিয়াজ হোসেন তাঁর সখের বাগান দেখালেন। কত দেশি-বিদেশি গাছ। এতদিনে চিনলাম কোনটা আসল মেহগনি। মহানিমকেই সাধারণ লোক মেহগনি বলে। কলকাতায় বেগুনী ফুলে ছেয়ে যায় কৃষ্ণচূড়ার পরে — ওটা জারুল। চন্দন, কর্পূর, দারুচিনি, লবঙ্গ গাছ দেখলাম।

'আমার তিনটে চা বাগান আছে। জলপাইগুড়িতে একটা— ডুয়ার্স এলাকায় একটা, ধূপগুড়িতে একটা। কুচবিহারে তামাক ক্ষেত আছে। আত্মীয়-স্বজন সবাই বাংলাদেশে চলে গেল — এখানেও এখন লেবারার ট্রাবলস...'

গোটা মুরগির রোস্ট, গোটা রুইমাছ ভাজা, মোহনভোগ, কাশ্মীরি ফলার ইত্যাদি খাওয়ার সময় মুসলিম সংস্কৃতি নিয়ে পুতুলের বাবার সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন, 'বাঙালি মুসলমানরা এখন অনেকেই ব্যকডেটেড হয়ে গেছে। পুরনো গর্তের ইঁদুর

হয়ে লাভ কী?'

শহর জুড়ে রঙের হুল্লোড় চলছে। চা-বাগান কুলীরা জগঝম্প বাজিয়ে ফাগ উড়িয়ে যেন মরণ-বাঁচন নাচছে। রাস্তা ভেসে যাচ্ছে রঙে আর জলে।

পরদিন আকরাম হোসেন খুব সকালে এসে রিক্‌সায় তুলে বললেন, 'চলুন, জলপাইগুড়ি শহরটা আপনাকে দেখাই। যাবেন তো বিকালে।'

সুন্দর বাঁশের ছ্যাঁচার টিন ছাওয়া বাড়ি। তলার বনেদটা একবুক পাকা করা। ওসব বাড়িতে নাকি নানান দেশের নায়িকারা থাকেন। খুব উঁচু নজরানা।...

পাথরের নুড়ি-শিলা বেঁধে তিস্তার তীরে পার্ক করা হয়েছে। বড়লোকের ছেলেমেয়েরা নাকি প্রেম করার জায়গা পায় না তাই শহর কর্তৃপক্ষ এই পার্ক করে দিয়েছেন।

'ছাত্র আপনি, এত খরচ করে খাওয়াচ্ছেন, গাড়িভাড়া দিচ্ছেন?'

আকরাম হোসেন বললেন, 'নানীর আনারস বাগান আছে।'

'কত আনারস হয়?'

'বছরে লাখ টাকার। তিন ভাই বোনকে তো তিনিই মানুষ করেছেন। আমরা মামারবাড়ি থাকি। মামার নাম আবুল হোসেন। গত বছর তিস্তার বন্যায় গোটা শহর ডুবে গেল। আমরা ছাদে বসে রাত কাটিয়েছি। আমি আপাতত 'জনতা' পাটি করছি।...

এক চা-বাগান শ্রমিকদের নেতার বাড়ি নিয়ে গেলেন আকরাম। নেতার কাছে অনেক চা-বাগান সমস্যার কথা শুনলাম। মালিকরা নাকি আধুনিক যন্ত্রপাতি এনে অনেক কর্মী ছাঁটাই করে ফেলছেন।... একবার দীর্ঘ ধর্মঘটের পর গুলিগালা চলল। নেতার মা গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি এসে নমস্কার জানালেন। নেতা বললেন, 'জানেন, বিদেশে এক পাউন্ড পিকো চায়ের দাম কত? দেড়শো টাকা।'

জলপাইগুড়িতে ২৮০ জন লোকের বসবাস মাত্র এক কিমি জায়গায়। কুচবিহারে অবশ্য ৪১৮ জন। জলপাইগুড়ি পুবে আসাম। দক্ষিণে কুচবিহার বাংলাদেশ। উত্তরে ভূটান, দার্জিলিং। তিস্তা, ধবলা, সাতঙ্গা, জলঢাকা নদীগুলো বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে যমুনা নদীতে মিশেছে।

শাল, সেগুন, শিমূল, বাঁশ, বেত, শিরীষ গাছও আছে প্রচুর।

জলদাপাড়ায় সংরক্ষিত অরণ্য আছে।

ধান, পাট, চা, আনারস, আখ, আলু, সব্‌জি, কলাই, সরষে হয়। ঢেউ খেলানো মাটি।

শুকনো তিস্তার চরে বাংলাদেশের মানুষরা এসে প্যাকাটির ঘর বেঁধে তরমুজ চাষ করে বেচাকেনা করে ক'মাস গ্রীষ্মকালে, বলেছিলেন আকরাম হোসেন।

জলপাইগুড়ি জেলার রাজাভাতখাওয়া, আলিপুরদুয়ার, ময়নাগুড়ি. ধূপগুড়ি,

মাদারীহাট, ফালাকাটা, রামসাই, লাটাগুড়ি, কালচিনি, হলদিবাড়ি, জয়ন্ত, রাজগঞ্জ ইত্যাদি জায়গায় তামাকাশ্রিত শিল্প, তাঁত শিল্প, বর্ষাতি কাপড়, টুপি, কর্ক, কাঠ আর বেতের শিল্প গড়ে উঠেছে।

ফরাক্কা ব্যারেজ জাতীয় সড়ক দক্ষিণ বাংলার সঙ্গে উত্তর বাংলার যোগসূত্র ধরে আছে।

গারো, মেচ, রভা, ওরাওঁ — তফসিলী উপজাতীয় বহুলোক খেত-খামার, চা-বাগানে কাজ করে।

বনেদী মুসলমানদের আধিপত্য আগে খুবই ছিল—এখনও আছে—তবে ও-বাংলার মানুষরাও সর্বত্র বসে গেছেন। দুর্গা পূজো হয় রমরমা করে। মসজিদ থেকে সুরেলা আজানের ধ্বনি পৌঁছয় আল্লার 'আরশ' পর্যন্ত।

ফিরে আসছি। কিষাণগঞ্জের আমবাগানে ধূলো উড়ছে। ঘুমিয়ে পড়ছি। ঘুম ভাঙলে মনে পড়ছে আকরামের পাকা চুল, রিজিয়ার ডাগর চোখ, চাঁদের আলোয় ভাসা বালি চকচকে তিস্তার তীরে পুতুলের গোলাপ—কোমল সান্নিধ্য, সারারাত- ডাকা গরু—আর রাতের শিশির ঝরা নৈশব্দ...

ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় জলপাইগুড়িতে বারে বারে আসতে ইচ্ছে হয়।

কোচবিহারে চা আর তামাক চাষেও দাদন লেগেছে

ট্রেনে শিলিগুড়ি থেকে মাল, মাদারীহাট, রাজভাতখাওয়া, আলিপুরদুয়ার হয়ে তবে কোচবিহার — অবশ্য মাল থেকে মাথাভাঙায় আসা যায়। কোচবিহারের মহারাজার এককালে খুব নাম ডাক প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা নদী কোচবিহারের ভেতর বাংলাদেশের যমুনা নদীতে মিশেছে। বাংলাদেশের উত্তর মাথায় বসে আছে কোচবিহার জেলাটি। উত্তর দক্ষিণে মাইল তিরিশ আর পূর্বপশ্চিমে মাইল পঁয়তাল্লিশ। জলপাইগুড়ি, আসাম আর রঙপুরের মাঝখানে।

জলঢাকা প্রকল্পের দৌলতে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এসেছে কোচবিহারে। জলপাইগুড়িতে যেখানে মানুষের বাস মাত্র ২৮০ জন এক কিঃমিঃ তে, সেখানে কোচবিহারে ৪১৮ জন। ক্রমেই মানুষের বসবাস বেড়ে যাচ্ছে। ঘন গাছপালা বাগান বাগিচা—বাসে যেতে যেতে চোখ জুড়িয়ে যায় তামাক ক্ষেতের সবুজ সতেজ দৃশ্য দেখে।

বাড়ির দলিজে দলিজে রঙিন গালিচা বোনা হচ্ছে। পর্দা তৈরি হচ্ছে হাতের তাঁতে। কোচবিহারে শহরে পাকাবাড়ি, পাকা রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া আর মানুষের ভিড়। সকাল হলেও ব্যাগ হাতে হাটে বাজারে মাছ, মাংস, আনাজ, চাল, আটা, মশলাপাতি কিনতে ছোটে মানুষেরা। তাড়াহুড়ো, ব্যস্ততা। আসামের মুসলমান বেদেনীদের তাঁবু পড়েছে শহরপ্রান্তে। ফরসা মজবুত চেহারা পাহাড়ী মেয়েগুলোর। বাত বেদনার ওষুধ বিক্রি করে মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙা, কোচবিহার, তুফানগঞ্জ আর দিনহাটা থানা। ছোট ছোট শহর বা জনপদগুলো হল নিশিগঞ্জ, বালেশ্বর, গোপালপুর, জামালদহ, হাজরার হাট, দেওয়ান হাট, পাটগ্রাম, শিবপুর, গীতলদহ, দেওয়ানগঞ্জ, ভিটাগুড়ি, খেতি।

সবুজ গ্রাম চারিদিকে। চায়ের বাগান। মেয়েরা চা পাতা তুলছে। বাগানের পাশেই তাদের ঝোবড়া বস্তি। বাসে করে তুফানগঞ্জে এসে আবদুল করিমের খোঁজ নিতে দোরের আড়াল থেকে তার বউ জানাল, 'কর্তা ঐ খিড়কির পানে, তামুক খ্যাতে পানি দিচ্ছে'। শিমূল বেত আর বাঁশবনের ছায়া দিয়ে করিমের বোন নিয়ে গেল। প্রতিবেশীদের দরজায় কর্ক আর বেতের কাজ হচ্ছে। ছাতা তৈরি হচ্ছে। তামাক পাতার বান্ডিল বাঁধা হচ্ছে। লরি ভর্ত্তি হয়ে যাবে কলকাতায়। শাল, সেগুন, শিরীষ গাছ উর্দ্ধে মাথা তুলে বাতাস নিয়ে খেলা করছে। বড় পুকুরের শানে মেয়েরা বাসন মাজছে, গা ধুচ্ছে। তেমন কোন আড়াল নেই। দমকল বসিয়ে পুকুর থেকে তামাক ক্ষেতে জল দিচ্ছে

আবদুল করিম। দেখা হতে সে রীতিমতো বিস্মিত। বলল, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ এখানে?'

তুমি এরকম বড়লোক হয়ে গেছ জানি না তো! পাকাবাড়ি, শানবাঁধানো পুকুর, বাগান বাগিচা।

'এসো, আজ সারাদিন থাকো। এই ইনসান, জাল ফেল পুকুরে। মস্ত মেহমান এসেছে বাড়িতে। এ আমার বোন রাহিলা, বিয়ে করে ওর বর বাংলাদেশে পালিয়েছে, আজ পাঁচ বছর আর আসেনি। শুনি, সে নাকি এখন গরু চুরি করে মস্ত বড়লোক হয়ে গেছে। ওর একটা বাচ্চা আছে, আমাকেই পালতে হচ্ছে।

করিম চাকরি খুঁজত কলকাতায়। লেখা নিয়ে যেত কাগজে। তার ঠিকানাটা আমার জানা ছিল। ও এখন নাকি পঞ্চায়েতের প্রধান।

নাইবার খাবার সময় নেই, কার জমির গন্ডগোল, খুন জখম হ'ল তো থানায় ছোটো। চাষ-আবাদ কি দেখতে পাচ্ছি? এসব আমার নানার সম্পত্তি। নানী বেঁচে আছে। নামাজ পড়ে কেবল। ঐ বউ রাবেয়া। কলকাতা শহরের বস্তির মেয়ে—প্রেম করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। ওর ব্যাধি আছে। বাচ্চা হল না।

ভগ্নিপতির গরু চুরির ব্যাপারটায় খুব গুরুত্ব দিতে লাগল আবদুল করিম। গোসল, খানাপিনার পর বিশ্রাম করছি। বলল, 'তোমাদের ওদিকের কসাইরা এবার মরবে। ভারত থেকে প্রতিদিন প্রচুর গরু মুর্শিদাবাদের বর্ডার দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে। উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশের গরুবাথান হয়ে পালকে পাল হাঁটা পথে চলে আসে—তারপর বর্ডার সিকিউরিটির নজরানা দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে পবিত্র হয়ে যায়। মহাজনে মহাজনে লেন-দেন আছে। হুন্ডির কারবার চলে। ভাল করে গরু খাবার জন্যে ওরা দেশটা আলাদা করল, এখন হাজার উন্নতি সত্ত্বেও গরু নেই। খেয়ে সব লোপাট। ফলে ভারতে মানে পশ্চিমবাংলা আর কেরালায় বিফের দাম ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। যদিও অন্য প্রদেশগুলিতে গরু কাটা বন্ধ আছে তবু 'গোসে'র দাম বিফের দাম এখন দশ টাকায় পৌঁছেছে। মুসলমানরা কম দামে যে প্রোটিনটা পেত, ওপারের জাতভাইরা তাতে 'হাঁতা' হচ্ছে। তোমরা লেখো না, তদন্ত হোক। আর হয়েই বা কি হবে—জানি তো সব থানা পুলিশের কাজ। তাদের ওপরেও দাদারা আছেন'।

করিমের ওখানে চমৎকার রাত কাটল। রাহিলা খুব দিলখোলা মেয়ে। ফজরেই আবার রওনা। দিনহাটায় এসে পরিমল সামন্তের কাছে জানতে পারলাম' কোচবিহারের চা বাগান আর তামাক আশ্রিত শিল্পেও নাকি বড় বাজারীদের অর্থলগ্নী হয়েছে। তিনি বললেন, লক্ষ লক্ষ টন তামাক আর চা চলে যায় বড় বাজারের আড়তে। ব্যাঙ্কের লোন নিয়ে ছোট ছোট চাষীরা ক্ষেতে তামাক আর চা তৈরি করতে চায় কিন্তু আইনের জটিল 'ফ্যাতা' জড়িয়ে রেখেছে ঐসব মহাজনরা ব্যাঙ্কের উঁচুতলার ম্যানেজারবাবুদের

বগলদাবা করে। ফলে তারা লোন নিতে পারছে না। নিলেও শোধ দিতে পারছে না সংসারের দায়ে পড়ে। কবে তামাক উঠবে তার আগেই চাষীদের টাকা ধার দেওয়া হয়। তামাক উঠলে অনেক কম দামে সব তামাক নিয়ে নেওয়া হয়। বোকা চাষীরা বুড়ো আঙ্গুল চোষে।

গীতলদহ বাংলাদেশের সবচেয়ে কাছে। লোকেরা ওপারে যায় আসে? হাসান চাচা কইল, 'গরু আর উ-পারে যাইলে পাবা না। উ-পারে রংপুরে মোর মামুর বাড়ি। যাই আসি—'পাছপোর্ট' 'ভিছা' লাগে না। বডারে পুলিশ আছে —বিড়ি চা দ্যাড়ডা ট্যাহা দিলি ছাইড়া দ্যান'।

কই মাছ কত করে এখানে?

'পনের ট্যাহা। কলছির ভিতরে খরখর করছেন। তাজা বড় বড় মাছ। ভেড়ির ময়লা খাওয়া লয়।'

আধুনিক বাড়ি হচ্ছে। বাগানের শাল সেগুন কেটে ঘরেই চেরাই জানলা-কপাট তৈরি হচ্ছে আজিম মোল্লার। পাখি শিকার করছে পেখেরা মানুষরা।

ছোট জেলা কোচবিহার । রঙিন গালিচা, পর্দা, বেতের মাদুরী, মোড়া, চেয়ার, ধামা, পালি, পাল্লা, কুনকে, ঝুড়ি, ছড়ি কত তৈরি হচ্ছে।

লম্বা বেতের গায়ে বাঁশের পাতার মতন পাতা। কাঁটাও আছে। ফলগুলো চিলের চোখের মতন, জীবনানন্দ দাশ ঠিকই লিখেছেন।

তেতুঁলে বিছের মতন লালচে বেতের বাড়ি খেয়ে তখনকার পাঠশালার গুরুমশাইদের কাছে কড়ানে থেকে কশুকে পর্যন্ত লিখতে না পারলে এই কোচবিহারী বেত পিঠে পড়ত আমাদের বাপ-চাচাদের।

গরিব মানুষদের ভিড় সর্বত্র। অভাব অনটন। কেরোসিন তেল আর রেশনের লাইন। আধমরা গরু-ছাগল-ভেড়া-ঘোড়া-মোষ। মুরগি আর শুয়োর চরে বেড়াচ্ছে। পা পা করে উদ্ধত আর দাম্ভিক রাজহাঁস হেঁটে চলেছে।

নিশিগঞ্জের দেওয়ান বাড়ির এ্যালসেসিয়ান পাহাড়-কাঁপানো ডাক ছেড়ে শিকল ছেঁড়ার যুদ্ধ চালায়। চা বাগান মালিক আরিফ দেওয়ান শ্রমিকদের ঝামেলায় মহাবিরক্ত। বললেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের পাততাড়ি গুটোতে হবে। আমার চা বাগানে ধর্মঘট চলছে আজ তিনমাস। চা গাছগুলো পোকায় নষ্ট করে দিচ্ছে—ওষুধ লাগাতেও দিচ্ছে না। চুলোয় যাক চা বাগান। আমার অত টাকা নেই যে ওদের আটদফা দাবি মানব। রোজই দুটো একটা করে চিঠি পাচ্ছি অনাহারে শ্রমিকদের আত্মহত্যার। কিন্তু কি করব আমি? আমাকে ঘেরাও করল, ঘাড় ধাক্কা মারল কেন?

সুদীর্ঘ একটা তামাক সারির দিকে তাকিয়ে দুপুর রোদে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঝাউগাছে

কতকগুলো সাদা কালো অদ্ভুত সুন্দর বক কক্ কক্ শব্দ তুলছে। তামাক সারির মাঝখানে হঠাৎ একটা গাছ কুঁকড়ে ছোট হয়ে আছে কেন?

চাষী জিয়াউল মিয়াকে কারণ জিজ্ঞাসা করতে বললেন, জানি না বাপ, আল্লায় করেছে।

বললাম, কাস্তে বা দাওয়ালি 'খুরপি দিয়ে গোড়াটা খুঁড়ে দেখুন, দেখবেন খোলামকুচি বা ইঁট পাথর আছে।'

দেখলেন সাদা একশীষ পাটের মতন ঝোলা দাড়িঅলা বুড়ো জিয়াউল মিয়া। একটা ইঁটের খন্ড বেরুল। জল ঢেলে আবা গাছটা বসিয়ে দিলেন।

হলদিবাড়ির একটি মুসলিম যুবতী তিনটি বাচ্চা হাতে নিয়ে হাত পাতল। তার স্বামী নাকি তাকে তালাক দিয়ে আবার একটা নিকে করেছে। বড় ছেলেটি পাঁচ বছরের বেশ সুন্দর কিন্তু ঐ কোঁকড়ানো তামাক চারাটার মতন। অর্থনৈতিক সংকটের ইঁট পড়েছে তলায়। বার করে দিয়ে মাথায়, সুব্যবস্থার জল ঢালতে পারলে ঐ ছেলেটাই একদিন কোচবিহারের জেলা শাসক বা দিল্লীর মন্ত্রী হতে পারত।

হাজার হাজার — লক্ষ লক্ষ — কোটি কোটি অমন অসহায় সন্তান আমাদের ভারত জুড়ে। কারদিকে তাকাব, কটার জন্যে অশ্রুপাত করব? আমাদের চোখের জলও যে শুকিয়ে গেছে।

বিংশ পঞ্চবার্ষিকীর পর লালমন ফকির মেয়ের বড় বাচ্চাটির জন্য কিছু করা যেতে পারে কিনা কোচবিহারের সহৃদয় জেলা শাসকের কাছে আমাদের আবেদন রইল।

ভবিতব্য বলল 'নিশ্চয়ই, কিন্তু তখন সে বেঁচে থাকলে তো?

গৌড় পাভুয়ার গৌরবে ইতিহাসের পাথর কাঁকর চাপা পড়ে গেছে

রাত তিনটের সময় ফরাক্কা ব্যারেজের পশ্চিম পাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দীর্ঘ প্রতিবিম্ব ফেলে লাফালাফি করছে, চলন্ত গাড়িতে — এখানে সমুদ্র এলো কোথা থেকে? কন্ডাকটর প্রদীপ ব্যানার্জী বললেন, 'চাষীদের জমি পুকুর ভাসিয়ে ফরাক্কা প্রকল্পের জলরাশি আটকে রাখা আছে...।

তাই বটে। কোমর ডোবা খেজুর গাছ। পাতি-চেঁচকো হোগলা দেখা যাচ্ছে।

মহানন্দার কোলে জল চিরচির করে বয়ে চলেছে শ্যাওলা, ঘাস আর পলিচরের ভেতর দিয়ে গলে গলে। সেতুর ওপর দিয়ে ঘুরে আমবাগানের ভেতরে মহানন্দা ভবনে এলাম। গেটে খুঁটির মত মোটা একটা অরহর গাছ। ফুলও ধরেছে মেলা। গনিখান চৌধুরীর চিঠি দিলাম কিন্তু তিনি দেখা করলেন না। ভারী মানুষ। আমাদের মতো সামান্য লোককে পাত্তা দিলে সত্যই তো তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তির মর্যাদা থাকে না। মুসলমান মন্ত্রীর কাছে মুসলমানরা গেলে তিনি বোধহয় সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আসার ভয়ে সদাসর্বদা সতর্ক থাকেন।

প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে দেখা হ'ল। সেই চুরুট টানা ভদ্র মূর্ত্তি। সাংস্কৃতিক কথাবার্তা। কোথা উঠেছি, কি খাচ্ছি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি নাকি আমার এক নম্বর ভক্ত পাঠক। (স্বর্গতা মিসেস গান্ধী বোধহয় তাঁরই প্ররোচনায় স্মৃতি মোথিত করে বলেছিলেন, বিড়লাপুরে, আমাকে চিনতে পারছেন কি না শুধোতে, 'বিটার অ্যান্ড আউট সানডিং রাইটার অব ওয়েস্ট বেঙ্গল'।

'পুরনো আমগাছ কাটতে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন কেন? কাঠুরেরা চটেছে। এক উকিল বলছিলেন। আচ্ছা, মালদার মুসলিমদের ভেতরে হিন্দি মৈথিলীর এত জড়িজক্কড় প্রভাব কেন?

প্রণববাবু বললেন, 'এটা তো কিষাণগঞ্জের অংশ ছিল আগে'।

'বাজারে এখানে আনাজ-সবজি নেই তো শুধু গুলিগুলি আলু আর ডাল।'

আম, জাম, কাঁঠাল গাছের ভিড়।

গঙ্গা, কালিন্দি, মহানন্দা, পুর্নভবা, টাঙ্গন নদী বয়ে চলেছে মালদহের ওপর দিয়ে। রুক্ষ ধূসর ভূমি। গঙ্গার কাছাকাছি উচ্চতা ৫০ মিটার। মহানন্দা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে মালদহ জেলাকে দুভাগে ভাগ করেছে। মহানন্দার পূবের অঞ্চল বরেন্দ্র ভূমি তরঙ্গায়িত আর উঁচু। পশ্চিমে ঢালু হয়ে মহানন্দা আর কালিন্দীর মাঝখানে নাবাল

জায়গাতে মিলেছে।

খেসারী আর তিসি গাছে নীলচে ফুল ফুটেছে। আধমরা মোষ তেড়ে হাল করছে কোন চাষী। ইঁদারার পাশে কলসীর হাট বসিয়ে কোমর বাঁকিয়ে মাথায় দুটো হাত বেঁধে গল্প করছে সাঁওতাল বা দেহাতি মেয়েরা। লাল লাল বাঁশনী বাঁশের ঝাড় মাঝে মধ্যে। অর্জুন গাছের সাদা গা-চৌকলো শুকনো ফলের ঝাঁটি। গৌড়ের আদিনা মসজিদ। রাতের স্মৃতি আমের বউলের গন্ধে মৌতাত হয়ে আছে। পশ্চিম দিনাজপুরে ঢুকতে তবে সবুজ সজীব শাকসবজি ফসল সম্পদ চোখে পড়েছে।

ইসলামিয়া লাইব্রেরিতে গিয়ে বসেছিলাম মালদার চৌমাথানী শহরের মাঝখানে। কত বইপত্র। রসুল মিয়ার সঙ্গে আলাপ। শিবগঞ্জের মানুষ। ফেরেস্তার মতন চেহারা। মটকার টাইকলার দীর্ঘ জোব্বা গায়ে। পরণে পাজামা পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো। তিনি হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম নকশার কারিগর। পকেট থেকে একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের কৌটা বার করে খুলে বললেন, নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখবেন, যখন ঝুঁকবেন। এই কুঁচটার ডালা খুলছি সূচের ডগা দিয়ে। এর ভেতরে একশোটা হাতি আছে।

ম্যাজিক নয়, সত্যি। সোনামোড়া নীল কাগজে সাদা সাদা ছোট ছোট হাতি। বায়নাকুলার আনল ছুটে গিয়ে উকিলের ছেলেটি। চোখে দিয়ে দেখি পূর্ণঅবয়ব হস্তি। একটা কুঁচের ভেতর একশোটা হাতি ধরে?

রসুল মিয়া সাতঘাট ঘোরা মানুষ। আগে লিথো মেশিনের জন্য হাতের লেখা সুন্দর বলে মুন্সীর কাজ করতেন উর্দু পত্রিকায়। তারপর মুর্শিদাবাদের মীর্জাপুর আর ইসলামপুরে অনেক বছর রেশম বস্ত্র তৈরির কারখানায় ম্যানেজারি করেছেন। গুটিপোকার চাষ করেছেন। তুঁত গাছের বাগান করে।

এখন মুর্শিদাবাদে থাকেন হাতির দাঁতের শিল্পকাজ নিয়ে। তাঁর মাটির বাংলো বাড়িতে উলু-পাট-তুঁষ দিয়ে ছোব ধরানোর পর ডিমের লালা দিয়ে পালিশ করা বিদেশী রাজহাঁস আর খরগোস আছে। রসুল মিয়া ধর্মে প্রচন্ড বিশ্বাসী। নামাজ পড়েন পাঁচওয়াক্ত। বে-নামাজীদের তিনি ময়লা-মাখা মানুষ বলে মনে করেন।

আমনুরা থেকে মালদহ হয়ে হরিশচন্দ্রপুর পর্যন্ত রেলপথ আছে মালদহে।

ইংরেজ বাজার বড় শহর। তাছাড়া যে সব শহরগঞ্জ আছে তাদের মধ্যে নামকরা হ'ল : কাংসত, গাজোল, চাচোল, গৌড়, পার্বতীপুর, হাবিবপুর, পালশডাঙা, হরিশচন্দ্রপুর, মাটিয়াগঞ্জ, রাতুয়া, হরিয়ালি, সাঁকরোল, তুলসীহাটা, চঞ্চল, মহানন্দপুর, খরবা, মালতীপুর, গোবিন্দপুর, বড়ডাঙা, ভাইকাহার, বামুনগোলা, আমানিডাঙা, রাণীগঞ্জ। মথুরাপুর, পরাণগঞ্জ, নিজগাঁও, পঞ্চানন্দপুর, সাহেবগঞ্জ। কালিয়াচক, ভোলাহাট, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর, মুচিরা, বড়দাদপুর, শিবগঞ্জ, আমনুরা, মহারাজপুর।

ছোট জেলা মালদহ। লোক বসতির ঘনত্ব, প্রতি কিঃ মিঃ - তে ৪৩৪। মালদহ শহরে গাড়ি ঘোড়ার ভিড়। আধুনিক জীবন-যাপন।

বালুরঘাটে যাবার পথে আর একবার রাত্রে একদল সাংবাদিকের সঙ্গে মালদহের টুরিস্ট লজে রাত কাটিয়েছি। জেলা শাসক এসে তাঁর জেলাটি যে ফরাক্কা প্রকল্পের দ্বারা সেচসেবিত হয়ে এখন সবুজ হয়ে উঠেছে বোরো ধানে, সে কথা সবিস্তারে জানালেন।

মাছ মাংস এখানে আক্রা হলেও টাকা ফেললেই পাওয়া যায়।

তখন আমের সময়। গাছে গাছে এক একটা শীষে আট-দশটা আম ঝুলছে। মালদার ফজলী আম বিখ্যাত। নামটা নাকি বাদশা আকবরের জ্ঞানী পন্ডিত প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজলের স্মৃতির জন্যে উৎসর্গীকৃত। কালিয়াচকের শিক্ষক গৌরাঙ্গ দেওয়ান সেই রকম বলেছিলেন। টুরিস্টলজে তাঁর সঙ্গে আলাপ। তাঁত শিল্প আছে তাঁর। ডোর তৈরীও হয়।

বালুরঘাট থেকে ফেরার পরে আমরা গৌড়ের আদিনা মসজিদ দেখতে গেলাম। মসজিদের বিরাট জগঝম্প চেহারা। ভেতরে আলো আঁধারী। প্রেমিক প্রেমিকাদের আড্ডাখানা এটা। এখন বালি-কাঁকড় জমানো দুর্গ পড়ে আছে। হায় সেই লোকগুলো কোথায়! কবরের অন্ধকারে এখনো কি তলোয়ার ঘুরোচ্ছেন? গৌড়ের সুলতান কি এখনো বেগম শিরিন বানুর অনিন্দ্যসুন্দর খাবসুরতে মুগ্ধ হয়ে আর গান শুনে উরু চাপড়ে বলে উঠেছেন,'কেয়া বাত! কেয়া বাত!'

ফেরার সময় মালদার বাজার থেকে আমরা প্রত্যেকে একঝুড়ি করে আসলী সুর্মা ফজলী গস্ত করে এনেছিলাম। কাঁঠালও এনেছিলাম কেউ কেউ। মালদার সুর্মা ফজলীর স্বাদ রসগোল্লারও বাড়া।

মালদহ। কোন 'মাল' দহে পড়েছিল আল্লায় মালুম!

মধ্য বাংলার এই রুক্ষ শুকনো মাটিতে কেন এমন সুন্দর আম হয় এটা কৃষি-বিজ্ঞানীরাই বলতে পারেন— কিন্তু আমার ধারণা অতিরিক্ত গরমের জায়গা সর্দিগর্মি লাগার জন্য তার মহৌষধি হিসাবে আমকে পাঠিয়েছে প্রকৃতি।

আম থেকে কাসুন্দি আমসত্ব তো হয়ই, পাকা আমের পচানী থেকে বাষ্পীভবন করে সরাব তৈরি করাও যায়। করা হয়ও বোধহয়।

মালদহে যে সব আম ফলে তাদের নাম হ'ল, ফজলী, সুর্মা ফজলী, ল্যাংড়া, লতা বোম্বাই, ধড় বোম্বাই, বেগমফুলি, হিমসাগর, তোতাফুলি, কালাপানি, জাহাঙ্গীর, বাদশ ভোগ, মোহনভোগ ইত্যাদি।

মালদহের গৌড়-পান্ডুয়ার এককালে খুব দপদপা ছিল। সেসব ইতিহাস পাথর কাঁকড়

চাপা পড়ে গেছে। এখন আদিনা মসজিদের পাশের পল্লীতে গরিব মুসলমানদের দোরে ছেঁড়া চট কাঁথা ঝোলে। অনেক মানুষ বেকার।

বড় শিল্প প্রকল্প কিছুই গড়ে ওঠেনি মালদহে। গরিব মানুষরা রিক্সা চালায়, ঘোড়ার গাড়িতে আম, কাঁঠাল বয়, আমের সময় ঝুড়ি বাঁধে, ক্ষেতে জন খাটে—জিনিসের দাম বাড়ানো হচ্ছে নাকি যড়যন্ত্র করে গরিব লোকেদের ধ্বংস করে দেবার জন্য। ইন্দিরা গান্ধীর প্ল্যান নাকি। গরিব আর রাখবে না। গোবিন্দ রিক্সাঅলার তাই মত।

অর্কিড ফুলের মতন দার্জিলিংয়ের পাহাড়ীরা

দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথে তিনধরিয়া, কার্সিয়াং, সোনাদা, তারপরে ঘুম হয়ে দার্জিলিং। ছোট রেলগাড়ি। যাত্রী ঠাসা। অধিকাংশ নেপালী, ভূটানী, লেপচা, সিকিমের লোক। হিন্দিতে বাতচিত করতে হয়। দার্জিলিংয়ের এক কলেজের ইংলিশের প্রফেসর আমার সঙ্গী। ছুটি কাটিয়ে কলকাতা থেকে যাচ্ছেন কর্মক্ষেত্রে। ডক্টর অমলেন্দু বোসের ছাত্র নাকি তিনি। তাঁর কাছেই আমার 'চালচিত্র'র প্রশংসা শুনেছেন। বললেন, এই ঘুম (২,৩৪৭ মিঃ) হ'ল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জায়গার রেল স্টেশন।'

ঝুক ঝুক — ঢুস, ঝুক ঝুক — ঢুস। পার্বত্য পথে অরণ্য ভেদ করে সরীসৃপের মতন ছুটছে গাড়ি। গাড়ির মধ্যে ব্যাগ- ব্যাগেজ, শাক-সবজি, মাছের ঝুড়ি, পেটি ভরা কাঁচপাত্র। আলাদা মালবগি নেই।

বিকেলের রোদে গাছপালা অরণ্য জলাশয় নদী চোখে পড়েছে। রাতের অন্ধকারে সব একাকার। ইঞ্জিনের মুখে শুধু আলো জ্বলছে। গাড়িতে আলো নেই।। বীরভূমের কোপাই থেকে কাটোয়া যাবার পথে যেমন দেখেছিলাম ট্রামের মতো দুই বগির রেলগাড়িতে।

পকেটমার হবার জো নেই — চোতমাসেও কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি। যত এগোচ্ছে ততই ঠান্ডা লাগছে। বিকেলের দিকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে ঠান্ডাটা নাকি বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর সীমান্তে পূর্ব-হিমালয় পর্বতমালার ওপরে দার্জিলিং জেলা। পশ্চিমে নেপাল, উত্তরে সিকিম, পূবে ভূটান, দক্ষিণে জলপাইগুড়ি আর পশ্চিমে দিনাজপুরের কিছু অংশ। শিলিগুড়ি মহকুমা বাদে দার্জিলিং জেলার সমস্তটা পার্বত্য অঞ্চল। দেড়শ মিটার উঁচু সমভূমি থেকে এই অঞ্চলটিকে আলাদা করে রেখেছে। হিমালয়ের অংশ — সমভূমি থেকে হঠাৎ খাড়াভাবে উপরে উঠে গেছে। নেপালের সীমানায় সিঙ্গালীলা পর্বতশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। ফালুট (৩,৫৯৬ মিঃ), সবারগম (৩,৫৪৩ মিঃ) সন্দাকফু (৩,৬৩০ মিঃ) উত্তর থেকে দক্ষিণে মাথা উঁচু করে আকাশের তলায় ধ্যানমগ্ন। সিঙ্গালীলা পর্বতশ্রেণীর অংশ সেনচল-মহালধিরাম জলবিভাজিকাটি দার্জিলিং জেলার পশ্চিম অংশ জুড়ে আছে। এখান থেকে সাতটা শৈলশিরা আঙ্গুলের মতন দক্ষিণ-পূবে বিছিয়ে আছে। এদের মাঝখানে টাইগার হিল (২,৫৬৭মিঃ)। সিঙ্গ লীলী পর্বতশ্রেণী ক্রমশ নিচু হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে এসে মেচি নদীর সমভূমিতে মিশে গেছে। তিস্তা নদীর পূবে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলের পর্বতশ্রেণী প্রায়

সমান্তরালভাবে উত্তর-পূব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ছড়িয়ে আছে। এদের উচ্চতা প্রায় ৩.০০০ মিটার। দেওলা আর দারবিনদুরা শৈলশিরার অন্যতম।

নেপাল আর পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে প্রবাহিত মেচি নদী। মেচির পূবে বালাসন নদী। উত্তরের জলবিভাজিকা থেকে বহু নদী তিস্তাতে এসে মিশেছে। তিস্তার ডান তীরের উপনদী রেয়মঙ্গ, সিভক, বামতীরে রিলি, লিশ, গিশ। বর্ষাকালে প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে ধস নামে। তিস্তাতে বন্যা হয়।

জলঢাকা, তোরসা, রায়ডাক আর সঙ্কোশ আরো সব নদী আছে এই এলাকায়। মহানন্দা নদীর জলপ্রপাত হ'ল 'পাগলঝরা।

নদীগুলি খরস্রোতা, পাশের দিক যতটা ক্ষয় না করে তলায় ক্ষয় করে তার চেয়ে বেশি। হিমবাহ থেকে জল বয়ে আনে নদীগুলো — গ্রীষ্মকালে অনেক নদী শীর্ণকায় হয়ে পড়ে, শুকিয়ে যায়। ডুয়ার্স এলাকার পূবে শুকনো তরমুজ চাষ হয়।

জলপাইগুড়ি জলদাপাড়া অভয় অরণ্যে 'এক খড়্গা' গন্ডার পাওয়া যায়।

গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ১৫° ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকে বলে লোডশেডিংয়ে ক্ষ্যাপা কলকাতার বাবুরা মোটা চেহারায় আইঢাই করতে করতে ছুটে আসেন দার্জিলিং শহরে। অনেক হোটেল এখানে — অনেক কটেজ। সুন্দর সুন্দর কাঠের বাড়ি। পাথরের বাড়ি। মন্দির মসজিদ।

পাহাড়ের গা কেটে কেটে সমতল বা ধাপ তৈরি করে চাষ-আবাদ করা হয়েছে। বিস্তর লেবু বাগান। লেবু ফুলের গন্ধ চারিদিকে। দুঃখ হয় তখন কেন আসিনি যখন গাছে গাছে অজস্র লেবু পেকেছিল। ৩০০ টি চা বাগান আছে এখানে। ৫০০০ মজুর খাটে। চা বাগানের ভূমি সমতল করে ক্রমেই উঁচু থেকে নিচের দিকে নামানো, যাতে জল না দাঁড়ায়। এক একটা চা গাছ নাকি পঞ্চাশ বছর বাঁচে।

অনেক বাগান ছাঁটা দেখলাম। গাছের গায়ে ওষুধ লাগানো। বন্ধুর মাটি মোটেই বন্ধু নয় চাষীদের কাছে। অনুর্বর। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি বলে চাষ-আবাদ করাও কঠিন। ধাপ কাটা জমিতে ধান চাষ করা হয়। এছাড়া কিছু কিছু যব, ভূট্টা, গাজোর, কপি, টম্যাটোর চাষ করা হয়।

দার্জিলিংয়ের চা পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু দোকানে বা হোটেলে খাবার সময় সেই গরানঝাল গুড়োর মতন হালসানি গন্ধ ডাস্ট চা — যা নকল। আসলী পিকো চা বিদেশি মুদ্রা অর্জনের জন্য রপ্তানী করা হয়। যেমন চিনি এদেশে হলেও আমাদের বেশি দামে কিনতে হয়, কম দামে পেতে চাইলে রেশনে লাইনে দাঁড়াতে হবে।

চা উৎপাদনে দার্জিলিং ভারতের মধ্যে দু-নম্বর জায়গা।

ম্যালেরিয়া রোগ তাড়ানোর জন্য কালিম্পং—এ সিঙ্কোনা চাষ করা হয়।

দার্জিলিং জেলার কমলা লেবু হয় বড় আকারের—দুই মাথা টেপা। গায়ে কোঁচকানো দাগ। কোয়াগুলো মিষ্টি। বড় এলাচও হয় এখানে।

তরাই বনভূমি থাকার জন্য করাত কল, প্যাকিং বাক্স তৈরির কারখানা, প্লাইউডের কারখানা ইত্যাদি শিল্প গড়ে উঠেছে। মানুষ কাজ চাচ্ছে, কাজ পাচ্ছে, দল বাঁধছে, লড়াই করছে —রাজনীতি যেন এখন ভাত-কাপড়ের মতন।

কালিম্পং মহকুমার জাসিংকোটার কাছে টার্সিয়ারী যুগের নিচুমানের কয়লা পাওয়া যায়। রঙ্গিত নদীর ধারে গ্রাফাইট, লোহার গড়ে লৌহ আকরিক, কালিম্পং-এর কাছে তামার আকরিক পাওয়া যায়। এই খনিগুলোতে বেশ কিছু লোক কাজ করে। শীতের দিনেও তাদের তামার মতো শরীর থেকে ঘাম গড়ায়।

উল, বাঁশ, পাথর আর মাটির তৈরি প্রচুর সৌখিন জিনিস তৈরি হয় এখানে। দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং, পেডং অঞ্চলে স্বাস্থ্য নিবাস ও পর্যটন কেন্দ্র আছে। ধনপতিরা এইসব জায়গাতেই এসে আস্তানা পাতেন। এখানের প্রাকৃতির শোভা-সৌন্দর্য স্বর্গলাঞ্ছিত। দার্জিলিং আসলে গাছের শোভা, পাহাড়ের শোভা, কটেজের শোভা — পাহাড়ী যুবতী নারীর আর অর্কিড ফুলের মেলার শোভা। আর যখন ধস নামে ভগবানকে ডাকার আগেই বালবাচ্চাসহ একেবারে পাতাল প্রবেশ।

জলঢাকা নদীর পরিকল্পনা করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। ছিদ্রপং-এ বাগমোরা নদীর ওপর জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র আছে। তাই ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো আছে। মংপুতে কুইনাইন আর চায়ের বাক্স তৈরি হয়। প্লাইউডের কারখানা আছে।

দার্জিলিং আর কার্সিয়াং-এর চায়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত কারখানা আছে।

চামড়ার ব্যাগ, জুতো, ফল সংরক্ষণ, দুগ্ধজাত জিনিস, মাথার টুপি, বর্ষাতি, পিতল, কাঁসা তামার জিনিসও তৈরি করা হয় দার্জিলিংয়ে।

সংকীর্ণ রেলপথ ছাড়া ছ'টি সড়কের দ্বারা যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি আর ৩১ (ক) নম্বর জাতীয় সড়কপথে শিভক, তিস্তা বাজার, রংপো হয়ে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক যাওয়া যায়। বিমানপথে কলকাতা থেকে বাগডোগরা

১,০০০ মিটার নিচে চিরহরিৎ বনভূমিতে শাপ, চাঁপ, বাঁশ, শিমূল, কদম্ব, গামারি গাছ দেখা যায়। ১,০০০ থেকে ১,৫০০ মিটার উপরে উপক্রান্তির বনে দেখা যায় মিচেলিয়া, ডিনড্রিলা, লরেল, তুন আর বাঁশ। ১,৫০০ থেকে ৩,০০০ মিটারের নাতিশীতোষ্ণ ভূমিতে ওক, ম্যাগনোলিয়া, রডোডেনড্রন, ওয়ালনাট, ফার্ণ আর ৩,০০০ মিটারের ওপর জন্মায় বার্চ, জাপানী পাইন।

দার্জিলিং শহরের কাছে বার্চ আর জাপানী পাইনের সারি প্রচুর। ৩,৫০০ মিটারের

ওপরে আল্পীয় তৃণভূমি। সেসব জায়গায় চামরী গরু, মেষ, ঘোড়া, মোষ চরায় পাহাড়ীরা।

হিমালয় আর বঙ্গোপোসাগর জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে এখানে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০০ থেকে ৫০০ সেন্টিমিটার।

মাটিতে কাদা দেখা যায়। নদীবাহিত কাঁকড় পাথর ছড়ানো চারদিকে। গাছের পাতা-পচা জৈব অংশ থেকে যে কালো মাটি জন্মেছে তা অবশ্য উর্বর।

দার্জিলিংয়ে লোকবসতি প্রতি বর্গ কিমিতে ২৫৪ জন মাত্র।

পর্বত শৃঙ্গের সাদা ধবধবে তুষার জমা মাথায় সকালের সুর্যরশ্মি পড়ে চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে যে হীরকোজ্জ্বল শোভার সৃষ্টি হয় তা সাধারণ মানুষের উপভোগ্য বিষয় নয় বলেই মুনিঋষিরা বাৎলেছেন ওখানে থাকেন দেবতারা। তবে আরো অনেক উপরে। যত নিচে নামবেন ততই সাধারণ মানুষদের বাসভূমি? তাহলে উত্তর গোলার্ধের শেষ সমতল ভূমি সুন্দরবন এলাকার মাহিষ্য-অধুষ্যিত মানুষরা কি সৌন্দর্যবোধের দিক থেকে সব চাইতে খাটো? চোপ রাও! তারা শিবের শিষ্য। যে শিব ধ্যানমগ্ন হয়ে তুষারমৌলির মতো বসে আছেন হিমালয়ে।

দার্জিলিং থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গোটা পশ্চিমবঙ্গটাকে দেখতে চেয়েছিলাম — দেখতে পাইনি। পৃথিবী গোল বলে দু-চারশ মাইল দূরের মাটিতে আকাশ ঠেকে যায়।

দার্জিলিংয়ের লোকেদের প্রধান ভাষা নেপালী। রেডিও বাজে ঘরে ঘরে কাঠমুণ্ডু। গাছের গোড়ায় ঠাকুর দেবতা-ফুল।

এখানে জিনিসের দাম খুব আক্রা।

চা বাগান মালিকের প্রাসাদ আছে। গেটে বন্দুকধারী দারোয়ান আছে। প্রাসাদের সামনে লন, পাইন, বার্চ, ঝাউ, পাম গাছ। কত রকম ক্যাকটাস। লতা। ফুল। পাখি।

তবু শহরে যেসব অগণিত মানুষ তাদের চেহারা মঙ্গোলিয় হলেও সোনার রঙে লাবণ্য স্তিমিত বিবর্ণ, মুখে মেছেতা, বস্ত্র মলিন— দারিদ্র্য-প্রকট। চা বাগান কর্মীরা দুঃস্থ দরিদ্র, রোগগ্রস্ত, শীর্ণ।

দীর্ঘদিন স্থায়ী অর্কিড ফুলের মতো পাহাড়ী নেপালী, ভূটানী, লেপচা, গারো, নাগাদের বুক চওড়া, কোমর ভারী, মুখ চ্যাপ্টা চেহারার যৌবনশক্তি অটুট থাকে বহুকাল। পেটে খেতে না পাও শীতের আবহাওয়ার দামী পোশাক বানাতেই হয়। গরিবরা তা কাচতে পারে না বলে কারো কারো গায়ে চেরোল চরে বেড়ায়। কলকাতায় শীতকালীন গরম বস্ত্র নিয়ে যেসব ভূটানীরা আসে এখানে সারা বছর তারা ক্ষেতে খামারে, কলে কারখানায় কাজ করে। মেষ চরায়। উপায় করে এনে কাঠের ঘরে বসে তামাক টানে আর পা নাচায়। পাহাড়ীদের উৎসবে মানুষগুলো হয়ে ওঠে যেন মরশুমী ফুলের মেলা।

ডাব কাটা অপরাধ!

বাঙালি ভাবুক জাতি কিন্তু নারকেল তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাবনা উবে গেছে, দিস্তার পর দিস্তা কাগজ খরচা করে বেরিয়ে আসছে তার মাথা থেকে কেবল গদ্য কবিতা। এর আর একটা কারণ হ'ল পৈতৃক সম্পত্তি তেমন না মিললেও বহু পুরুষ প্রদত্ত আমাশা রোগটি পেয়েছে আজন্ম এবং ডাবের জল নাকি তার মহৌষধ। হতভাগা বাঙালি প্রচণ্ড রকম ঈর্ষাকাতর কারণ তার অম্বল রোগ আছে, অম্ল বেশি হলেই পিত্ত পড়বে পিত্তথলি গরম হওয়ার জন্য —এর মূলে আছে সেই পুরনো ব্যাধি আমাশা। পৃথিবীর তাবৎ তত্ত্ব এবং তথ্য তার জানা আছে কিন্তু জানা নেই যে অম্ল রোগীদের ডাবের জল খেতে নেই, তাতে আরো অম্ল বৃদ্ধি পায়।

কলকাতার বাবু বাঙালিগুলো আরো বেশি আনাড়ী। তাঁদের মাতৃভাষা এমনিতেই হিন্দি হয়ে গেছে। গাড়ি ঘোড়া দোকান বাজার যেখানেই মুখ খোল হিন্দি না বললে (টাকা যারা নেয় তারা) বুঝবে না, খেয়াল নেই যে আন্তর্জাতিক অধিকারে কবেই কাছা খুলে গেছে তার। ডাবের জল খাওয়া বাঙালিদের লড়িয়ে মনোভাব এখন গড়িয়ে পড়ছে দু'চোখ থেকে নোনাজল হয়ে। প্রকৃতির অভিশাপে পড়েছে সে। বাঙালির মাথায় চাপড় মারলে ধুলো ওড়ে এখন। পঞ্চাশ টাকা নারকেল তেলের কিলো। তাও কোচিন তেল। যখন সাধ্যের বাইরে চলে যাবে তখন (আঙুল ফল টক) এই রকম একটা ফতোয়া দেবে, নারকেল মাথায় দিও না, ওটা প্রাচীন গ্রাম্য ব্যাপার। শুয়োরের চর্বি থেকে যে ক্রিম তৈরি হয় তাই মাথায় দাও, যেমন শীতপ্রধান দেশের মানুষরা দেয়, তাতে যদি চুল সব হাপিস হয়ে যায় তবে কাঁচা বয়েসে নারীদের বিতৃষ্ণা থেকে বাঁচতে গিয়ে পরচুলো পরবে। আর মেয়েদের বলবে ইন্দিরা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বব্ ছাঁট করো—মহার্ঘ নারকেল তেল আর জোগান দেওয়া যাবে না।

একটা ঝুনো নারকেল এখন পাঁচ টাকা। কেন হ'ল? উৎপাদন কমে যাচ্ছে বলে, না প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ডাব কাটার জন্যে?

কলকাতায় একদিন কত ডাব খরচ হয় কই কোনো সুজন বন্ধু আলোচনা করেছেন বলে তো শুনিনি। কেরালায় বা তামিলনাড়ুতে ডাব কাটা একেবারে বন্ধ করা হয়েছে কেন রবীন্দ্রনাথের বংশধররা যদি একটু মাথা ঘামাত তাহলে ক্রমাগত তাদের অর্শরোগটা ব্যাপকভাবে বাড়ত না।

ফ্রন্ট সরকার বেপরোয়াভাবে দুম্ করে এক একটা কাণ্ড করে বসে, যেমন বালবাচ্চাদের কষ্ট হবে বলে হঠাৎ ইংরেজি তুলে দিলে। জোর সমালোচনায় পড়ে ভোটে নাস্তানাবুদ হয়ে আবার কেঁচো গণ্ডুষ করতে হ'ল কিন্তু হাজার দরখাস্ত পড়লেও হঠাৎ ডাব কাটা বন্ধের বিপ্লবে তারা নামবে বলে মনে হয় না। কারণ গরিবের সরকারকে ভেবে দেখতে হবে ডাব কারা ব্যাচে। যারা অভাবে পড়ে। বেওয়া-বাল্তি-গরিব লোক তারাই কচি ডাব কাটে নারকেল গাছ শূন্য করে। যেমন ধেনো বা চোলাই গুড়জল বন্ধ করা যাচ্ছে না গরিব মানুষরা করে খাচ্ছে বলে।

মন্দেরও একটা ভাল দিক আছে। ডাব কাটলে গাছ চারবার ফলে, ঝুনো রাখলে দু'বার। কাজেই ডাব কাটো। কিন্তু বছরে বড় চাষী দু'বার ঝুনো রেখে যে টাকা পাচ্ছে গরিবরা চারবার ডাব বেচে তা পাচ্ছে না। তোমার অভাব বুঝলেই ডাব কাটা পাইকের এক টাকার মাল মাত্র তিরিশ পয়সায় কিনতে চাইবে। এখনো ২৪ পরগণার গ্রামে দশ টাকা থেকে পঁচিশ টাকা শ দরে কচি ডাব বিক্রি হচ্ছে। কচি বাঁশ যেমন ঝাড় নষ্ট করে বাবুদের বিল্ডিং তুলতে চলে যাচ্ছে রোজ লক্ষ লক্ষ, তেমনি ডাবও।

ভাবালু বাঙালি যদি ভাবে কচি ডাব খাওয়া আর সন্তানের মাথা খাওয়া একই ব্যাপার তাহলে বোধহয় তার দ্বিধা হতে পারে। এর জন্য কোনো দেবতার আর্বিভাব হয় না? কোনো পরমহংসদেব অথবা অনুকূল বাবাজীও?

সমুদ্র উপকূলের নাবাল নিচু জায়গায়, আমাশা আর ক্রিমিরোগ বৃদ্ধি পায় বলেই প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক কল্যাণ বুদ্ধিতে নারকেল এসেছে। যে বেশি নারকেল খায় তার পেটে ক্রিমি থাকতেই পারে না। যার প্রচুর ক্রিমি জন্মেছে তেমন ছেলেকে পাকা ঝুনো নারকেল কুরে বেশি করে খাইয়ে দিলে বা নারকেল দুধ পিড়নো ঘন তৈলাক্ত ক্ষীর খাওয়ালে অবশ্য অবশ্যই সমস্ত ক্রিমি বেরিয়ে যাবে। মদ খাওয়ার মতো গোগ্রাসে এই তৈলাক্ত পদার্থ খেয়ে ক্রিমিরা চেতন হারিয়ে ফেলবে।

তাই তামিলভাষীরা নারকেল তেল শুধু গায়ে-মাথায় ব্যবহার করে না, তরকারিতেও খায়।

হায় বাঙালি, যে প্রদেশে তোমার বাস, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নারকেল গাছ তোমার বাসভূমিতে, বাগান-বাগিচায় কিন্তু কলকাতার বাবুদের বুক-ফাটা-পিপাসার-জল যোগান দিতে দিতে চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়ার প্রায় সব নারকেল কচি ডাবের অবস্থাতেই লরি ভর্তি হয়ে চলে যায় প্রতিদিন, প্রতিবেলা, প্রতিনিয়ত। এ বন্যা রোধিবে কে?

কেরালায় ডাব কাটা একেবারে নিষিদ্ধ। ডাব খেতে হলে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখাতে হবে। ক্রমেই এটা সামাজিক প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। ঝুনো নারকেল থেকে

যে ছোবড়া পাওয়া যায় তাও গদি, কাতাদড়ি বা বোলেন তৈরিতে প্রচুর পয়সা আনে। আগের যুগের বাঙালিরা পুজোয় নারকেল ব্যবহার করতেন। ডাবকে তাঁরা 'পুজো করতেন ঘটভাঁড়ের মাথায় চাপিয়ে। অনেক রকম মিষ্টি তৈরি হত বা এখনো হয় নারকেল থেকে। নারকেল-নাড়ু, নারকেলের সন্দেশ, নারকেল (পুলি) পিঠে,' নারকেল-ছাঁই। নারকেল দুধের ভাত বা পোলাও ইত্যাদি। প্রবাদ আছে ঃ নারকেল দর্শন যাত্রাকালে শুভ। দ্বারদ্ঘাটোন হয়ও নারকেল ভেঙে।

এক গ্লাস জল আর দুটো রুটি আছে নারকেল ফলের মধ্যে। ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রোপকূলে হাজার হাজার নারকেল পড়ে থাকত আগে, মানুষ খেত না, বলত, 'শয়তানের মাথা'! বনজঙ্গল হয়ে যেত নড়িয়েল গাছের। তারপর মানুষ শিখল নারকেল ভেঙে খেতে। বহুদিন অন্ন না জুটলেও কেবলমাত্র নারকেল খেয়ে থাকা যায়। কোনো রকম পুষ্টির অভাব হবে না। বাঁদর হনুমানদের সঙ্গে ভগবান রামচন্দ্র চোদ্দ বছর বনে থাকার সময় ফলমূল খেয়ে থাকতেন কিন্তু নারকেলের সন্ধান পাননি কেন সেটা বাল্মীকি বা বেদব্যাস জানেন। ইন্দোনেশিয়ার ভাসমান নারকেল আন্দামান, নিকোবর, বাংলাদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালায় এসেছে; সমুদ্রের উপকূলে গাছ ফুটেছে; গাছের ক্রমে বিস্তার লাভ হয়েছে। আফ্রিকার উপকূলে গিয়েও ঠেকেছে নারকেল। যত ঝড়-ঝাপটাই হোক না, কে তাকে ডোবাবে? কেনিয়ার জঙ্গলের আদিবাসীরা নারকেল খেত না, সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণকারী রামনাথ বিশ্বাস, নারকেল খেলে যে মানুষ মারা যায় এই ভ্রান্ত ধারণা তাদের ভেঙে দিয়ে এসেছেন বলে লিখেছেন।

আধুনিক অনেক বাঙালি যিনি বছরের পর বছর একেবারেই নাকি নারকেল খাননি। গ্রাম ছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য প্রায় একশো বছর আগে থেকেই এই দুর্ভাগ্যটা তার কপালে এসে জুটেছে।

নারকেলের অতিরিক্ত দর হয়ে যাওয়ার জন্য চাষীবাড়িতে অতিথি গেলে আর তেমন কেউ নারকেল-গুড় খেতে দেয় না। এখন নমো নমো করে চা বিস্কুটই যথেষ্ট। আগে সরবৎ বা নেওয়া-পাতি ডাব অতিথিদের হন্টনের ক্লান্তি দূর করত। এখন অতিথিরা আর বারো ক্রোশ হাঁটেও না আর তারা নারায়ণও নয়—তাই চা-বিস্কুট দিয়ে বিদায় করাই বৈধ।

ছেলেবেলায় সম্ভ্রান্ত চাষীপরিবার মামার বাড়িতে আমার অনেককাল কেটেছে। মামাদের প্রচুর নারকেল হত। গোলা ভর্তি হয়ে থাকত। ব্যাচার, পর যে 'বাছ' নারকেল পড়ে থাকত কুড়ুল মেরে মেরে ফেড়ে দিতাম। 'ভোকড়' খেতাম কত। উঠোন ভর্তি নারকেল শাঁস শুকোত। কাকে কত নিয়ে পালাত। শাঁস শুকোলে ধামায় করে নিয়ে যেতে হত ঘানিতে। তেলির সেই চোখ বাঁধা বলদ ঘোরা ঘানির ওপরে

বসে ক্যাঁ কোঁ শব্দ শোনা আর সুঘ্রাণ ওঠা টাটকা সেই নারকেল-খইল-তেল নিয়ে আসা এখন যেন একটা স্বপ্ন। মামিরা বা মা-মাসিরা কলসি ভরা তেল থেকে পলা বোঝাই করা তেল মাঠগুদাম থেকে পেড়ে এনে দিলে মাথায় দিত—কী তার খোসবাই!

হায় কোচিন তেল, তুমিই এখন ভরসা। ঘানি উঠে গেছে কবেই।

এখন কেবল শহর কলকাতায় ডাব কাটা হচ্ছে কচাকচ্ কচাকচ্ কচাকচ্ কচা কচ্!

বে-ওয়াকুফদের রাজ্যে যখন বাস করছি

স্বাধীন ভাবনা যাঁরা করতে ভালবাসতেন তাঁদের বলি আপনারা কি ভেবে দেখেছেন স্বাধীনতার সাঁয়ত্রিশ বছর পরেও পশ্চিমবাংলায় একজনও নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা হ'ল না কেন মুসলমানদের মধ্যে? ব্যাপারটা সত্যি নয় কি?

সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডাদের মতো মুসলমানরাও একটা অনগ্রসর সম্প্রদায় বলে যাঁরা 'দূর-ছি' করে তাদের কথা আলাদা কিন্তু কিছু মানুষ নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা সাম্প্রদায়িক বা গণ্ডিবদ্ধ চিন্তার ঊর্দ্ধে—তাঁদের কাছেই আমাদের প্রশ্নটা হয়তো গুরুত্ব পেতে পারে।

সাহিত্যিক ও সমালোচক কাজী আবদুল ওদুদ একদা বলেছিলেন, 'স্বাধীনতার পর ঢাকা আরও খুলে গেছে, আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা হয়ে গেছে আরও বেশি আবৃত।'

বলাই বাহুল্য যে এই আবরণ ধর্মের অর্থাৎ তারা হয়ে গেল গোঁড়া ধার্মিক।

এটা খুবই সত্য যে পশ্চিমবাংলার গ্রামে গঞ্জে এখন বানের পানির মতন জমায়েত-ই-ইসলাম আর তবলিগ জমাত ঢুকে পড়েছে। দু-দলেরই মোদ্দা কথা নামাজ পড়, রোজা রাখ। দীন-ই-ইসলামের দীনদার শরীক হও। অর্থাৎ গো ব্যাক টু ইসলাম। দ্বিতীয় দল তবলিগ জমাতের রাজনৈতিক বক্তব্য নেই। প্রথম দলটি মুসলমানরা অবহেলিত নির্যাতিত বলে সোচ্চার সজীব। অনেকটা বৈপ্লবিক ভঙ্গিতেই।

গোটা বাংলা মুসলমান প্রধান ছিল অতএব জিন্নাহ-সোহরাওয়ার্দি বাংলার গোটা অংশটাকেই পাকিস্তান বানাতে পারবেন (ইনসে আল্লাহ্) এটাই ছিল বেশির ভাগ বাঙালি মুসলমানের ধ্যান-ধারণা। কিন্তু স্বাধীনতার পর সে ধারণার ভুল ভেঙে গেল। তৈরি হ'ল পশ্চিমবাংলা আর পূর্ব পাকিস্তান। আল্লার কসম বলছি, সেই থেকে এখানের বেশিরভাগ মুসলমানই ভাবে আমরা আশ্রিত বা পরাধীন অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আধুনিক শিক্ষা বা দেশের অগ্রগতির ব্যাপারে তাই তাদের অনেকেরই নেই তেমন কোন আগ্রহ বা দরদ। কল-কারখানা, জাহাজ, উড়োজাহাজ, সেতু গাড়িঘোড়া গড়বে--ফসল ফলাবে অন্য লোক—ধার্মিক মুসলমানরা ইহকালকে জলাঞ্জলি দিয়ে পরকালের ভাবনায় শুধু আল্লা করে দিন গুজরান করবেন।

যে প্রশ্ন শুরুতেই করেছিলাম এবার তা নিয়ে দু-চার কথা ভাবা যাক।

কোন্ শনির অভিশাপে জানি না কলকাতা রেডিও নাকি 'আঁটকুড়ো' হয়ে গেছে -

কেউ আর তেমন শোনে না, শোনে ঢাকা রেডিও আর বলে, কি ভাল কি ভাল। ঢাকা টিভিও নাকি ভাল, দর্শকদের অভিমত। কিন্তু এই ভাল বলার দলে কেবল ভাল জিনিসকে ভাল বলার সৎসাহসী হিন্দুরাই নেই, মুসলমানরাও আছেন। যাঁরা আছেন, তাঁরা কারা? খুবই মজার কথা যে এঁদের ভেতরে জমায়েত-ই-ইসলাম বা তবলিগ জমায়েত শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকরাও রয়েছেন।

তাঁরা ঢাকার গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকাদের গুণমুগ্ধ। কিন্তু একবার যদি কলকাতা রেডিও বা টিভি থেকে পশ্চিমবাংলায় স্থানীয় কোন মুসলিম গায়ক-গায়িকা বা নায়ক-নায়িকার সন্মুখীন হন তবেই মনটা তাঁদের ব্যাজার। বলবেন, এরা একেবারে বে-দীন, বে-ইমান, কাফের এরা হিন্দুদের চামচে। নাহলে সুযোগ পাবে কেন? যেমন ছিলেন নজরুল।...

আসলে ব্যাপারটা কি একটু ভাল করে এবার ভেবে দেখুন। কেন না, সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রেই প্রতিভা খোঁজা হয় (যদিও জনা-চারেক মুসলমান মন্ত্রী নেওয়া হয়, এঁরা আবার মন্ত্রী নাকি?—ঢাকা বা পাকিস্তানের মন্ত্রীরাই হলেন আসল মন্ত্রী বা উজির, কেন না সাম্প্রদায়িকতার ভয়ে এইসব 'পশ্চিমবঙ্গীয়' মন্ত্রীরা মুসলমানদের আদৌ ভালই করেন না।) আর যত প্রতিভাধর মুসলমান নারী-পুরুষের শুভ আবির্ভাব হচ্ছে এখন ঢাকায়-কলকাতায় নয়।

তবে কি এখানের শিল্পী-সাহিত্যিক, গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তিত্ব বলে কিছু থাকে না? তাঁরা কেবল মনোরঞ্জন করতেই শিল্পী হয়েছেন না নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোঁড়াদের গন্ডী ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন বা তাঁদের সমতুল্য নেই বলে এই রাগ ঘৃণা, বিদ্বেষ?

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে আমার বইয়ের ছবি হচ্ছে না কেন? উত্তরে জানতে চাই, কে করবেন? হিন্দু পরিচালকরা তো মুসলিম চরিত্রের রূপ দিতে ভয় পান, যদি কোন কিছু ঘটে যায় তো রে রে কান্ড বেধে যাবে। আর ঈর্ষাকাতর গন্ডিবদ্ধ কিছু একপেশে সাহিত্যিক, সমালোচক সেজে ভীমরুলের চাকে ঢিল মেরে দেবেন, অতএব ও পাড়া দিয়ে আর পথ নয়।

মানুষ যতই দীলদার এবং আধুনিক হ'ন, পাগলা কুকুরের কামড়কে কে না ভয় করেন?

আবার গোড়ার কথার পোঁ ধরি—(শানাইয়ের যেমন পোঁ ধরে থাকতে হয়)। ধরুন, আপনার বাড়ির আবহাওয়া আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার আলোয় খানিকটা ভাস্বত। হারমনিয়াম বাজে। মেয়ে গান শেখে। অবশ্য শিক্ষিকার কাছে, কেন না 'খানিকটা আধুনিক' বলেছি। শিক্ষক রেখে মেয়েকে গান শেখালে বিশেষ করে হিন্দু শিক্ষক

তবে তো আপনি হিন্দু হয়েই গেছেন। আর সেই মেয়ে যদি একবার রেডিও অফিসে যায় বা টিভিতে দর্শন দেয়, বেপর্দা এই কন্যার জাহান্নাম কামনা করবেন সাধারণ মুসলমানরা। রেডিও টিভির লোকরা কেউ কেউ উদারতার কথা (ভান নয় তো?) বলেন, 'আমরা তো মুসলমান গায়ক-গায়িকাদের জন্যে বসে আছি কিন্তু আসে কই? আর যারা আসে তারা অডিশনে কেউ তো পাশ করতে পারে না?'

ঢাকায় পাশ করে কি করে?—সেখানে রেওয়াজ আছে। এখানে রেওয়াজ করলে পাশের বাড়ির মৌলবীর নামাজের ব্যাঘাত হয়। তাতে গোনাহ্ হয় পাহাড় সমান।...

কিন্তু এত বাধা সত্ত্বে কি মসজিদে মাইক আনা, বাড়িতে রেডিও টিভি বসানো বন্ধ করা গেছে। হিন্দু মালিকানায় প্রচারিত দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা বইপুস্তক পড়া বন্ধ করা গেছে কি?

আমাদের লেখা কি মুসলমানরা পড়েন না?

যাঁরা শিক্ষিত আধুনিক মানুষ হতে চান তাঁদের সামনে লড়াই সগোত্রের বিরুদ্ধে যেমন, তেমনি সাম্প্রদায়িক হীনমন্য কিছু বাইরের লোকদের বিরুদ্ধেও।

তাহলে কত বছর পরে পর্দায় আমরা দেখাতে পাব একজন পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলিম নায়িকাকে?

ঢাকা থেকে কাউকে আমদানী করলে অবশ্য আমরা হাততালী দেবো, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই। দুজনেই বে-ওয়াকুফ।

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি

কোমর আঁকড়েছে তো যাও ঋষি গোস্বামীর কাছে, কঞ্চিপড়া করে ব্যথা ছাড়িয়ে দেবে। কঞ্চি কেটে এনে তাতে মন্তর ক্ষ্যাপনা করে ঋষি ঠাকুর গাঁজার কলকেয় দম্ মারার পর চেরা কঞ্চিটা এমন নিচু করে ধরবে যে তুমি বাবারে বাবারে করে উবু হয়ে যেতে যেতেই আপসে কোমর আঁকড়ানি ছেড়ে যাবে। গ্রামে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা চাচা মামা দাদা কাকার সম্পর্ক থাকে। যদি ঠাট্টা তামাসার পাত্র হও তো ঠাকুর বিড়বিড় করে বলতে থাকবে ঃ 'কোমরের আর দোষ কি? পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বা ষাটের মধ্যে এটা হয় রাত্রে একটু বেশি শরীরচর্চা করলে।'

যাদের দুটো চারটে বউ ছিল তারা তাহলে আগে এত লড়াই করত কি করে? তিনশ' বিবি চারশ' বাঁদি (বাঁদীও চল ছিল) নিয়ে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হাওয়ায় তক্তা ভাসিয়ে উড়ে বেড়িয়ে দুনিয়া শাসন করতেন, ষাট হাজার সন্তান ছিল সগর রাজার। শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য গোপিনীর সঙ্গে বিহার করতেন, এঁদের কারো কোমরের ব্যথার কথা কোথাও পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে অভিহিত ফুলের মত নারীদের বিকি-কিনি করতে গিয়ে কত বাদশা-নবাবই ফতুর হয়ে গেছেন, মধ্যপ্রদেশের শক্তির অভাব তাঁদের হয়নি কারণ তাঁদের ভোগ্য বস্তুর মধ্যে ছিল দুধ-ঘি-মাখন-ডিম-মধু সারা বৎসর বহু কিছু। একালে সরকার যখন জন্ম নিয়ন্ত্রণে লক্ষ লক্ষ টাকা ঢেলেও হালে পানি পাচ্ছেন না তখন দিব্যি আরামে আল্লার ইচ্ছায় ৬৪টা সন্তান উৎপাদন করেছেন এক ধর্মপ্রাণ পীর হুজুর।

.....

দারিদ্র্য আর ঝালঝাড়া রিজেক্ট পচা গলা খাদ্যেই রোগের আমদানি হয়। গরিব মানুষরা নিচুমানের অখাদ্য খেয়ে পেটের রোগে ভোগে বেশি। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমরা দেখেছি কলেরা-বসন্তে গ্রামকে গ্রাম উজার হয়ে মানুষ মরত। খাজে খতম করে গ্রাম বন্ধ করতেন কোনো মস্তান মৌলবী, সরা পড়ে তাতে কলমা-দরুদ লিখে লোকের দোরে দোরে টাঙিয়ে দিতেন, গ্রামের চারকোণে নিশান পুঁততেন 'ওবা'য় ভর-করা-তেরহাত কাফ্‌ন-গেলা লাশ তুলতেন কোন অসতী যুবতীর কবর খুঁড়ে মাঝ রাতে। টায়ফয়েড, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়াতেও তখন কত মানুষ মরত। টিউবওয়েল বসার পর অনেক রোগ চলে গেল। আধুনিক ওষুধপত্রের আমদানি হ'ল।

উজড়ি, পচা সেলেমাছ, পচা চিংড়ি, নোনা ইলিশ, শুক্‌কি মাছ, গলা-আম, কাঁঠাল,

দাগি পচা আনাজ, বাসি পান্তাভাত বা তরকারি, ঝাল-পিঁয়াজ-রসুন ঠাসা চর্বিদার মাংস —এসব খেয়ে আগের লোকরা পেটের রোগে ভুগতে থাকলে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার হীরাপুর গ্রামে মা মনসার থানে পেটে বাতি পোড়ার ছ্যাঁকা দিতে যেত। পিলে-ন্যাবায় পেট গাম্বিস হয়ে গেছে। বামন আঁটি গাছের কাঁটি কেটে মন্তর পড়ে গলায় দিত। মোচায় ঝাঁটা কাঠি গাঁতত মন্তর পড়ে অথবা সুতোয় লেবু বেঁধে আগুনে পোড়াত। সবচেয়ে মারাত্মক কান্ড ছিল পেটে তিন সারিতে ছ'টা দাগ দেওয়া। ২৪পরগণার বিষ্ণুপুর থানার পরাশর গ্রামে দাগ দেওয়াদের বাড়ি যেতে হত। 'গইলে' (গোয়ালে) ফেলে তারা রাংচিতার পাতা বাটা বসিয়ে দিত স-পাঁচ পয়সা নিয়ে। পেটজোড়া পোড়া দাগ হয়ে যেত চিরকালের জন্য। মেয়ের গর্ভ থেকে জারজ সন্তান নিপাত করার জন্য রাংচিতার ডাঁটার মাথায় আফিমের পুঁটুলি বেঁধে গর্ভথলির মধ্যে গুজে দিত কোন বুড়ি। গুয়েপেত্নি হয়ে যেত শরীর! আজও এসব আছে, গ্রামে, মেয়েরা গোপনে করে এসব, কেননা শতকরা শিক্ষার হার এখনও মাত্র পঁয়ত্রিশ। পয়ষট্টি ভাগ যাদের অন্ধকারে ডুবে আছে তাদের সভ্যতা বা গণতান্ত্রিক ভোটের বলের অধিকার নিয়ে রাজত্ব-করা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেব-দেবতাদের মতই। আজও তাগা, তাবিজ, মাদুলি, পাথর, ঘোড়ার নাল, জলপড়া, পানি-পড়া, ভূত ছাড়ানো, ওঝাগিরিতে দেশ ছেয়ে আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর এলাকার জনৈক ব্যক্তি ভূত ছাড়িয়ে বেশ পশার জমিয়েছেন। কত বউ আসে ভূত ছাড়াতে তাদের বোকা স্বামী শাশুড়ীকে নিয়ে— পৈশাচিক কীর্তিকলাপের ফলে টাকা বেরোয় আর ভূত ছেড়ে যায়। কত মৌলবী স্বামীকে বশ করার দোয়া তাবিজ দিচ্ছেন। কলকাতার বলাই দত্ত স্ট্রীটের উর্দু লিথো প্রেস থেকে আরবী সূরা ছেপে নিয়ে গিয়ে খাস আরব থেকে ছাপা বলে কত মৌলবী দোয়া তাবিজ বেচে সর্বরোগ, ভূত-জিন-বাও-বাতাস-লাগা ভাল করে দিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। আর পীরেদেব তেল-পড়া পানি-পড়া দেওয়ার তো কথাই নেই। এসব না করলে প্রতি গ্রামেই তো একটা করে হাসপাতাল গড়তে হত আমাদের।

মিশরেও অমুক গাজি বাবার হাড় থেকে গাঁথা মালা বিক্রি হচ্ছে। আরব থেকে জমজম কূপের পানি আর এক ধরণের মরুগুল্ম আনা হয় হজের সময়, যদি পোয়াতির প্রসবের কালে খুব কষ্ট হয় তবে ফতোয়া দেওয়া ঐ পবিত্র ফুলটা পবিত্রতম পানিতে ডুবিয়ে রাখো, জ্যান্ত হয়ে ফুটে উঠলেই আল্লার কুদরতে সন্তান ভুমিষ্ঠ হয়ে যাবে। আসলে (ধৈর্য ধারণে?) মরুকুসুম পানি পেলে ফুটবে এটাতেই চমৎকারিত্ব।

খ্রীষ্টান-হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়েরই কিছু লোক ধর্মের নাম করে নানান আধিভৌতিক আধিদৈবিক কান্ড করে দুনিয়া জুড়ে 'মুর্খের স্বর্গে' বাস করছেন। আধুনিক শিক্ষিত লোকরাও আছেন কেউ কেউ এদের দলে বোকা মূর্খদের ভাঙ্গিয়ে খাবার

জন্যে।

'আপনি যে মেটে সিঁদুর বার করলেন, এটা চলবে তো?' উত্ত্র 'কেন, দেশে কি একলক্ষ বোকা নেই?' যদি থাকে উত্তর ব্যবসাটা ভালই চলে যাবে। অনেক ব্যবসার মূলধন কিন্তু বোকারাই। তবে ব্যবসায়ীকে অবশ্যই মা কালীর ভক্ত বা আল্লাতাল্লার কাছে হাঁটুগাড়া মিষ্টভাষী চুপি শয়তান হতে হবে।

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী নিয়ে যদি একটা অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বর্ণসম্প্রদায়ের জন্যই শুধু কিছু বই-কেতাব লিখি। তাদের সবকিছুতে দরদ দেখিয়ে বেদনায় বেদানার মত ফেটে পড়ি আর লোক দেখানো ধর্ম করি, ধর্মীয় পোশাকে নিজেকে ঢেকে রাখি তবে তো তাদের মধ্যে অল্পদিনেই অমর হয়ে যাব। আর কিছু শিষ্য জুটিয়ে তাদের দ্বারা নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে জেলায় জেলায় নিজেই নিজের মানপত্র লিখে সভা-সমিতি করে মাসে মাসে যদি মালা পরি তবে তো আমিই একমাত্র ট্রেডমার্ক আল্লার এজেন্ট।.......

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবো নাকো তুমি'—যে যা খুশি এখানে করতে পারে। গণতান্ত্রিক অধিকার আছে আমাদের। অন্য লোককে কি করে ঠকাব, বোকা বানাব, চাকর বাকরদের খাটিয়ে নাকসে দম্ করে কম মাইনে দিয়ে বলব, ধৈর্য ধরো, সংযমী হও কেন না, আল্লা বলেছেন, ধৈর্যশীল আর সংযমীরা পরকালে উত্তম পুরস্কার পাবে। জালিয়াতি করা, সত্য গোপনে রাখা ছেলেবেলা থেকে নয়, মায়ের পেটে থাকতে থাকতেই আমরা শিখি। কিন্তু মা ঘুমিয়ে পড়েন উত্তরার মতই, সপ্তরথীর চক্রব্যূহ ভেদ করার কথা আর শোনা হয় না—তাই বারে বারে অভিমন্যুর অকালমৃত্যু ঘটে যায়।

চালাকি দিয়ে মহৎকাজ করা যায় না। দু-চারদিন মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া যায়। তারপর সোনালী নিকেল উঠে গেলে ভেতরের পেতল বেরিয়ে পড়ে।

ধর্মসম্প্রদায়ের পুরনো জ্ঞান, বিজ্ঞানের দ্বারা যাচাই হলে আজ অনেক ক্ষেত্রেই পেতল বেরিয়ে পড়ে (ধর্ম বলছে 'আকাশ একটা ছাদ!') কিন্তু যেহেতু অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিতের দল এখনও বেশ ভারি তাই বিপদের ভয়ে সত্যকে আমরা এড়িয়ে যাই। আর ভীতু বিজ্ঞানীরও অভাব নেই কেন না এই সমাজেই তাঁদের বাস করতে হয়।

অসার জেনেও বহুলোক যদি একটা জিনিষকে 'বিধিপ্রদত্ত' বলে মানতে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে কিছু বলাও অগণতান্ত্রিক।

কাশ্মীরে অপূর্ব সুন্দর অনেক নারী পুরুষের শরীর বসন্ত রোগে বিকৃত হয়ে যেতে দেখেছি, তাদের টিকা নেবার কথা বললে অবিশ্বাসের বাঁকা হাসি হাসে। এই হাসির পেছনে কোন মৌলবী ওঁৎ পেতে বসে আছেন। যিনি বলেন, 'রোগ দেওয়া আর

নীরোগ রাখা সবই আল্লার হাত!' অবশ্য এম-এ পর্যন্ত ফ্রি এডুকেশন হওয়াতে কাশ্মীরে ঘরে ঘরে এখন উচ্চশিক্ষিত—দারিদ্র্যও তাদের মধ্যে থেকে দূরে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে। ধর্মসংস্কার একাজ করতে পারেনি। ধর্ম এসেছিল মানুষের ভালই করতে কিন্তু মন্দ মানুষের থলির মধ্যে ঢুকে এখন হয়েছে তা নীরব নারায়ণ শিলা!

পশ্চিমবাংলার দরিদ্র তপশিলী, উপজাতীয় লোকদের মধ্যে এখনো নানান কুসংস্কার ছড়িয়ে রয়েছে। অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এখনো অনেক পীর মৌলবী ভূত ছাড়িয়েও বা তাড়িয়ে জিন ভাগিয়ে রুপোর খড়ম পায়ে দিয়ে সংসারের সাগর পাড়ি দিচ্ছেন। তাঁরা আধুনিক শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে, কারণ সাধারণ মানুষের সত্যি মিথ্যা যাচাইয়ের চোখ ফুটে গেলে, 'গায়েবি'বা অপ্রমাণিত 'অদৃশ্যে' বিশ্বাস না করলে, অনেকেরই ভাতভিৎ উঠে যাবে।

কোন লোকের পেটে দাগ, আঁকা বা কপাল পোড়ানো দেখলে আমাদের আদিকালের ইতি বৃত্তান্ত মনে পড়ে কিন্তু উচ্চশিক্ষিত লোকরাও যখন প্রাচীন তত্ত্বে আধুনিকীকরণ করে মাদুলি পাথর ধারণ করেন, শতনাম জপেন, সন্দেহ হয় পেছনে তাঁর বুচকি বাঁধার 'আখেরাৎ' আছে। ইচ্ছে হয় ভস্মে মেখে বাঘছাল পরে আর একজন শিব হই, কেন না সামনে আমাদের অনেক গাজন। আর তারা সাধুত্বের ভাবমূর্তিটা এখনো পসন্দ করে।

হলে বাঁশ ম'লে বাঁশ

গ্রামের মানুষের সঙ্গে বাঁশের সম্পর্ক মামাতো পিসতুতো ভায়ের চাইতেও বেশি। গোটা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আপনাকে কেউ মারবে তো বাঁশের লাঠি নিয়ে ছুটলেন। কথায় বলে, 'হলে বাঁশ, ম'লে বাঁশ'। তার মানে বাচ্চা হলেই বাঁশের চ্যারাটি দিয়ে তার নাড়ী কাটা হত আগে। আর মরলে চাই বাঁশের খাটুলি। আবার মুসলমান হলে তো কবরের ভেতর পর্যন্ত ধাওয়া করবে বাঁশ। বাঁশের 'পাড়ন', 'এড়ো' দিতে হবে কবরের মুখে। বেশি নেক্কার বান্দা হলে মৃতের বুকের ওপরে বাঁশের ঝাড় গজিয়ে গ্রাম সমাজের 'ষোল আনা'র সেবায় লাগাতেও পারে।

চাষী বাড়িতে বাঁশের অর্থনৈতিক মূল্য অনেক। চার পাশের কাজে কামে সর্বক্ষণ বাঁশের দরকার। এক ঝাড় দু'ঝাড় বাঁশ আপনার থাকা চাইই। বিশেষ করে ২৪ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুরে। ২৪ পরগণাতেই বাঁশের সংখ্যা সব চাইতে বেশি। বলা যায় বাঁশ নারকেল সুপারির বলের মধ্যে বাস করে এখানের লোকেরা।

বাঁশের দাম এখন আগুন।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে অর্থাৎ স্বাধীনতার সময় ছিল একশো টাকা শ', এখন সেই দাম উঠেছে বারোশ' টাকায়। কিন্তু ঘরবাড়ি করার জন্যে ২৪ পরগণাতেই আপনি সহজে পাকা 'তিন সুনে বাঁশ' পাবেন না। চার পাঁচ সুনে তো দূরের কথা। প্রতিদিন গ্রাম লক্ষ লক্ষ বাঁশ দিচ্ছে শহরকে। শহরের ধনকুবেরদের ইমারত গড়ে উঠছে। অট্টালিকার বাইরে তো বাঁশের ভারা খাড়া করতেই হবে। নইলে রাজমিস্ত্রিরা উঠবে কি বেয়ে? শহরের বাঁশের আড়তদাররা মেলা টাকার লোভ দেখিয়ে গ্রামের গরিবদের কাঁচা একসন দু'সনের বাঁশ নিয়ে যাচ্ছেন গাড়ি গাড়ি। আর সর্বনাশটা হচ্ছে গরিব চাষীর। ঝাড়ের বারোটা বেজে যাচ্ছে। একসন বা দু'সনের বাঁশের তেউড় বেরুবে, কাটলে আর তার গোড়া থেকে কঞ্চি হতে পারে, তেউড় গজাবে না। তিন সন পার হলে তবে বাঁশ পেকে যায়। তাতে লাদনা, খুঁটি, ডাঁসা,পাড়, সরদাল করলে ঘুণ লাগবে না। সহজে নষ্টও হবে না। অক্লেশে পঞ্চাশ বছর কেটে যাবে। শুধু কেটে 'গাঁট মেরে' 'দলে-মলে' পচিয়ে নিলেই হবে। আর আলকাতরা মাখিয়ে দিলে তা বহুৎ আচ্ছা!

ডোমেরা আজকাল কাটারী হাতে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়, কঞ্চি পায়

না। কাঁচা বাঁশ বিক্রি হয়ে গেলে কঞ্চি কি পাকা বাঁশে গজাবে? আর পাকা বাঁশ ঝাড়ে থাকলে তো! বেশি কঞ্চি কাটলে ঝড় এলেই ঝাড় পড়ে ছত্রখান হয়ে যাবে। তবুও ডোমেদের কারবার বন্ধ আছে কি? একপণ কঞ্চির দাম এখন পনেরো টাকা। ঝাড়ে উঠে বেছে বেছে কেটে নেবে। এই কঞ্চি থেকে হবে ঝোঁড়া, ঝাঁকা, বাজরা, চুব্‌ড়ি। আর বাঁশ থেকে হবে কুলো, চ্যাঙারি, ধুচুনি। দরমা। ছ্যাঁচা।

তিয়োররা বাঁশ্‌নি বা তল্‌তা বাঁশ থেকে বানায় ঘুনি, আটল, মগ্‌রি, পোলো, ডোল. খালুই —নানান কিছু মাছ-ধরা রাখার জিনিস।

বাঁশ থেকে হয় লাঠি, চৌকির ছড়, বা বর্শা, বল্লম, গাঁথা ডাণ্ডা, ছড়ি, ছিপ, বাঁশি। চাষী বাড়ির বেড়া, ছ্যাঁচা, মাটগুদাম, মাটির তক্তাপোষ, বেঞ্চি তো বাঁশ থেকে হয়ই। কঞ্চি পালা লাগে জড়ানো লতানে ফসলের গাছ তুলতে, ছাঁদলা বাঁধতে।

এক একজন বড় চাষী, যাঁদের অনেক জমি, দূরের জমি থেকে ফসল চুরি যায়— তাঁরা বাঁশ লাগিয়ে দেন আর বছরের দশ-বিশ হাজার টাকার বাঁশ বেচেন। কঞ্চির দাম বোঝা পিছু চার টাকা। এক 'বেং' (দুই হাত দু'দিকে প্রসারিত করলে যতদূর) হবে বোঝার দড়ি।

বাঁশের সমস্যা করছেন শহরের নির্দোষ ধনকুবেররা তাঁদের অজান্তে। তাঁদের ইমারত উঠবে বাঁশের দরকার। আড়তদার তিন-চার মাসের জন্য পাঁচশ' সাতশ' বাঁশের বায়না পেয়ে কন্ট্রাক্টরকে তা জোগান দিলেন। কাজ শেষ হলে বায়নার টাকার সঙ্গে আরও পঞ্চাশখানা নষ্ট হয়ে যাওয়া বাঁশের দাম উসুল করে নিলেন। সেজন্য তাড়াতাড়ি যাতে ভাঙে তেমন কচি একসনের মোটা বাঁশ নেন আড়তদাররা গাড়োয়ানদের কাছ থেকে। ফিতে ধরে যত মোটা হবে ততই পসন্দ আর দাম বেশি।

তো মোটা বাঁশ মানেই কাঁচা বাঁশ। তিন মাসের মধ্যেই যার মধ্যে ঘুণ অবশ্যই আসবে। কথায় বলে, কচি বয়সে ছেলের বিয়ে দিয়েছ, কাঁচা বাঁশে ঘুণ লাগবে।

গাড়োয়ান খদ্দেরকে বাঁশ বেচবে না—বিত্তবান চাষীরা একথা বলেন। তাঁরা বাঁশ বেচেন বছরে একবার শীত শেষে। ফাল্গুন-চোত-বোশেখের মধ্যে ঝাড়ের তলার শুকনো ঝড়া বাঁশ পাতায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে সেই ছাইয়ের ওপরে বাঁশের গোড়ার আশপাশ থেকে মাটি দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। আষাঢ়-শ্রাবণে তেউড় গজায়।

বাঁশের ঝাড়ে জল বসলে বা পাঁক ঢাললে সমস্ত বাঁশ 'কাক-মরা' হয়ে যাবে জটা ভেঙে পড়ে গিয়ে। কেন না রস বা বেশি তেজ পেয়ে বাঁশ হরদম বেড়ে গেলে আশ্বিন-কার্তিকের ঝড় সহ্য করতে না পেরে রসাল গাঁট থেকে খসে পড়বে। 'কাক-মরা' বাঁশের কঞ্চি হয় বিস্তর বড় বড়। বাঁশের চেয়ে সেইজন্যেই বলে কঞ্চি দড়।

গাড়োয়ান খদ্দের অভাবী-ঘর বুঝে এসে ধানাই পানাই করে আগাম টাকা গছিয়ে দিয়ে যায়। তারপর একদিন লোক এনে তিন কেজি ওজনের কাটারীর এক কোপে একটু উঁচু থেকে কাঁচা বাঁশ কেটে নিয়ে যায়। জটলাইও রাখে না। গাড়ি সাজাবার সময় ছেঁটে ফেলে আলাদা দামে বিক্রি করে। বাঁশ উঁচুতে তুলে কাটতে নেই। তাতে ঝাড় উঁচু হয়ে যায়। উঁচু হলেই বাঁশ রুগ্ন হবে আর তাড়াতাড়ি ঝাড় নষ্ট হয়ে যাবে।

২৪ পরগণায় যেসব বাঁশ জন্মায় তাদের মধ্যে ভেল্‌কো, গুঁড়ি ভেল্‌কো, বাঁশনি, তল্‌তা, জাওয়াই প্রধান। গুঁড়ি ভেল্‌কোই কাজের বাঁশ। খুব ফাঁপা মোটা বাঁশনী বাঁশ লাগে জেলেদের। ইলিশের জাল ভাসিয়ে রাখার জন্যে তিন-চার হাত করে টুকরো কাটে। দাম দেয় একখানা বাঁশে পনেরো টাকা।

আবার শহরের পেটি বাঁধার অর্ডার পায় কোনও কোনও কারবারি।

তালপাতার পাখায়ও লাগে বাঁশের কাঠি।

কত শত কাজে বাঁশ দরকার। শহরে গ্রামে বাঁশের দরকার। প্রধানমন্ত্রী আসবেন তো বাঁশ চাই। ঘিরে পথ তৈরি করতে হবে। নইলে মানুষ ঠেলাঠেলি করে সবাই প্রধানমন্ত্রীর পায়ের ধুলো নেবার জন্যে কোথায় প্রাণ খোয়াবে?

তাই বাঁশ দিয়ে রক্ষে করো লোকজনকে এবং প্রধানমন্ত্রীকেও।

বাঁশের মণ্ড থেকে কাগজ তৈরি না হলে কাগজের কারখানা বন্ধ। শ্রমিকদের হাঁড়ির তলায় কালি পড়বে না আর। কাগজ না পেলে লেখা হবে না। যে বাঁশের মণ্ড থেকে কাগজ হয় তার চাষ নেই ২৪ পরগণায়। এ সব আসে আসাম থেকে।

আর একটা সর্বনাশ। কলকাতার নিউ মার্কেটে যেখানে বাবু খদ্দের, তাঁরা যে বাঁশের কোঁড় পর্যন্ত খান এটা ক'জন চাষী জানেন? তাই বাঁশের কোঁড় চুরি যায়? গরিব মেয়ে যারা বুনো কচুর ডাঁটা, কলমী শাক, ভুষনো খাড়া ইত্যাদি বেচতে যায় শহরে, তারাই রাতের বেলা বাঁশের কোঁড় কেটে নিয়ে পালায়।

বাঁশ ফুলে গেলে বলে 'বংশী লোচন' হয়েছে। স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়লে নাকি হয় এটা, এরকম প্রবাদ। আসলে বাঁশে ফুল গজালে ঝাড় নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই ঝাড় আর রাখতে নেই।

কেউ বাঁশ দিতে চাইলেই জিজ্ঞেস করবেন, বাঁশের দাম জানেন কি? যাঁর বিশ ঝাড় আছে তাঁকে চাকরি করতে হয় না। বছরে তাঁর আধ লাখ টাকা আসে বাঁশ থেকেই। কেবল ঘরে বসে বংশরক্ষা করলেই হ'ল।

ভেজাল কারবার

কোনো জিনিস খাঁটি পাওয়া যায় একথা বললে নিঃসন্দেহ হয়ে সমর্থন করবার যুগ যেন পার হয়ে গেছে।

এখন হঠাৎ কোনো জিনিস যেমন সরষের তেল, দুধ, ঘি, মাখন, ওষুধ, আটা, ময়দা, এরারুট, বার্লি, বেসন, ছানা, গুড়োমশলা, সোনা, রুপো, ইস্পাত, কাঁসা, মধু, মদ, আফিম, তামাক, জর্দা, বিস্কুট,পাউরুটি, পাটালি, সাবান, ডিটারজেন্ট, নীল, সিঁদুর, রঙ, সেন্ট, ধূপ, গালা, সিল্ক ইত্যাদি সব জিনিসেই ভেজাল।

আপনি আমি বাবা মামা কাকা সবাই ঠকতে ঠকতে ঠকঠক করে চলেছি ভেজাল জিনিসে প্রতারিত হয়ে, বহুরকম রোগ নিয়ে মরণের দরবারে।

ভারতে শিশু খাদ্যেও ভেজাল? সে দেশে সূর্য ওঠে কি? বিদেশি আরবদের এই প্রশ্নে আমরা নির্লজ্জ হাসি হেসে বলি—ওঠে!...

গাঁয়ের বুড়ো বুড়িরা বলত, 'দুধে জল দিলে বাছুর মারা যায়'। লোকে বিশ্বাস করত সে কথা। কিন্তু এখন বললে বলবে, 'হাতি হয়! যে দুধ দুয়ে নেওয়া হল তাতে জল দিক আর যাই দিক বাছুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? কিন্তু কথাটা খতিয়ে দেখলে ভেতরের তত্ত্বটা বোঝা কঠিন নয়। যে গরুর দু-কেজি দুধ হয় তাতে যদি দু-কেজি জল মেশানো যায় হয় চার কেজি। মাল বাড়লেই টাকা বাড়ে। টাকা বাড়লেই লোভ বাড়ে। লোভ বাড়লেই গরুর পালান আরও শুকনো করা হয়। বাঁটে লাগলে গরু লাথি ছুঁড়বে। তখন তাকে মারা হয়। তার পা ছ্যাঁদা হয়। পালানে আর কিছু মাত্র দুধ না থাকাতে কোমলে বাছুর শুকিয়ে শুকিয়ে মারা যাবে। তাছাড়া ভেজাল মাল বেচার সময় খদ্দের অভিযোগ করলেও শতকোটি দিব্যি গেলে মিথ্যে কথা বলতে বলতে চরিত্রদোষ ঘটবে। দুধে জল ঢেলে পাকাবাড়ি করার পরিকল্পনা যার মনে পাকা হয়ে বসে সেই দুঁদে লোকটি দশ বছরেই অসামাজিকদের মধ্যে একজন পান্ডা হয়ে যায়। হচ্ছেও।

শিশুদের কোনোরকম মিষ্টি খাওয়ানো চলে না, মধু ছাড়া কিন্তু খাঁটি মধু পাওয়া খুবই কঠিন। মউলেরা মধুর সঙ্গে চিনি বা গুড় গোলা ডল মেশায়, অল্প দিনেই তা কেটে বা পচে যায়। ধরা পড়লে সে মউলেকে আপনি আর পাচ্ছেন কোথায়? এখন আবার মধুতে মেশানোর জন্যে একরকম ইমিটেশন পাউডার শহর কলকাতায় নাকি পাওয়া যায়—কিনে আনে মউলেরা। ভেজাল মধু চেনার উপায় নেই। সরষের

তেলের দাম যা থাকবে মধুর দামও তাই হবে--কাজেই একটায় ভেজাল হলে অন্যটাও ভেজাল হবে না কেন? আর নিষ্পাপ শিশু জন্মালেই তার মুখে যদি ভেজাল মধু তুলে দেন তবে সে কি খাঁটি হয়ে উঠবে আশা করেন?

গোয়ালারা যেসব ছানা ভাঁড়ে করে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি দোকানে দিয়ে আসে তার প্রায় সবটাই পাউডার থেকে তৈরি। সে পাউডার সোয়াবিনের অথবা ভিনদেশি, গরু ভেড়া অথবা শুয়োর গাধার।

খাঁটি সরষের তেল বলে পনেরো টাকায় যা কিনে আনলেন তাতে বেশিরভাগই রেপসিড মেশানো আছে। যে ঘানির মালিক ভেজাল তেল প্রমাণে হাজার টাকা জরিমানার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বোর্ড লটকে রেখেছেন তাঁর তেল ধরা পড়লে খাতাপত্র ফুড এ্যান্ড সাপ্লাইয়ের বাবু কড়কানি দিয়ে বগলদাবায় নিয়ে চলে যান কিন্তু ঘুষ দিলেই আবার সব মেঘ পরিষ্কার।

সরষের সঙ্গে শিয়ালকাঁটার বীজ মেশানো হয় একথা বলতে এক ঘানি মালিক বলেছিলেন 'বাজে কথা। কারণ শিয়ালকাঁটার দানা এক কেজি সংগ্রহ করতে যা মজুরি পড়বে তার চাইতে সরষের দাম অনেক কম।'

এক টাকা কেজি চাইলে যত চান পাড়া গাঁয়ের বেকার ছেলেমেয়েরা সংগ্রহ করে দেবে। বুনো জোয়ান তারা চোত-বোশেখ মাসের কাঠফাটা দুপুর রোদেও সংগ্রহ করছে দেখি, মাত্র এক টাকা কেজি দরে বেচার জন্যে। সর্দি গর্মি ধরে যায়। এত তেঁতুলবিচি বিক্রি হয় কেন? গুঁড়িয়ে আটার সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। তেঁতুল বিচির মাত্র আটআনা কেজি। আটায় মেশালেই দু-টাকা আশি পয়সা বা তিন টাকা। খেয়ে মানুষ আমাশয় পেট কনকন করে মরে মরুক।

এত বস্তা করমচা-বীজ পঁচাত্তর পয়সা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে কেন? করচার তেল দাহ্য পদার্থ, কেরোসিন আসার আগে গাঁয়ের গরিব মানুষরা পিদিমে পোড়াত, হু হু করে ধোঁয়া উড়ত, দুর্গন্ধ বেরুত। এই তেল এখন কি এমন ভেষজ-তেল হচ্ছে? সরষের তেল কিনে দু'দিন রাখলেই পচা দুর্গন্ধ বের হয় কেন? কড়ায় দিলেই ধোঁয়া উড়ে রান্নাঘর তো ঢেকে ফেলেই, বউরানীদের চোখও জ্বালিয়ে দেয়।

ভেজাল তেল পাকস্থলীতে যেতে থাকলে অম্ল হবে, অম্ল হলেই তার গরমে পিত্ত থলি গরম হয়ে হুড় হুড় করে পিত্ত পড়বে। তারপরেই সেই মানুষটার মাথা গরম হবে, ঝগড়া ঝাঁটি করবে। পাকা সর্দি তার লেগে থাকবে। আর সবচেয়ে মারাত্মক, ভেজাল তেল থেকে হার্টের ব্যামো হয় নাকি খুব তাড়াতাড়ি, ডাক্তারদের মতে সূর্যমুখীর তেল হার্টের পক্ষে ভাল। তার চাইতে ভাল তিলতেল কিন্তু খাঁটি তেলই পাওয়া যায় না, যদি না নিজে ভাঙ্গিয়ে তৈরী করা হয়।

স্বামীর আয়ু বাড়ানোর জন্যে এয়োস্তিরা চান করে এসে আধ ভিজে মাথায় সিঁথি কেটে যে সিঁদুর পরল দগদগে করে তার ভেজাল জিনিস চুলের লোমকূপ দিয়ে এবার ত্বকে মধ্যে ঢুকল। মাঝে মাঝে মাথা ধরতে লাগল। চোখে জল পড়তে শুরু করল। চুল উঠে যেতে লাগল। তারপর আপনার ভক্তিমতি পত্নী রত্নটি অল্পদিনেই পেত্নিতে পরিণত হ'ল।

'সবার উপরে ওষুধে ভেজাল এদেশে মারাত্মক ব্যবসা। ওষুধের দামও যেমন বেশি, লাভও। শোনা যায় পটাশিয়াম সায়নাইড বা আর্সেনিক খেয়েও মানুষ মরেনি। বিষেও ভেজাল ছিল। নইলে বেচারারা সত্যিই মারা পড়ত! পেটের রোগ সারাতে গিয়ে ওষুধ খেয়ে হয়তো আরও বেড়ে গেল। এসে গেল ভেদ বমি। চুলকোনার ওষুধ মেখে চুলকোতে চুলকোতে আপনি শেষ পর্যন্ত হয়তো জলে গিয়ে পড়লেন, হসন্তবাবুর বসন্ত দূর করতে গিয়ে চিরবসন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

যে ওষুধটার খুব নাম হয়েছে, কাজ হচ্ছে কিছুদিন পরেই তার থেকে সাবধান হতে হয় এদেশে। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। এদেশে যে জর্দা, সাবান, সিগারেট, ঘি, মাখন ইত্যাদির একটু নাম হয় দু-চার বছর পরেই তা খারাপ হয়ে যায়। নয়তো নকল বেরোয়।

নকল বা ভেজালে দেশ ছেয়ে গেছে।

এক ভদ্রলোক বললেন, 'এত দ্রুত যে এতসব পাকাবাড়ি গজাচ্ছে এটাতে বাইরে থেকে মনে হয় দেশটা তাড়াতাড়ি খুব উন্নতি করছে কিন্তু কি করে জানেন, ভেজাল মাল বেচে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি গজিয়েছে মানুষের। কিসের সঙ্গে কি ভেজাল দিলে একদম ধরা যাবে না বা ধরা পড়তে দেরি হবে এ বুদ্ধি দেবার লোকের অভাব নেই।

দ্রব্যে ভেজাল দেবার আগে মানুষের মনে বা বুদ্ধিতে দুর্বুদ্ধির ভেজাল হয়। চালে ডালে কাঁকর মেশানো হয়। যতটুকু মেশানো হয় তাতেই লাভ, ওজন তো কম হল না। রস মরে শুকোনোর ক্ষতিটা ঠেকানো গেল।

পুরনো কাঁসার ফুটো-ফাটা থালাবাটি বদল করতে গেছেন তো ঠকেছেন। অচেনা ফেরিঅলা ট্যাঁটারী নতুন চকচকে থালা-বাটি গেলাস এনেছে—দেখে আপনার লোভ হবেই। একদম নতুনের দাম বলল একশো তিরিশ টাকা কেজি। পুরনো ঝালাই করা বলল, নব্বই টাকা। আপনার খাঁটি কাঁসার অল্প ফুটো হওয়া থালার ওজন হলে আশি টাকা দামে সত্তর টাকার মাল হ'ল। একটি চকচকে সুন্দর বগি থালা দেখাল। ট্যাঁটারী বলল, 'এই থালাটি সম্মানী থালা। অতিথি এলে ভাত দিলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন।' আপনি সেটাই নিলেন, উল্টে আরও গোটা দশেক টাকা দিতে হল। আবার বাটি গেলাস আনতে বললেন। কিন্তু আর ঐ ট্যাঁটারী এ পাড়াতেই আসবে না। কারণ

মাত্র চারদিন পরে ঐ সম্মানী বগি থালার পালিশ উঠে গেলে চার পাঁচ জায়গায় কাটা-ফাটা বেরিয়ে তো পড়বেই উপরন্তু যতই মাজুন লাল হয়ে উঠবে।

আপনি সৎ থাকতে চান কিন্তু আপনাকে ঠকানোর জন্যে চারপাশের লোকরা ঘোড়ায় জিন দিয়ে বসে আছে। আপনার বাজারে যাওয়া অভ্যাস না থাকলে মাছ কিনতে গেলেই ঠকবেন। চকচকে পোনা বাড়ি এনে কাটতে গেলেই গলে যাবে। ওপরে বরফ মেরে চকচকে করা ছিল। ফুলকোতে রঙ দেওয়া। মাংস কিনলেন খাসির। দিল ছাগলের। কুকুরের দিলেই বা কি?

হোটেলে মুরগির স্টু খাচ্ছেন ওটা তো ব্যাঙের স্টু। মাংসের খুব নরম চপ কিন্তু তা তো ইঁদুরের মাংস থেকে তৈরী। পাঁপড় খাচ্ছেন তা তো দড়ি ধরে ঘাম-ঝরা শরীরে সারারাত নেচে নেচে মাড়িয়েছে কোনো মেড়ুয়া। তেঁতুল, খেঁজুর, সস্তা পাঁউরুটি, চকোলেট, বিস্কুট কোনটা মাড়ানো হয় না? সে সবের ভেতরে কতকিছু মিশেল আছে।

মাখন এনে গালিয়ে খাঁটি ঘি তৈরী করে নিতে গেলেন কিন্তু ধোঁয়া উড়তে উড়তে পুড়তে পুড়তে শেষ পর্যন্ত এতখানি কয়লার মতো কালো কাই পাওয়া গেল। কি ভেজাল দিয়েছে, কচু না কলা?

এত অল্প বয়সেই দাঁত গেল, চোখ গেল, মাথা ঘোরে, পড়ে যান, প্রেসার, ব্লাড সুগার, কিডনীর যন্ত্রণা?

সর্বরোগ আসছে খাদ্য থেকে অথবা সংক্রামিত হয়ে। অত করে জর্দা গিলছেন? জর্দার মধ্যে তা সুগন্ধি তেল। পিপারমেন্ট আছে, তামাক আর একাঙ্গি আছে—হার্টের রোগ আসবেই। — তার আগে আসবে অম্লরোগ। মাথা ধরবে। পেট পরিষ্কার হবে না। দাঁত চোখ চুল যেটা হোক যাবেই। তারপর একদিন হঠাৎ পথের মাঝে ঘুরে পড়বেন। তবু ঘুরতে ঘুরতে, পড়তে পড়তে, ঠকতে ঠকতে, আমরা বেঁচে আছি।

তবে কি আমরা দেশ ছেড়ে পালাব? তাহলে ভেজালদারদের দাপট, ইমারতখানা, বিলাস বৈভব দেখবে কে?

মানুষ বাড়লে গরিব বোকারাও বাড়বে আর ভেজাল কারবার অক্টোপাশের মতন হাত-পা ছড়াতে পারবে—তাই জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়িতেও ভেজাল। অতএব সাধু সাবধান।

ভাঁটার আগুন

কয়লার দাম বাড়ার ফলে ইট আর টালিখোলার দাম এমন বেড়ে গেছে যে গরিব নিম্নবিত্ত মানুষরা আর ঘর বাড়ি বাঁধতে পারবে না। এক টাকার টালি হঠাৎ দুটাকা হয়ে গেছে অর্থাৎ তামাপোড় এক নম্বর পিক্‌টি দুশো টাকা শ'। দু'নম্বর একশো পঁচাত্তর। তামাপোড় দেড়শ টাকা। ছোট ছোট টালি কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ তাদের মাল বেশি মজুত থাকে না। যাদের প্রচুর মাল মজুত ছিল কয়লার দাম বাড়তেই নতুন বাড়তি দামে তাদের মুনাফা হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ। নতুন দামে কয়লা আনার পর যে মাল পণ থেকে উঠল তার দাম কম করা যায় না। যে দাম পড়তা হ'ল শুনেই খদ্দেরের গাল হাঁ। পাশের বড় কারখানায় এলে তারা পুরনো গত বছরের খোলা কিছু কম দরে দিতে পারে। কাজেই ছোট কারখানায় এখন খদ্দের নেই। আর কুড়ি হাজার টাকা খরচ করে এক লরি কয়লা কেনার ক্ষমতা কটা ছোট কারখানারই বা আছে? তাছাড়া মালের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদলের মজুরি বাড়ানোর ধরণা লেগে গেছে।

কয়লার হোল্-সেলার রায়পুরের বিষ্ণু আদক বললেন, 'এবার ছোট ছোট টালি মালিকগুলি মারা পড়বে। এক নৌকা কয়লা কিনবে পুঁজি নেই। হুগলি নদীর ধার দিয়ে দুপারে যত টালি খোলার কারখানা আছে তার মধ্যে পুঁজিদার পার্টি আছে মাত্তর চার পাঁচটি। বাকি সব চুনোপুঁটি। ধারে কারবার। আমি আর ধারে মাল দিতে পারছি না। কারণ আমাকে পরের হপ্তায় কয়লা আনতে মেলা টাকা এখন বার করতে হয়। যে দু'হাজার টাকার কয়লা ধারে নেয় মাল বেচার পর আবার টাকা দেয়, সে হঠাৎ ওঠা বেশি দামে মাল বেচতে না পারলে চার হাজার টাকা দেবে কি করে? কিন্তু বড় কারবারির সে সমস্যা নেই। সে আগেই হয়ত দশ হাজার টাকা গছিয়ে রেখে যায়—আদক দা, কয়লা এলেই এক নৌকো পাঠিয়ে দেবেন। তাদের বিক্রি আছে ঠিকই। তবে সংখ্যায় অনেক কমে গেছে।'

আমন ধান ওঠার পর মাঘ মাস থেকে প্রতি হপ্তায় এক পাট করে মাটির দেয়াল গেঁথে চোত মাসের মধ্যে দের পাট দেয়াল শেষ হয়ে যায়। চোত-বোশেখের কাঠ ফাটা রোদে দেয়াল শুকনো হয়ে যাবার পর এবার লন্ডভন্ড কান্ড করে গাছপালার বীজ ঝরিয়ে সৃষ্টির আনন্দে যখন কালবোশেখী নামবে তার মুসলধারাকে না রুখলে শুকনো মাটির দেয়াল গলে ঝরে পড়বে। তাকে বাঁশের কাঠামোর ওপরে টালিখোলার

আচ্ছাদন দিয়ে রক্ষা করতে হবেই। মারমূর্তি কালবোশেখী সব পীরের হকিকত্ই ঠেলে দেবে। তাই খোলার কারখানার এখন মরসুম। চোত-বোশেখ-জষ্টি এই তিন মাসে হাজার হাজার টাকার খোলা বিক্রি। বর্ষায় একদম কাজ কারবার বন্ধ।

শীতকালের শেষে আমন ধান উঠে গেলে সাঁওতাল, মুন্ডা, কুলিরা আসে খাপান জুড়ে। চল্লিশটা কুমারী সাঁওতাল বা মুন্ডা মেয়ের এক একটা খাতা। বেশির ভাগ এরা ইটখোলার কারখানায় কাজ করে। বাস ভর্তি হয়ে ছুটির দিন বাজারে যায়। একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা মুখার্জি ইটখোলায় কাজ কর'?

মেয়েটি বলল, 'হাঁ বাবু'।

'রোজ কত পাও'।

'হপ্তায় সত্তর রুপেয়া'।

'তার মানে দিনে দশ টাকা। চলে কি করে? খাও কি? ডাল ভাত'? বলল, না বাবু, ডাল আমরা কিনতে পারি না। শাক, ভাত খাই — মাড় ভাত লঙ্কা খাই। কি করব গরিব লোক'।

'বিন্দিয়া নাম আছে, মেয়েটির। ভোঁতা নাক। গোল গোল চোখ। কিন্তু চেহারায় দুরন্ত যৌবন। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হয়ে গেছে তবু 'বিয়া হয় নাই কেন জানতে চাইলে বিন্দিয়া বলে, 'কে বিয়া করবে বাবু, বর যে আদমি হোবে তাকে গরু দিতে হবে। টাকা দিতে হবে। তোমাদের মেয়ের বাপ দেয় আমাদের ছেলের বাপকে দিতে হোবে। কেন না আমরা রোজগার করি। আমি দশবার বাংলা মুলুকে এলাম। ঐ আরও তিন বুন আছে।'

আশ্চর্য এক বুনের মুখের আদল ডাহা বাঙালির মতন!

'ম্যানেজার তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যাভার করে না?'

'খারাপ ব্যাভার করলে কি চলবে'?

'যে ঠিকেদার তোমাদের আনে তাকে তোমাদের রোজ থেকে কত দিতে হয়'?

'টাকামে দশ পয়সা'।

তার মানে ন' টাকা রোজ। সাত দিনে সাত টাকা। সপ্তায় একজনের কাছ থেকে সাত টাকা পেলে চল্লিশ জনের কাছে পায় দু'শো আশি টাকা। মাসে তাহলে এক হাজার একশ' কুড়ি টাকা। ঠিকেদার কোন কাজ করে না। কেবল মদ, তাড়ি খায় আর ম্যানেজার বাবুকে আমড়াগাছি করে। কুলি মেয়েদের বেশি কাজ করার জন্য ধমকায়।

আছিপুরের যদু মুখার্জির কারখানার ম্যানেজার গঙ্গাধর গাঙ্গুলী বলেন, 'এইসব খাটুন্তে মেয়েরা বাবা চরিত্রের দিক থেকে খুব শক্ত। একবার এক সাদা মাথার

অবাঙালির ঠিকেদার ওদের একটি মেয়ের সঙ্গে একটু আস্‌নাই মারতে যায়। সে মেয়েটি তখন তার খাতার সব মেয়েকে বলে দেয়। তারা এবার যুক্তি করে ইটের পাঁজার ওপরে অন্য অজুহাতে তাকে ডেকে এনে সবাই ঘিরে ধরে নাচ গান জুড়ে দেয়। তারপর বুড়োকে বিবস্ত্র করে কাপড় চোপড় বগল দাবায় নিয়ে সবাই নেমে আসে। বুড়ো তার পরদিন ভোরেই চম্পট'।.....

এই কাঠফাটা রোদে কালো চামড়ার মেয়ে-পুরুষেরা রোদে আগুনে পুড়ে ইটখোলা টালিখোলার কারখানায় কাজ করছে। তারা পেট ভরে দু'বেলা ডাল ভাতও খেতে পায় না। অথচ ঠিকেদার ম্যানেজারদের রোজ চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় জোটে। তাঁদের উপায় মেলা।

কেননা এটা কপালের দেশ। ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র। তীর্থবাবু বিশ লাখ টাকা ঢেলে রেখেছেন, দু'হাজার কুলি খাটাচ্ছেন, চারখানা লরি চলছে —তাঁর উপায় মাসে লাখ টাকা। (দিনে লাখ টাকা উপায়ের ব্যক্তিগত কারবার তো কতই রয়েছে)

তবে ক্ষয় ক্ষতি লোকসান নেই? হঠাৎ বৃষ্টি হলে লাখ টাকার মালের ক্ষতি হয়ে গেল? জলদাগী মালের দাম কত কমে যাবে। নানান দিকে মন্দিরে, মসজিদে, স্কুলমাদ্রাসায়, সাধুর আশ্রয়ে, পঞ্চায়েতের রাস্তায় ইট বিলোতে হয়। (পঞ্চায়েত বাবুরা নাকি পঞ্চানন। বিল করে দেন দয়াময় সরকারের কাছে। তাই অল্পদিনেই ভুঁড়িও গজিয়েছে নেয়াপাতি ডাবের মতন!) বছরে লাখ খানেক তো বটেই। আর ইনকাম ট্যাক্‌স আছে। আছে ওপরওলাদের খাতির করার খরচ খরচা। সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়াসহ নোটের তাড়া। মালিকদের দিকটাও ভেবে দেখতে হবে।

তবু ছত্রিশ বছর স্বাধীনতার অগ্রণী ভারতে বাবুরা বাবুই আছেন, কুলিরা আছে কুলিই। বরং বাবুদের দশটা ব্যাঙ্কে মজুত টাকার অঙ্ক অনেক বেড়েছে, বাড়ির বাহার খুলেছে লাট মন্ত্রী বা শিল্পপতিদের প্রাসাদোপম বাড়ির মতই।

গরিবের মাটির বাড়ির দেয়াল ধুয়ে পড়ে গেলেও কি টালির কারখানার মালিক তাকে ধারে মাল দেবে? একখানা মটকা এখন তিন টাকা, একটা টালি দু'টাকা? তাহলে কাটা বা আমা খোলা ছাড়া গতি নেই। আমা খোলা যা দু'বছর পরেই নোনা হয়ে ঝরে পড়ে যাবে। তাই কিনতে টাকা আনতে হয় সুদে। চারপাশের চটকলগুলোও এখন বন্ধ। এক টন পাটের দাম নাকি আঠারো হাজার টাকা। তৈরি বিক্রি মালের দাম তের হাজার টাকা। অতএব টনে পাঁচ হাজার টাকা লোকসান। তারপর পচা রদ্দি মাল বাইরে বিকোয় না। ছোট রুগ্ন শিল্পে প্রণব মুখার্জি টাকা দিয়ে কয়েকটা মিল কারখানা চালু করে গেলেও প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন। অতএব চটকল শ্রমিকদের যে সব ঘরবাড়ি তৈরী হয়েছে কোনোক্রমে, তার বাঁশ জুটলেও

টালি জুটত না।

আমাদের পাড়ার এক চটশ্রমিকের বউ কপালে হাত মেরে বলে, 'ভাইরে কল বন্দ, ঘর ফেঁদে মোরা কি বিপদে পড়নু বল্ না। দু'হাজার টাকার বাঁশ দেনায় লিয়ে রোজ তাগাদায় জ্বলে মরতিচি। তার ওপর আড়াই হাজার টাকার খোলা চাই। চটকলে কি বাজ পড়ল বল না? ঘরের 'দেল' যে ধুয়ে পড়ে যাবে, ভাবনায় রাতে মোটে চোখে নিদ্ আসে নে। যা টাকা সমবায়ের 'ব্যাঙ্কোয়' জমা করে ছেনু 'দেল' তুলতেই সব গেল। এখন মোরা খাই কি আর কোথায় বা মাথা গুজি'?

তবু পথ দিয়ে দেখি রিক্সা ভ্যানে করে চারটি চারটি টালি যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য সংসারের ধুলি কুড়ি সাফ করে এই টালি কেনা হয়েছে।

'কই, গোটা থানায় দেখছেন এ বছর কোন বড় বাড়ি গাঁথা হচ্ছে, যা হচ্ছে সব ছোট খাটো গোয়াল ঘর'। বললেন এক ইটখোলার ম্যানেজার। ভাল পিক্‌টি ইটের হাজার এখন সাতশ' টাকার ওপরে। তারপর লরি ভাড়া আছে। তার মানে মধ্যবিত্ত বাবুরা আর পাকাবাড়ি বাঁধতে পারছেন না। পাকাবাড়ির হার যেভাবে বাড়ছিল কয়লার দাম বাড়ার ফলে তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। তাই কালো বাজারীরাই এখনও সমাজের ওপরতলায় নমস্য হয়ে রইলেন। বড় কপাল তাঁদের। গণতান্ত্রিক দরিদ্র ভারত এখন ধনতান্ত্রিক কুবেরদের পায়ের তলায়।

হাতির দাঁতের পরী

প্রাচীন আইভরি শিল্প কি তুলে দেওয়া হবে? কালোবাজারী বা সাদা বাজারী করে স্বাধীন ভারতে এখন রাজা-বাদশা-নবাবরা ইতিহাসের অলঙ্কার হয়ে গেলেও কোটি টাকার শিল্পপতিদের অভাব নেই। রাজা-বাদশা-নবাবদের ইমারতখানা সাজানো হ'ত দেশ-বিদেশের দামী দামী আসবাবপত্রে। কাঠ, চামড়া, বাঘছাল, হরিণের শিং। কাচপাত্র, চিনেমাটির জিনিস, পাথর, সোনা-রুপো-তামা-পেতল, গালিচা তলোয়ার, বর্শা, ঢাল ইত্যাদির মধ্যে অবশ্যই হাতির দাঁতের শিল্পদ্রব্য থাকত। কিন্তু বিজ্ঞান এসে সেসব প্রাচীন বিলাস বৈভবকে ঝেঁটিয়ে তায়গির করে দিয়েছে। এনেছে ফোন, ফ্যান, ফ্রিজ, স্টিলের আলমারি, রেডিও, টিভি, বন্দুক, ঘড়ি, হিটার, ইলেকট্রিক আলো, পোট্রোম্যাক্স, কম্পিউটার, স্পঞ্জের গদি-বিছানা, ব্যাকেলাইটের টেবিল, ঘুরন্ত চেয়ার, নাইলনের মশারি, ওয়াটার প্রুফ, রেকর্ড প্লেয়ার, অ্যাকোর্ডিয়ান, গ্রামোফোন ডিসক্, টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট, ফিল্ম, ক্যামেরা, রিভলবার, মোটর, মোটর বাইক, সাইকেল, অণুবীক্ষণ, ডায়নামো, জেনারেটর, সেলাই মেশিন, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ইলেকট্রিক সেভিং বক্স, টি পট, শো কেস, ভ্যানিটি ব্যাস, অ্যাটাচি কেস, স্টিল ট্রাঙ্ক ইত্যাদি হাজার রকমের জিনিস। টিন বা কাচের পাত্রভরা কৃত্রিম কতরকমের খাবার। পেট্রোকেমিকেলের সুটপ্যান্ট।

আধুনিক জীবনযাত্রায় প্রাচীন সৌখিনতার সংমিশ্রণ অথবা প্রাচীনতার মধ্যে আধুনিকীকরণের দেশভক্তি কোনো কোনো ধনাঢ্য জাতিহিতৈষীর বাসগৃহের সাজ সরঞ্জাম হতে দেখা যাচ্ছে। বিষ্ণুপুরের মাটির ঘোড়া, জয়পুরের বালি মাটিরস কুঁজো বা কলসি, আসামের মোটা বেতের চেয়ার, ঝুড়ি, সোফা, বেতের শীতল পাটি, ঘাসের কাঠির মাদুর, খেজুর পাতার সৌখিন চাটাই, বাঘের ছালের আসন, কাঠখোদাই মূর্তি, ব্যাঙের মুখ, হরিণের শিং, হরিণের চামড়ার জুতো, খদ্দরের বস্ত্র, মেহগনি কাঠের আলমারি ভরা সাদা দুধের মতো হাতির দাঁতের পরী, তাজমহল, মঠ-মন্দির, বজরা, বেল কুঁড়ি, চিরুণি, রজনীগন্ধার ঝাড়, বাইশ দাঁড়ের দীর্ঘ ছিপ নৌকো, কানের ফুল, নাকের ফুল, হার, আংটি, আরও কত কি?

দেশ স্বাধীন হবার পরে দেশজ শিল্প যাতে বাঁচে তার জন্য কামার, কুমোর, জেলে, ছুতোর, মালি, জোলা-তাঁতি, মিস্ত্রি, দর্জি, মুচি, নিকিরি, তিয়োড়, ডোম, তেলি, বারুজীবী, কারুশিল্প, সবাইকে সরকারি সাহায্য দেবার ব্যবস্থা হল। পেলও কিছু কিছু।

প্রকাশক না-পাওয়া গণ কবিরাও কিছু কিছু খয়রাতি সাহায্য পেয়ে বই ছাপালেন পাঁচজনকে বিতরণ করার জন্য বরেণ্য ফ্রন্ট সরকারের করুণায়।

কিন্তু মুর্শিদাবাদের আইভরি শিল্পীরা এখন ধ্বংসের পথে। একসময় নবাবী আমলে আইভরি শিল্পের কদর ছিল। বর্তমানে হাতির দাঁতের শিল্প এমন দুরবস্থায় পড়ল কেন প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবীণ আইভরি শিল্পী গৌরচন্দ্র ভাস্কর বলেন, 'আগে আফ্রিকা আর আসাম থেকে হাতির দাঁত আমদানি হ'ত। এখন কেন্দ্রীয় সরকার আফ্রিকা থেকে আইভরি আমদানি বন্ধ করে দিয়েছেন। এছাড়া আগের পারমিট প্রথাও উঠে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার আর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি যদি আইভরি শিল্পীদের একটু সাহায্য করেন তবেই আমাদের বাঁচোয়া।...'

গৌরবাবুর হাতের অতি সৌখিন নক্শার আইভরি শিল্প শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর বহু দেশের বহু ধনপতি গণপতির প্রমোদভবনে স্থান পেয়েছে, রাষ্ট্রপতিও তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ সম্মানী দিয়ে নিজেকে ধন্য করেছেন, এসব হয় প্রাদেশিক রিপোর্টের ভিত্তিতেই (গৌরবাবুর ছবি এখনও বিক্রি হয়নি)। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কোন খামখেয়ালি বড়কর্তার কলমের এক খোঁচায় আফ্রিকা থেকে আইভরি আনা বন্ধ হয়ে গেল? তিনি কি জানেন আফ্রিকার জঙ্গলে হাতির দাঁত কেটে বেড়ানো আর ভারতের কত আইভরি শিল্পীর ভাতভিত যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন? এই ব্যবস্থা কি ব্যবসায়িক লোকসান রোধের নিমিত্ত তেনাকে করতে বাধ্য হতেই হয়েছে? অথবা তিনি কি দেশজ আইভরি শিল্পীকে বাঁচানোর জন্যে দেশজ আসামী হস্তীগুলো দন্তহীন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন? (আসামের হাতি তাড়া করেনি তো?)

আমদানী বন্ধ হলেই জিনিসের দাম আক্রা হয়ে যায়। বাদশা শাহাজাহান কিংবা নবাব সুজাউদ্দৌল্লা নেই যে হাজার রকম হাতির দাঁতের শিল্পকাজ নিয়ে দরবারে হাজির হবার পরোয়ানা জারী করলে গৌরবাবু গলবস্ত্র হয়ে 'হুজুর, মালের প্রচুর চড়া দাম — ট্যাকে কড়ি নেই' নিবেদন করলেই ঝনাৎ করে টাকার তোড়া পড়ে যাবে।

রাণীর পালঙ্কের পায়া হাতির দাঁতের করতেই হবে — নইলে তাঁর মাখন কোমল শরীরের উপযোগী দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা মানায় না। সেই পায়ার ওপরে সোনা পান্না চুনীর কারুকাজ। কজন রমণী (অবিবাহিতাকে রমণী বলা অপরাধ) এখন এমন সুখশয্যা পাচ্ছেন? আধা-কালো বা তামাটে রঙের বউরাণীরা এখন এয়ার কন্ডিশনের হিমঘরে হাপসে গিয়ে সাদা হয়ে যান বটে কিন্তু শাঁখ, শাঁকালু বা হাতির দাঁতের মতন শ্বেতাঙ্গিনী তাঁরা হতে পারেন না; হোক্ বসরা বা কাশ্মিরী মেয়ের মতো সুন্দরী, কিন্তু যৌবনবতীদের গলায় কি আইভরি হার সোনার হারের চাইতে আরও অনেক আকর্ষণীয় হবে না? কোমরে যেমন বিছে হার বা মেখলা ছিল আইভরি হারে তা শোভিত হলে

মন্দ কি? (গুড়ে বালি ফেলেছে প্লাস্টিক শিল্প)।

প্রবাদ আছে ঃ হাতি মরলেও লাখ টাকা, বাঁচলে লাখ টাকা। এখন অবশ্য লাখ টাকায় হাতি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ আছে। মরা হাতির হাড় থেকেও তো আসবাবপত্র হয় নইলে লাখ টাকা দাম হবে কেন? তেলে-জলে-তাপে শক্তিশালী বিশাল দেহী হাতি শত বছরের পরমায়ু পার করে তাদের হাড়গুলোকে এমন পাকা মজবুত আর নিরেট করে যে সে-হাড় বোধহয় হাজার বছরেও ক্ষয় না, ভাঙে না। বোধহয় বজ্রপাতেও তাকে ভস্ম করা কঠিন।

যে বাঘ বিরাটদেহ একটা 'মাঝের ভরা' বয়সের গরুকে এক ঝটকায় পিটে তুলে নিয়ে চোখের নিমিষে চম্পট দিতে পারে আর যার একটা থাবায় বীর পালোয়ান পর্যন্ত পরমায়ু হারায় তাকে হাতিমশায় যে দাঁত দুটি দিয়ে ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে গেঁথে ফেলে সেই দাঁত কত কঠিন! কঠিন না হলে হাতির সমস্ত শক্তির চাপ সে সহ্য করতে পারবেই বা কেন?

উৎকৃষ্টমানের হাতির দাঁত আফ্রিকাতেই জন্মায় কেন না সেখানের অরণ্য যেমন ভয়ঙ্কর তেমন বন্য জন্তুরাও প্রচন্ড রকম হিংস্র – তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাতিরও দাঁত তৈরি হয় আরও প্রচন্ড শক্তির। যত বয়স বাড়বে ততই মূল্যবান দাঁত পাওয়া যাবে। আসামের হাতি স্তুপাকার মেঘের মতো বড় হলেও বোধহয় দাঁত তেমন বড় হয় না। নাহলেও নেই-মামার চাইতে কানামামা ভাল। কিন্তু কানামামার ভাগ্নেরা যে, অনেক!

মুর্শিদাবাদের আইভরি শিল্পীর পেটে আজ ভাত নেই, পরণে নেই বস্ত্র। ছোটবেলা থেকে বাপ-ঠাকুরদার কাছে হাতির দাঁতে অস্ত্র ঘষতে ঘষতে যে যুবকটি এখন পাকা শিল্পী হয়ে উঠেছে মাল না পেলে, পারমিট প্রথা উঠে গেলে সে এখন কি কাজ করে খাবে? রিক্সা টানবে? না আম-কাঠাল বওয়া আধমরা ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাবে? এসব অবশ্যই গণতান্ত্রিক কাজ কিন্তু আইভরি শিল্প সৌখিন শিল্প বলে কি বিজ্ঞানভক্ত আধুনিক ধনকুবেরদের অনাদরে তাঁদের তোয়াজকারী বলে গরিবি মূলধনঅলা প্রদেশ সরকারের বঞ্চনা পাবে?

মুর্শিদাবাদ, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, ঢাকার নবাব আর দিল্লির সুলতানরা যেসব বংশ বিস্তার করে গেছেন তাঁদের এখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্যান্ট সার্ট পরে চাকরি করে বাঁচতে হচ্ছে, আইভরি শিল্প কেনার মতো রুচি থাকলেও সামর্থ্য বা আছে ক'জনের?

কলকাতার মতো বুড়ো শহরের ধনাঢ্য (অহংকারী) বাবু পাড়ায় কোটি কোটি টাকা ঢেলে যদি কোনো সৌখিন ব্যাওসায়ী শুধু মাত্র আইভরি শিল্পের দোকান খোলেন কৃত্রিম চাঁদের আলোয়, বহু রমণীর ভিড় জমবে।

পৃথিবীতে এখনো কেউ আইভরি শিল্পের বাড়ি বানায়নি — কোনো রসিক ধনকুবের তা করলে মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা বিশ বছর কাজ তো পায়ই উপরন্তু তাজমহলের সৌন্দর্যকেও হয়তো গো-টু হেল্ কার যায়।

দেশে-বিদেশে আইভরি শিল্পের কদর বাড়ানোর জন্যে এনিয়ে বড় বড় কাগজে লেখা বা কোনো বিখ্যাত উৎসব মেলায় প্রদর্শনীর আয়োজন করা, কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগী হওয়া, পারমিট প্রথা চালু করা, আফ্রিকা থেকে আইভরি আনা, ব্যাঙ্কগুলির লোন দেওয়া—এসব আশুকর্তব্য কর্মগুলি না করলে আইভরি শিল্প এবং শিল্পীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় বা প্রদেশের কোনো মন্ত্রী মহোদয়ের আত্মীয়স্বজন কেউ কল নাড়া দিলে অচিরেই করুণার বারি ঝরতে থাকবে।

আমাদের মনে হয় আইভরি শিল্পীরা শুধু শিল্পীরই জাত, তাঁরা কোনোকালেই তেমন বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী নন। তা হতে পারলে নবাব বাদশাদের আমলে একখানা আইভরি কুঁড়ি বেল ফুলের মালা মুক্তোর মালার মতো বহু টাকায় বিক্রি করতে পারতেন। বেগম রাণীদের চুলের খোঁপায় জড়ালে তা মনোলোভা লাগত।

কিন্তু আইভরি শিল্পীরা সত্যনিষ্ঠ মানবতাবাদী সাহিত্যিক কবি, পোটো বা বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মতোই, নিজেদের পারিশ্রমিক অন্যের দয়ার ওপর নির্ভর করে, যাঁরা তাঁদের নিয়ে ব্যবসা করে ধনকুবের হন।

কোনো কোনো সোনার দোকানে অথবা লাক্সারী শপে আইভরি শিল্প পাওয়া যায়। তাই তাঁদের কাছে এসব নিয়ে গেলে তাঁরা দেড়চোখে তাকিয়ে বলেন, মশায় আপনাদের জিনিসের চাহিদা নেই, ক'জন মানুষ আর এর কদর বোঝে, শতকরা নিরেনব্বইজনই তো হাটের গাজন। ধৈর্য্য ধরে অনেককাল ব্যয় করে অনেক পরিশ্রমে যেসব আইভরি শিল্প আনেন তা ফিরিয়ে দিয়ে আপনাদের বিমুখ করতে মনের মধ্যে সত্যিই একটা ইরিটেশন হয়। এনেছেন, দিয়ে যান, দোকানে সাজিয়ে রাখি, বিক্রি হলে, পয়সা পাবেন। প্লাসটিকের নকল আইভরি শিল্পের তো এখন ছড়াছড়ি। সবাই এখন এক দিন কা সুলতান।....

কিন্তু পেট চলে না যে আইভরি শিল্পীর তিনি কি করবেন? অনেকক্ষন বসে থেকে ধুলো ঝাড়ার পর হয়তো অর্ধেক দামে মাল বেচে চাল কিনে নিয়ে ঘরে ফিরতে হয়। ফিরতে ফিরতে কোনো ধেনো ব্যবসায়ী তাকে সমাজের নিম্নবিত্ত হীনব্যক্তি বলে ধাক্কা মারতেও পারে।

তবু বলি শিল্পীদের মর্যাদা জাগ্রত দেশের শিল্পপতিদের বুঝতে হবে—যেমন বুঝেছিলেন এক মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ী—একই ট্রেনে যাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রবিবাবুকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন মাড়োয়াড়, 'বাবুজীর কি কাম-কারবার আছে?

রবিবাবু সবিনয়ে বললেন, 'অতি সামান্য কাজ। লিখি। আমার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' মাড়োয়ার ব্যবসায়ীটি বললেন, 'তাই বলেন, চেহারাতেই মালুম হয়ে গেছে। তা বাবু আপনার ব্যাওসাই বড় ব্যাওসা, দু-আনার এক দিস্তা কাগজ কিনে লিয়ে তাতে 'গীতাঞ্জলী' কিংবা 'সোনার তরী' লিখে দিলেন—তো ওভি সোনাতরী হয়ে গেল।'...

গৌরচন্দ্র ভাস্করের যে শ্রেষ্ঠ আইভরি শিল্প লণ্ডন নিউইয়র্কের মিউজিয়মে বা ধনকুবেরদের বিলাসভবনে ঠাঁই পেয়েছে তার অমরতা লাভ হবে বহু বহু যুগ, কিন্তু গৌরবাবুর বংশধরদের এখন বাঁচাবে কে?

ভিখারী ডিপো

হজযাত্রীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করা হয় লটারির সাহায্যে আর স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হয় যখন তখন কোন জাদুমন্ত্রবলে জানি না মুর্শিদাবাদের একটা গ্রাম থেকে বেশ কিছু সংখ্যক পেশাদার খোঁড়া, ন্যাংড়া, কানা, অন্ধ বিকৃত দর্শন ভিখারিকে পাঠানো হয়। এইসব প্রতিবন্ধীরা হজ করতে যায় না। যায় ভিক্ষা করতে। আরবে গিয়ে এরা গায়ে-চোখে-মুখে-পায়ে-হাতে দগদগে নকল ঘা তৈরী করে নেয়। বাজারে বা পথের পাশে বসে দোয়ারকী চালে সদলবলে দম মেরে মেরে আল্লা-রসুলকে ডাকে আর বুক চাপড়ে কেঁদে মাতম্ জারি করে। আরবের ধনকুবেরারা ধর্মীয় নির্দেশে দান-খয়রাতের দ্বারা অক্ষয় পুণ্য লাভ করার জন্য ভিড় করেন আর ভাবেন অসীম শক্তিমান আল্লা ইচ্ছা করলে মানুষকে কিরকম জঘন্য চেহারার করে দিতে পারেন আর করেন কেবল ভারতীয় মুসলমানদেরই।

কি অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষ—যাঁতা বা সীলের মতো চেহারা—হাত পা বেরিয়েছে তা থেকে এতটুকু টুকু আর বিকৃত বড় মাথা কিন্তু তা হলে কি হয়—কণ্ঠস্বর বা জেহেন্ তার আল্লার আরশ কাঁপিয়ে দেয়—আর সেই সামান্য ব্যক্তিটি রাজপথের ওপর দিয়ে ডিশ হাতে ঠেলে গড়াতে গড়াতে যখন এগোতে থাকে তখন গাড়ি ঘোড়া বন্ধ হয়ে গিয়ে অসামান্য ব্যক্তি হয়ে ওঠে। আল আরব, আল্ মদিনা বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় তার ছবি উঠে যায়!

ভারত ভিখারির দেশ। আহা এদের দান করো। এক একজন ভারতীয় ভিখারী হাজার বিশেক রিয়েল উপায় করে। পাঁচটা ভিখারী যে বড় হাজী সাহেব আমদানি করতে পারেন তিনি তো এক মরসুমেই বড়লোক। প্রতিবন্ধীটিকে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে পারিশ্রমিকের এক দশমাংশ দিলেই হ'ল। তার থেকে প্রতিবন্ধীর বাহক বা বউ ছেলে-মেয়ের খরচা বা হজযাত্রার অন্যান্য খরচা আছে।

ভারতীয় বিকলাঙ্গ ভিখারিদের চেহারা দেখে শুধু কি আরবরাই জ্ঞানচক্ষু লাভ করেন, বিশ্বের প্রায় সব দেশের মানুষই হজ করতে যান আর তাঁরা দেখেন মানবতার কী বীভৎস পরিণতি!

বেহালার বিখ্যাত অন্ধস্কুলের এক বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কত অন্ধ ছেলেমেয়েরা এখানে লেখাপড়া শিখছে, পড়ে মানুষ হয়ে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার লেখক সম্পাদক ইত্যাদিও হয়েছেন কেউ কেউ কিন্তু দুঃখের বিষয় এতশ'

ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একজনও কেউ মুসলমান নেই। কেন নেই? দোষটা কি অন্ধস্কুলের? নাকি মুসলমানদের মধ্যে আদৌ কোনও অন্ধ বাচ্চা জন্মায় না?

একটি অন্ধ বালক যদি উচ্চশিক্ষিত হয়ে ভব্যসভ্য উপার্জনসক্ষম জীবন লাভ করতে পারে তার চাইতে কি আল্লার কলমা পড়ে দোরে দোরে ভিক্ষা করা ভাল? অন্ধ ছেলের বাবা অজ্ঞ অক্ষম হলেও মুসলমান সমাজের বা আল্লারসুলের যাঁরা জবরদস্ত এজেন্ট তাঁরা তো সর্ব বিষয়েই ওয়াকিবহাল—তবে অন্ধস্কুলে বা প্রতিবন্ধীদের সরকারি শিক্ষাগারে স্থান পায় না কেন? এখানেও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আছে নাকি?

মার্কেট স্ট্রিট, কলুটোলা, রাজা বাজার, ট্যাংরা, খিদিরপুর, তালতলা, টালিগঞ্জ জানবাজার, মেটিয়াবুরুজ কলকাতার বা তার চারপাশে যেখানে মুসলিমপ্রধান জায়গা সেখানে এত ভিখারী বা অন্ধ কানা প্রতিবন্ধী কেন? মুসলমানদের বদনাম বানানোর জন্যে এইসব 'আল্লার দয়া'র দলে চতুর অমুসলমানরা কিছু বেনামী লোকজন ঢুকিয়ে দিচ্ছে না তো?

কিন্তু না, এরা যে চোস্ত কল্‌মা পড়ে যায়। মজাটা বেশ, সবাই আল্লার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সমাজ শোষকরা আলখাল্লার তলায় বগল বাজাচ্ছেন। রাজপথের মাঝখানে একজন মুসলিম ভিখারী যখন তারস্বরে আল্লার কাছে দয়ার জন্য আহাজারি করে তখন কি কোনও সম্ভ্রান্ত মুসলমানের লজ্জা হয় না? হয় বৈকি। কিন্তু ঐ যে 'আল্লা করেছেন' বলে পাশ কাটাতে পারি। অতীতে যেমন 'মোদের বুড়ো কত্তারা পাশ কেটিয়েছে' - মোরাও বর্তমানে কাটাব আর ভবিষ্যতে বালবাচ্চারাও কাটাবে ইনসে্‌ আল্লা। তাহলে দায়িত্বটা কোন মহান জামাতের?

পুঁথির গল্পের মহান দয়ালু হাতেমতাই কি কোনওদিন এসে সমস্ত মুসলমান ভিখারীদের তুলে নিয়ে গিয়ে বেহেস্তের একধারে রেখে আসবেন না?

হাঁ, সেই আশায় তো আমরা বসে আছি। কেননা আমরা অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাসী। অদৃষ্টবাদীও।

তবে একটা ফ্যাকড়া আছে, যদি কোনওদিন এই ফিউডাল নীতিতে চলা গণতান্ত্রিক ভারতে হঠাৎ কোনও মায়ামন্ত্র বলে অথবা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সুলতান মোহম্মদ বিন তোগলকের মতো সমস্ত মুসলিম ভিখারিগুলোকে পকেটস্থ করেন তাহলে দানে পুণ্যলাভ করার ব্যাপারটি কি হবে? না না, এ কখনও হতে দেওয়া হবে না। একটা ভিখারীকে পাঁচটা পয়সা দিলে তার সত্ত গুণ নেকি বা পূণ্য পাওয়া যাবে পরকালে? কিন্তু মুসলমান ভিখারীকে দান করলে যতটা পুণ্যলাভ হবে ঠিক ততটা অমুলমানকে দিলে হবে তো? হবেই না? এখানেও সাম্প্রদায়িকতা?

ধর্মে নাকি নির্দেশ আছে, মুসলমানরা মুসলমানদের দ্যাখো। হিন্দুরা হিন্দুদের দেখুক।

তাহলে তো ঢুকেই গেল কিন্তু আল্লার পাল্লায় এত ঝুঁকৃতি কেন?

যা কিছু অপসৃষ্টি অপকীর্তি সবই স্রষ্টার নামে চালিয়ে দিয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত মানুষের হার খুব ধীরগতিতে হলেও ক্রমেই বাড়ছে। তারা সমাজচালকদের ভণ্ডামী, মুর্খতার মুখোস খুলে ফেলতে চান।

ভারত ভিখারির দেশ এবং সেই ভিখারির প্রধান ডিপো এই পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতা শহর। এখানে চারদিক থেকে আসা ভাগ্যহারা ভিখারি মেয়েরা তিন-চারটে করে নাবালক বাচ্চাদের হাত ধরে নিয়ে ভিখ মাগতে আসে। আসে অথর্ব বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। লাঠি ধরে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে। ট্রেন, বাস ভর্তি হয়ে। কোথায় বনগাঁ, বসিরহাট, বারাসত, ডায়মণ্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, পাথর প্রতিমা, গোসাবা, ক্যানিং—শ্রীরামপুর, ব্যাণ্ডেল, বাগনান—হাজার জায়গা থেকে ঝেঁটিয়ে কলকাতা শহরে চলে আসে পবিত্র জুমার দিন শুক্রবারে — এইদিনের দান খয়রাতের পুণ্য আবার লক্ষ গুণ।

রাশিয়ায় ভিখারি নেই তাই দানের পুণ্যে সেখানের মুসলমানদের বেহেস্ত লাভ এখন একেবারে বন্ধ। আরবেও বোধহয় ভিখারি নেই কিন্তু কেউ যদি হাত পাতে ধর্মীয় নির্দেশ মতো দান করার রীতি তো আছে।

ধর্ম বলেছে ঃ প্রকৃত মুসলমান কখনও ভিক্ষা করবে না।

আবার প্রতিবন্ধী অসহায়দের কথা ভেবে বলা হ'ল ঃ অবশ্য কোনও অসহায় ব্যক্তি যদি ভিক্ষা চায় তাকে বিমুখ করো না।

অতএব দ্বিতীয় পন্থাই বলবৎ।

কলকাতায় বাঙালি মুসলমানদের তেমন কোনও মুরোদ নেই, আছে উর্দুভাষীদের আধিপত্য। আরবী ভাষা আল্লার ভাষা হলেও, এই ভাষারই চাচাতো ভাই উর্দু আর উর্দুভাষী ভিখারি (তওবা, ফকির বা দরবেশ) যদি দোড়গোড়ায় এসে তারস্বরে ভিক্ষা চেয়ে আপনার নগদ পূণ্য অর্জনের ব্যবস্থা করলে বিরক্ত হন তবে আপনি খাঁটি মুসলমান নন, বিধর্মী, কাফের ইত্যাদি গালমন্দ করতেও ছাড়বে না কারণ সে একজন দরবেশ। পলকে পলকে সৃষ্টি-প্রলয়-হজ-কারবালা সব কিছুই দেখতে পায়। অতএব তার মতো ব্যক্তি যে আপনার দরবারে এসেছে তাতেই তো আপনি ধন্য!

যে সমাজে বেশি ভিখারি জন্মায় তার অর্থনৈতিক কাঠামো যে ভেঙে গেছে সেকথা প্রথমেই স্বীকার্য।

তিনশ' বছর আগে একজন গরিব মুসলমানকে খুঁজে বার করা নাকি দুঃসাধ্য ছিল আর আজ? রাজ্যহারা মুসলমানরা সমুদ্রের বালির মতো তার তলদেশে গড়াতে গড়াতে চলে গেছে নানারকম ঘাত প্রতিঘাতের ঢেউয়ের ধাক্কায়। বাইরের বড় ধাক্কার পর

নিজেদের ভেতর অন্তর্কলহের ফলও এটা। রোগ, শোক, হানাহানি, মামলা, ভাইয়ে ভাইয়ে জমি-জায়গা নিয়ে রক্তপাত এসবের ফলশ্রুতি।

তার ওপরে গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করা, বউকে মারপিট করে তাড়িয়ে দেওয়া। অনেকে আবার তালাক পর্যন্ত দেয় না। দিলেও পুনর্বার বিয়ে হবার খেসারত যে দেন-মোহর বাঁধা থাকে বিয়ের সময় তাও দেয় না। কজন মেয়েই বা আর মামলা করতে যায়? আর মামলা মানেই তো পাঁচ বছর। আদালত কজন বাবার কাছ থেকেই বা নাবালক পুত্রকন্যাদের খোরাক পোশাক বা তার স্ত্রীর দেন-মোহরের টাকা আদায় করে দিতে পেরেছে? তারপরে তালাক দেওয়া বউয়ের সঙ্গে থাকবে নাবালিকা কন্যারা। তার বিয়ের সময় কেবল দাবি হলে প্রিয় আব্বাজান কিছু খরচ খরচা দিতে বাধ্য। কিন্তু অসহায় নাবালিকা কন্যাদের খাওয়াবে কি ভিক্ষে করে? বাপের কাছে কন্যা রাখা নিরাপদ নয় বলে কি এই ব্যবস্থা? হায় বাপের সম্মান!

আট বছরের ছেলে হলে আইন করে বাপ নিয়ে নেয়, নিলেই সে বালক শ্রমিকে পরিণত হয়ে তবু দু-পয়সা বাপজানকে দিতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ দেখি ছেলেদের ঝামেলা আর না পুইয়ে প্রেমিক বাবা নতুন বিয়ে করে আনা বউকে নিয়ে আল্লার ইচ্ছায় আরও কয়েকটি সন্তান উৎপাদনে ব্যস্ত। মুসলমানদের সংখ্যা যত বাড়ে ততই পৃথিবীটা তাদের হবে সংখ্যা গরিষ্ঠতার বলে। দারুণ বাস্তব হিসেব! অতএব ভিখারীও বাড়ুক। সঙ্গে থাকুক রোগ-শোক-জ্বরাব্যাধি। ভারত ভিখারির দেশ। এই ভিখারিদের নিয়ে ভাবনা যতটা বিদেশিদের তার চাইতে বোধহয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্তারই বেশি। তিনি এদের তৈরী করে ফেলে বোধহয় ভাবছেন এদের নিয়ে কি এখন করা যায়। এরা না বোঝে আল্লাকে আর না বোঝে নিজেদের। অতএব দয়ালু হাতেমতাই একদিন আসছেনই। হায় রে অদৃষ্টবাদ!

বিষাক্ত ফল

পৃথিবীতে যতরকম খাদ্য আছে তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হল ফল। তারপর মধু, দুধ, রস, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি। মানুষ অন্তত কোটি বছর আগে যখন আরণ্যক জীবন কাটিয়েছে তখন বনের নানারকম ফলই তার খাদ্য ছিল। যে গাছের ফল তার ভাল লেগেছে সেই গাছ এনে লাগিয়েছে নিজের আবাসী জায়গায় চারপাশে। দূর-দুরান্তে যখন গেছে অন্য ফলের গাছ এনেছে। তারপর পৃথিবী যখন জয় হয়ে গেল, ছোট হয়ে গেল, জাহাজ চলল দেশ থেকে দেশান্তরে, নানারকম ফল-ফুলের গাছও দেশান্তরী হ'ল। তবে আবহাওয়াগুণে সবরকম ফল সব দেশে হয় না। একই দেশের একপ্রান্তে প্রচুর নারকেল ফলে, তার একশো মাইল দূরে আবার গাছ হলেও ফল ফলে না। যে কালো আনারস আসাম বা উত্তর বাংলায় প্রচুর হয় তা দক্ষিণবাংলা বা অন্যত্র হয় না।

কিষাণগঞ্জ, মালদহ, মুর্শিদাবাদের আম চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, মেদিনীপুরে ভাল হয় না। হলেও আকারে ছোট আর টক হয়ে যায়। এসব প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক কারসাজি।

যাহোক, মানুষ - জীবনের প্রথম থেকে আজও তার পূজ্য খাদ্য হয়ে আছে ফল। শিশু আর রোগীকে পুষ্টিকর ফল আঙুর, বেদানা, আপেল, কলা, লেবু, পেঁপে, বেল ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। ফলকে পূজো করে তা নৈবেদ্যরূপে অতিথি অভ্যাগতদের নিবেদন করা হয়। অসুস্থ কন্যা, নাতি বা বুড়ো বেয়াই মশায়কে দেখতে যাবেন তো চাট্টি কলা, আঙুর, বেদানা, লেবু, বা আপেল নিয়ে যান—সবাই খুশি। এর ওপরে আর কথা চলে না। এমন কি চারটে কালো আনারস বা একঝুড়ি আম অথবা মস্ত একটা নদীয়ার রসখাজা কাঁঠাল নিয়ে গেলে আপনার খাতির যত্ন কম হবে না। নাতিকে সাগর-দ্বীপের বড় একটা তরমুজ নিয়ে গিয়ে দিলে নিশ্চয়ই সে সেটাকে নিয়ে ফুটবল খেলবে না; লাল টকটকে মিষ্টি তরমুজ খেয়ে সে ভেতরের পেট বাইরের পেট ভাসিয়ে ফেলবে! কিন্তু দুভার্গ্য আমাদের, এইসব রসালো অমৃতকে আমরা বর্তমান চালাকির যুগে বিষে পরিণত করেছি।

আপনার খুব খিদে লেগেছে, বাইরের খাদ্য খাওয়ার আপনার অভ্যাস নেই। সর্বত্রই ভেজাল খাদ্য, যা খাবেন অম্বল হবে, তো নির্ভেজাল ফল আপনি খেতে গেলেন। মনের সুখে গোটা ছয়েক কলা কিংবা পাঁচটা সবেদা খেলেন। তার সঙ্গে খেলেন

একটা ডাবের জল। ব্যাস, আর দেখতে হবে না। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় আপনি বিছানা থেকে তিন হাত দূরে ছিটকে গিয়ে অচেতন অবস্থায় শরীর ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অক অক করে গাল দিয়ে গ্যাস ছাড়তে থাকবেন। হার্ট যদি দুর্বল থাকে তো সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পেয়ে যাবেন। এর নাম গ্যাস স্ট্রোক।

কারণ কি? কারণ হ'ল, আপনার যখন খিদে পেয়েছে এবং কি খাব কি খাব করে ভাবতে গিয়ে দেরি করেছেন তখনই কিছু পিত্ত পড়ে গেছে। তার ওপরে কারবাইডের গ্যাসে পাকানো কলা বা সবেদা খেয়েছেন। যে ফলগুলো আদৌ পাকেনি, জোর করে কাঁচা অবস্থায় জাঁকিয়ে পাকানো হয়েছে। তার মধ্যে রয়ে গেছে ফলের আঠা — সেটা আপনার পেটে গিয়ে পিত্তের সঙ্গে মিশে ডাবের জলের মিষ্টি নিয়ে অম্বল হয়ে কারবাইডের কিছু গ্যাসসহ এরপর উদরে গ্যাস তৈরি করে তা বেরুনোর জন্যে মারমূর্তি ধরবে। এই সময় পথে বা গাড়িতে থাকলে বিপদ। এই আহার্য্যের ওপরে যদি বাড়ি ফিরে দুপুরের তরকারি যা আপনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য খাননি, বউ তা আদর করে দিল। আর রাত্রের তরকারিও খেলেন, এরপর তো গ্যাস স্ট্রোক হবেই, উপরন্তু কুল কুল করে আপনার দাস্ত হয়ে যাবে। শরীর কাহিল করে দেবে একদিনেই।

কাজেই অমৃততুল্য ফল ভক্ষণ করতে হলে দেখে শুনে খান। সস্তায় অনেক হবে বলে আদৌ জাঁকানো ফল কিনে পুজো সারবেন না। তার চাইতে আপনি আপেল, খেজুর, শাকালু, শশা, লিচু, আখ, পেয়ারা, নারকেল, বিলিতি কুল দিন। কিন্তু যেসব ফলকে জাঁকানো যায়, যেমন আনারস, কাঁঠাল, কলা, বেল, সবেদা, আঙুর, তরমুজ, পোঁপে, আম, জাম, আতা, লেবু, খরমুজ, ফুটিক, কাঁকুড় ইত্যাদি আপনাকে খুব দেখে শুনে ব্যবহার করতে হবে। যে সৎউদ্দেশ্যে আপনি ভাল ভাল ফল দিয়ে পুজো সারলেন তা কারবাইড দিয়ে জাঁকানোর জন্যে দেবদেবী রুষ্ট হয়ে বালবাচ্চাদের পেটে গিয়ে মারমূর্তি ধরলেন। এইভাবে জনস্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বাঙালির এমনিতেই তো চোদ্দপুরুষকেলে আমাশা রোগ আছে, তার ওপরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় আমরা কাঁচা বেলায় জাঁকানোর ফলে ইঁচোড়েই পেকে যাচ্ছি। এরপর চোখ-দাঁত-চুল তো যাবেই। গোটা জীবনটাকে সমূলে উৎপাটও করে বসতে পারে।

অনেকদিন বেঁচে থাকার জন্যে বিয়ে-না-করা রমনীমোহন চৌধুরি নামের এক চেহারাবান ভদ্রলোক বলছিলেন, এখন বিস্তর মানুষ কমে যাওয়া দরকার, আপনারা যুদ্ধ ঠেকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু মরতে তো হবে? শিশু মৃত্যু নেই, রোগ হলেই ট্যাবলেট গিলছেন তো চালাকির পেছন দিয়ে সূক্ষ্ম প্রেতাত্মারূপে খাদ্যে ভেজাল, ফলের ভেতর বিষাক্ত কারবাইডের গ্যাস বা দূষিত আঠা আপনার পেটে ঢুকে তলা ঝরঝরে করে দিচ্ছে—সে খেয়াল কি আছে? মরণের দিকেই আমরা ছুটে চলেছি।

ফলের আঠা মারাত্মক! সেটা অমৃত ফলটাকে রক্ষা করার জন্যই। আপনি কাঁচা আম পাড়তে গেলেন লগি দিয়ে। আম ছিটকে পড়ার সময় ঝরঝর করে আঠা ছিটকে ফেলল আপনার গায়ের ওপর। ব্যাস, আর দেখতে হবে না, পরদিনেই গা ভর্তি ফোঁসা হয়েছে দেখবেন। রাত্রে ঘুমের ঘোরে মিসমিস করছিল বলে চুলকেছেন। একেবারে যেন পুড়ে গেছে। চামড়া উঠে গেলেও পোড়া দাগ হবে ঠিক যেমন শ্বেতী হয়। অর্থাৎ আপনি দাগী আসামী। আর চোখে পড়লে তো অন্ধ! কাঁচা পেঁপের আঠা চোখে পড়লেও বিপদ।

ইঁচোড় বা গাছ পাঁঠা খাওয়ার সাধ আছে অনেকের। এতে কাঁঠাল নষ্ট হয়। প্রকৃতির দিক থেকে এটা কিন্তু অপরাধ। তাই গরম জলে সেদ্ধ করে ইঁচোড়ের আঠা নষ্ট করে ফেলে মানুষ। আঠা পেটে গেলে রক্ষে নেই। সেজন্য আম খেতে হলে পাকা হলেও যদি আঠা ঝরে কিছুক্ষণ মুখ কেটে জলে ডুবিয়ে রেখে খেতে হয়। আঠাটা বেরিয়ে যায়। এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে গ্রামের ছেলেমেয়েদের গায়ে প্রচুর ফোঁড়া গজায় আঠাঅলা আম খেয়ে। আঠা পেটে গেলে ফোঁড়া হয়ে বেরোবে। অবশ্য গরমেও ফোঁড়া ফুস্‌কুড়ি হয় ঘাম জমে। পেটের ব্যামো সারাতে আপনি আনারস, বেল, পেঁপে, লেবু খেলেন কিন্তু উলটে আরও বেড়ে গেলে গ্যাসে ফল পাকানোর জন্য।

গ্যাসে পাকানো ফল কিনা আপনি ফলঅলাকে জিজ্ঞেস করতে গেলে সে রেগে গিয়ে বলবে, কোনটা আবার গ্যাসে পাকানো নয়? আপনি কি উইদাউঠ গ্যাসে এই পাকা মাল তৈরি হয়েছেন?

এখন নাকি আবার গ্যাসে গোটা পৃথিবীটাই ভাসছে।

তাহলে কি টাট্‌কা পাকা ফল আপনি পাবেন না? অবশ্যই পাবেন, দাম লাগবে বেশি। একটা মর্তমান কলা এক টাকা অথবা দেড় টাকা জোড়া। তার রঙ সোনার মতো। সাদা পাঁশুটে রঙ হলেই কারবাইড দেবাতার গ্যাস খাওয়া। দু-একদিন পরেই কালচে দাগ পড়ে যাবে। সিঙ্গাপুরী কলা, সবেদা, পেঁপে, আর বেল বাজারে আপনি যা দেখতে পাবেন প্রায় সবই জাঁকানো।

কাঁচা ফল চাষীরা দিচ্ছে কেন? অভাবে আর চুরির জ্বালায়। পাড়ায় পাড়ায় পাইকের এসে গাছ ফুরোন করে সব ফল মুলিয়ে পেড়ে নিল। তাতে দুটো পয়সা এক সঙ্গে চাষীর ঘরে এসে গেল। বাদুড়ে বা বাঁদরে নষ্ট করার হাত থেকে অনেক ফল বাঁচল। কাঁচা কলা কাটলেই কিন্তু ঝরঝরে করে আঠা বেরিয়ে কাঁদতে লাগল, কাপড়ে চোপড়ে আঠার দাগ লাগিয়ে শোধ নিল কিন্তু কান্না তার থামিয়ে দিল কারবাইডের গ্যাসের মধ্যে পুরে, তবু কাঁচা ফল প্রতিশোধ নেবার জন্যে ওৎ পেতে

রইল ফলের ভেতর বিষাক্ত আঠা জমিয়ে রেখে। এসো খাও বাছাধন!

মানুষ আনাজে রঙ দিচ্ছে, ফলকে জোর করে পাকাচ্ছে, তেল, ঘি, মধু, ভেজাল দিচ্ছে। ওষুধ খেয়ে বাঁচবে, তাতেও ভেজাল। একজন গল্প লিখেছেন ভগবানের কিছু আত্মার দরকার হয়েছে, তো চিত্রগুপ্ত ভেজাল আত্মা নিয়ে গিয়ে দিলেন। কুকুর, বাঁদর, ইঁদুর, শূকর, গরু, ছাগলদের আত্মাকে মিক্‌সচার করা আত্মা। সেই সব আত্মা নাকি এখন এসেছে পৃথিবীর মধ্যে। বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমবাংলায়। আর কলকাতা নাকি তার পীঠস্থান!

অতএব ফল নামক অমৃত ভক্ষণ করতে হলে কার হাত থেকে আপনি বিশ্বাস করে নেবেন? এর চেয়ে অরণ্যযুগ কি ভাল ছিল না?

আখের রস

তর্ক করে গোটা একটা আখ শুধুমাত্র দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে খেয়ে দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেছে আমাদের। তিনদিন তরকারি খেতে গিয়ে উ-আ করে জ্বালায় মরেছি। চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে জল পড়েছে। অথচ সাড়া করতে পারিনি, কারণ বড়মামা বা সেজমামা জানতে পারলে মার দেবে। তাই মামীরা কেবল আমাদের 'রকম' দেখে গোপনে মুখে ঘোমটার আড় চেপে হাসত। শুধু আখ নয়, ঝুনো নারকোলও দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে দাঁত দিয়েই কুরে খাওয়ার নিয়ম ছিল। কে কতখানি তাতারস বা গুড় খেতে পারে। লুকোনো এক কাঁদি কলা পেকে গেছে, 'ক' ছড়া খেতে পারা যায়। মাটির ভেতর পুঁতে রেখে পাকানো আস্ত ইয়াবড় একটা তরমুজ খেয়ে বুক ভাসিয়ে হেউ ঢেউ। শশা, শাকালু, বেল, আম, কাঁটাল, জাম, জামরুল, পেয়ারা চুরি করে খাওয়ার সেদিন আর আসবে না। চুরিটা বাইরের লোকের বাগান বা ক্ষেতখামার থেকে নয়, মামাদের। অজস্র ফল, ফসল, আনাজ হ'ত তখন। বিশেষ করে ডাঙা ভরা ছিল আখ। ইয়া বড় বড়। খড়ি আখ নয়। সেতো সরু সরু আর আকারে ছোট। এ হ'ল বর্মী। সাম্‌সোড়া। ছ-হাত লাঠির মতন।

আখ চুরি হ'ত। পাড়ার ছেলেরা লুকিয়ে লুকিয়ে এসে মড়াৎ করে ভেঙে নিয়ে ছুট মারত। মামাতো ভাইদের নিয়ে আমরা চৌকি দিতে গিয়ে নিজেরাই আখ ভেঙে খেতাম খুব করে।

আখ মাড়াই হবার দিনটা ছিল চরম উৎসাহের। কার্তিক মাসে শীতের আমেজ লাগে তখন। হঠাৎ নীল ঘোলাটে আকাশের তলা থেকে দাড়িওলা লুঙ্গি পরা কম্বল কাঁধে একটা বুড়ো মানুষ আসত কল্ নিয়ে। খানা খেত মামুদেরই।

সুদূর হুগলি জেলায় নাকি তাঁর বাড়ি। আখ চাষীদের যত আখ মাড়াই করে আসছে। তার ঐটুকু মেশিনেই জেলার পর জেলা ফাঁক। যেমন চক বাঁশবেড়িয়ার সোবেদার সাহেবের ভাগ্নে সত্তার সেখ ২৪ পরগণা থেকে হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর হয়ে উড়িষ্যা পর্যন্ত চলে যায় তালপাতা কাটতে কাটতে—হাতপাখা তৈরি হয় যার থেকে।

আখ মাড়াইঅলা বুড়ো সেলিম মিয়া ফি বছর আসত। আর এলেই হুড় দাঙ্গা করে আখ কাটা লেগে যেত। চারটে ছ-টা জোয়ান মানুষ কাটারির এক এক কোপ মেরে আখ কেটে ফেলে দিচ্ছে। পাতা ছাড়াচ্ছে দু-চারজন। ছেলেরা টেনে নিয়ে

গিয়ে জড়ো করছে। সবাই রস খেতে পারে। দারুণ উৎসাহ। হৈ চৈ হল্লা। .....

কল বসানো হ'ল। গরু ঘুরতে লাগল। রস নামতে লাগল গড়গড় করে মড়মড় চচ্চড় করে লোহার পেষাই করে আখ ঢুকিয়ে দিতে। কলসি বোঝাই হতে লাগল। 'বান' খুলে 'খুলি' বসানো হয়েছে খানিকটা দূরে। আখের ছিবেগুলো পাঁজা করে বা মাথায় করে বয়ে এনে ফেলা হচ্ছে বানশালে। বান জ্বালা হ'ল। রস ঢালা হল খুলিতে। রস ফুটতে লাগল টগবগ করে। সরষে ফুট, চাল্‌তা ফুট হয়ে গেলেই গুড়। কাঁচা আখের পাতা বা ছিবে হু হু করে জ্বলে। চিনি রয়েছে যে। উনোনে একমুঠো চিনি ফেলে দিলে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আগুনও মিষ্টিখোর লোভী। ছেলেরা পাতা পাত্তর ধরেছে। তাতারসি খাচ্ছে।

কলঅলা সেলিম বুড়ো মাথায় টুপি দিয়ে তার ডিস বোঝাই মুড়ি নিয়ে তাতারসিতে ভিজিয়ে খেতে খেতে বড়মামার সঙ্গে গল্প করত।

'যে হারে কল-কারখানা বাড়ছে চাষবাস উঠে যাবে ভাই। মানুষের দুরবস্থা হবে। দেখ, আগে সরষে তিল চাষ ছিল। তিলকে হিন্দুরা পুজো করে কারণ তিলের তেলে মানুষের ব্রহ্মতালু ঠাণ্ডা করে, পেটের সমূহ রোগ দূর করে। তাই তিলের নাড়ু খায়। যতদিনেরই হোক পুরনো মানকচুকে কেটে কুঁচিয়ে আমার নানীশাশুড়ি তিল বেটে মাখিয়ে রাখত দেখেছি—রস ঝরে যেত—তারপর গোস্‌ দিয়ে রাঁধত, আহা যেন হালুয়া, আদৌ কিটোত না। সরষে চাষ উঠে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। কাটের ঘানি উঠে যাচ্ছে। কলের ঘানি আসছে। চিনির কল বসেছে পলাশীতে। দেখবে বিদেশে চলে যাবে সব চিনি টাকা উপায়ের ধান্ধায়। তখন সব চাষীর ঘরে কলসি ভরা নারকেল তেল, তিলের তেল, গুড় থাকত। সারা বছর মাখত খেত। কলকারখানা বসতেই বাইরের লোক আসছে। বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।........

'কত রকমের আখ আছে মামু'? সেলিম বুড়ো জোড়া ভুরু বিস্তারিত করে দু'দিকের কোমরে হাত রেখে সোজা হতে হতে বলেছিল, অনেক রকমের আখ আছে বাপধন। খড়ি আখ হয় খুব গরম অঞ্চলে, বিহারের দিকে। উত্তরপ্রদেশেও খুব আখ হয়। খড়ি, সামসোড়া, বর্মী, কাঠবেড়ালী, কাজলী, হিংলী, রসখড়ি, বোম্বাই বহু রকমের আখ আছে। বীরভূমের দিকে ধানক্ষেতেই আখ হয়। ঝাড়বন্দী করে বসানো হয়। তোমাদের এদিকে ভাঁটি করে বসানো হয়। আখের মাথা ছেঁটে পুঁতে দিলে আখ হয় বটে তবে এভাবে চাষ হয় না'।

বড়মামা বলে, 'আমরা একটা পাবের দু-মাথায় গাঁট রেখে চোখ এলেই কেটে ভাঁটিতে বসিয়ে দিই ওই যেসব আখ 'বেওন' বা বীজের জন্য রইল। ভাবছি আখচাষ তুলে দোব সেলিম ভাই। এতবড় ডাঙায় বেগুন, কপি, মুলো, পালং চাষ করব।

কারণ শ্যামগঞ্জে চটকল, হাটবাজার বসার ফলে রাজ্যের বাইরের লোকের আমদানি হয়েছে। আনাজ নিয়ে গেলেই এখন কাঁচা পয়সায় বিক্রি। দু'শো কলসি আখের গুড়, একশ' কলসি খেজুরে গুড়, পঞ্চাশ কলসি তালের গুড় সবই তো সারা বছর 'প্যাটে' চলে যায়। জনধন খায়। কতই বা আর পাটালি করে বিক্রি হয়? ......

মামাদের সংসারে তখন আঠারো জনের পাত পড়ত। ঝোড়ায় করে আনাজ, মাছ ধোয়া হ'ত। উঠোন ভরা অড়হর কলাই শুকোত, শুকোত মুগ কলাই, খেসারি কলাই, ছাড়ানো নারকোল, সরষে, তিল। পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের বছর যখন একটাকা চালের সের হয়ে গেল—চাল পাওয়া গেল না। বড়মামাকে চার বস্তা চাল আর এক বস্তা ছোলা কিনতে দেখেছিলাম। চাল ছোলার ভুজো বা ভাবা জলপান খেতাম আমরা নারকেলকোরা আর পিঁয়াজ তেল মাখিয়ে।

লোকরা কংকাল হয়ে গেল। প্রেত মূর্তির মত পথে পথে ভাসত। লঙ্গরখানা বসল। খিচুড়ি খেয়ে বজরা বেসন খেয়ে পেটের রোগে মারা গেল বহু লোক। কেউ একটা মিষ্টি খেয়ে শালপাতা ফেলে দিলে পর সেটাকে চার পাঁচজনকে চাটতে দেখেছি শ্যামগঞ্জের বাজারে। পোড়া চ্যাং মাছ ছেলের গাল থেকে চড় মেরে বার করে নিয়ে মাকে খেয়ে ফেলতে দেখেছি।

বড় পরিবার ভেঙে গেল মামাদের। চার মামাই চটকলের কাজে গেল। জমি ভাগ হয়ে গেল। আমনের এক ফসলী চাষটা রইল বটে, কিন্তু আখ, তিল, সরষে, অড়হর, কলা, তরমুজ, শশা, লঙ্কা, গুড় সব চাষই ক্রমেই গুটিয়ে এল, উঠে গেল। ......

সব বড় চাষীদেরই এক দশা। কাঁচা টাকা না আনলে সংসার চলে না। সাবান, কাপড়, ওষুধ চাই। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ আছে। রেডিও, বিদ্যুৎ, টিভি এসেছে।

এখন একটা আখ কিনে খেতে হয়। পেট ভরা ন্যাবা রোগ। ভেজাল তেল আসছে। কলকারখানা সভ্যতা, ভব্যতা আর টাকা আনছে বটে নকল জিনিস খাইয়ে আমাদের জণ্ডিসে ফেলছে।

আখ, আখের গুড়, শশা, লেবু খেলে কক্ষনো জণ্ডিস ধরে না। তারপর অভিশাপের মত এসেছে গুড়জল। নরকের অমৃত।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আখ চাষ ক্রমেই উঠে যাচ্ছে। যা আছে তা সখের চাষ। নদীয়ায় তখন যত আখ হ'ত এখন আর হয় না। সেজন্য উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে ভেলি বা আখের গুড়। পশম সমেত। চটের ফেঁসো জড়ানো। গরিব লোকরা রুটি খাবার জন্যে সেই গুড়ের জন্যে হাত পেতে আছে। ঘরের ভাঁড়ার থেকে আর হাতা ভরা বালি গুড় বেরোয় না খোরা বা থালার মুড়িতে।

আশি বছরের বুড়ো বড়মামা কবজি ডুবোনো দুধ ভাত খেয়ে এখনো বেঁচে আছে একখানা দু'কামরার পাকাবাড়ি বেঁধে, ছেলে হাল্‌কা মোটর বাইক চালিয়ে কেবল চক্কর মারে, দেখা হলে বলে, 'দেখিচিস তো বাবা, তখন কিছুর অভাব ছিল? আখের গুড় কিনে আনছি রে বাপ, রুটি খাবে, চা খাবে। একটা ইলিশের দর করলুম, তবে তিরিশ টাকা কেজি, দু কেজিতে ষাট টাকা? কারা খেতে পারে যাদের উপায় মাসে তিন চার হাজার টাকা। দেশটা সভ্য হতে গিয়ে রোগে শোকে ভেসে গেল। সব ছেলে বুড়ো এখন আখের গুড়ের চোলাই মদ খাচ্ছে। মরবে কলজে পেকে ফেটে। .....

'সভ্যতার পোকা, হে অভিশপ্ত মানুষের দল, মাটি ছাড়া হয়ো না, যদি বাঁচতে চাও তো আবার আখ, শশা, লেবু চাষ করো'—আকাশের হলদে মেঘের ফাঁক থেকে যাত্রাদলের কোনো বিবেক যদি ফেরেস্তার মতন হেঁকে বলে তবে তাও চিমনির কালো ধোঁয়া উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

যে দশ বিঘে জমিতে ষাট মণ ধান হ'ত সেখানে ক্যালসিয়াম কারবাইড ফ্যাক্টরি বসে বছরে এখন কোটি টাকার বেশি যখন উপায় তখন জমি রাখার যুক্তি কি? জমি বেচে হোটেলে খাব। যে মতেহার মোল্লা জমি বেচেছে সে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষে করে খেয়ে মরেছে।

কয়লার চুল্লীও নিভে গেছে, চিমনির ধোঁয়া আর ওড়ে না। বিদ্যুৎ এসেছে। মোটর চলছে। সিলেণ্ডার ঘুরছে। গ্রাম শহর হয়ে গেছে। শহরে লোকদের পক্ষে গোটা আখ চিবিয়ে জণ্ডিস তাড়ানোর ব্যাপারটা একেবারেই গ্রাম্য অসভ্যতা। তার চাইতে গোটা একটা আখের শক্তিযুক্ত ট্যাবলেট গেলাই অনেক ভব্য ব্যাপার।

মানুষ যখন পুরো সভ্য হয়ে উঠবে কোথাও আর একগাছাও আখ বোধহয় থাকবে না। থাকবে নমুনাস্বরূপ জাদুঘরে।

কলকাতার পথে কল বসিয়ে যেসব অবাঙালিরা বাইরের প্রদেশের খড়ি বা কাজলী আখ মাড়াই করে বরফ দিয়ে বিক্রি করছে গেলাস প্রতি পঁচাত্তর পয়সা এক টাকা তাতে খানিকটা পিপাসা মিটলেও উপকারের গোড়া মেরে দেয় বরফজলে। লেবু অবশ্য সবসময়েই উপকারে লাগে। তবে এক গ্লাস আখের রসের চাইতে এক গেলাস 'গুড়জল' বা চোলাই মদের চাহিদা এখন বেশি।

কারণ এখন বৈজ্ঞানিক যুগ। বাষ্পীভবন করে যে পচানি গুড় থেকে অ্যালকোহল তৈরি হয় তার তেজশক্তি কত! আর কি গ্রাম্য কাঁচা আখের রসের কথা এখন শোনায়!

কিন্তু পীতরোগের মেঘ পশ্চিমবঙ্গের গোটা আকাশে ছেয়ে গেছে, মাটির পরকলায় তারই প্রতিবিম্ব, বন্ধুরা এবার আখ চুরি করে খাওয়ার দিনগুলোর কথা ভাবো।

চিরকাল আঁধার

'তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে'— বলেছিলাম বেহালার এক দৃষ্টিহীন ছাত্রীকে।

চতুর্দশী বালিকাটি বলে, 'দেখুন, সুন্দর কেমন জিনিস আমরা তো বুঝি না—আপনারাই দেখেন বা বোঝেন—যদি একটু বুঝিয়ে দেন।'

বোকা বনে গেলাম। ফুল যদি বলে আমার সৌন্দর্য আমি বুঝি না, আমার চোখ নেই তবে কাকে কি বোঝাব। তবু বালিকাটিকে বলেছিলাম, তোমার ফর্সা রঙ, সুন্দর নাক-মুখ, চোখ দুটোও বিকশিত কিন্তু তুমি যে দৃষ্টিহীন তা সহজে বোঝা যায় না।

বালিকা বলল, 'আমরা শব্দ শুনি, ঘ্রাণ নিই, স্পর্শ করে যতটা বুঝি ততটাই। খাড়া বা থ্যাবড়া নাক, ফর্সা বা কালো রঙ এসব আমাদের কাছে একাকার। তবে লাল আর কালো এই দুটো আমি বুঝতে পারি। সূর্য বা আলোর দিকে তাকালে লালচে হয়। আর রাত হলে কালো। যাদের একেবারে চোখের গোলক নেই তাদের কাছে চির অন্ধকার। হয়ত আমার চোখের গোলকের ভেতর মণি আছে।'

'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে খুব বড় ঘর থেকে এসেছ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার বাবার অভাব নেই। বাড়ি গাড়ি আছে। মাঝে মাঝে মা-বাবা আসেন। কেক-ফল-বিস্কুট দিয়ে যান, আমি আমার সঙ্গের বন্ধুদের সব বিলিয়ে দিই। তারা খুব গরিব ঘর থেকে এসেছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের নায়িকা দৃষ্টিহীন, তার মানসিক চেতনা নির্বোধ, হাস্যকর হলেও পাঠকের মর্মে আঘাত হানে। তারাশঙ্করের এক অন্ধ চরিত্র, দোকানের টিনটা গড়াম করে যখন শব্দ করে—বলে ওঠে, নটা বাজল!

দৃষ্টিহীন কৃষ্ণচন্দ্র দে এককালে খ্যাতিমান গায়ক ছিলেন। বেহালা থেকে পড়ে পাশ করে ব্যারিস্টার হয়েছিলেন সাধনচন্দ্র গুপ্ত। মধুসূদন দেব ছিলেন সার্থকনামা প্রকাশক। দৃষ্টিহীন এক বেহালাবাদক ছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত মানুষ। কিন্তু এসব কোটিতে গুটি মাত্র। বহু অন্ধকে দেখি ট্রেনে গান গেয়ে ভিক্ষে করতে। কারো কারো গলাও বেশ, গায়ও কেউ কেউ ভাল। নজরুলের গানও গাইতে শুনেছি।

দৃষ্টিহীন রাজনীতিক দীপঙ্কর রায় (এস ইউ সি আই) দিব্যি সুন্দর দেখতে। চোখে কাল চশমা। সুন্দর নাক। সুঠাম যুবক চেহারায় আধুনিক প্যান্ট, বুশ সার্ট। তাঁর সঙ্গে আলাপ হতে বললেন, 'গোটা পশ্চিমবাংলায় দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় আছে মাত্র ছটি। বেহালা, সাদার্ণ অ্যাভেন্যু, নরেন্দ্রপুর, কোচবিহারে দুটো আর কালিংপঙে একটি। আর

দুটি চারটি যা হয়েছে বা হচ্ছে তা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়।'

'সরকার তো সাহায্য করেন এঁদের?'

'সাহায্য দান যতটা করেন তার চাইতে বহুগুণ প্রচার করেন সরকার। কথা শুনলে মনে হয় বুঝি দৃষ্টিহীন হলেই ভাল ছিল।—শ্যামনগরে দৃষ্টিহীন লাইব্রেরিতে আপনাকে নিয়ে যাব—আপনার 'বাংলার চালচিত্র' বইখানা প্রেজেন্ট করবেন। আমরা আমাদের ভাষায় 'বেল' করে নেবো।'

'বেহালায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিল—হয়ত ওঁরা ঐ বইটির দৃষ্টিহীন ভাষা করে থাকবেন, আপনি তার থেকে কয়েক শো কপি ছেপে নিতে পারেন না?'

দীপঙ্করবাবু বললেন 'না, ভারতে এখনো দৃষ্টিহীনদের জন্য কোনো প্রেস হয়নি। গোটা বইটিকেই কপি করি আমরা'।

'আমি দেখেছি আপনাদের বই, ব্যাঙ্কের ফাইলের মতো খুব বড় আর মোটা মোটা। তুলোট কাগজের মতো। তাতে সূঁচে ফোঁটানো অক্ষর—আঙুল বুলিয়ে পড়ে ছেলেমেয়েরা। এত বড় গলা উঁচু উটপাখির মতো সরকার, তার মাথায় কত রকমের প্ল্যানিং, শিগগির নাকি পৃথিবীতে সে তৃতীয় স্থান অধিকার করবে (ভিখারীদের নিয়েই) কিন্তু দৃষ্টিহীনদের জন্য একটা প্রেস বানানোর বুদ্ধি তার মাথায় এখনো এলো না! বাঘা বাঘা এম পি-রা আছেন, কই এ বিষয়ে কখনো বাগ্মিতা বিস্তার করেছেন বলে তো জানি না।'

আপনি যদি হঠাৎ অন্ধ হয়ে যান?

যে চির অন্ধ সে তো পৃথিবীর অনেক কিছুই দেখেনি কিন্তু তার তো মুসকিল যে দেখেছে। তাই হঠাৎ কোনো সুস্থ সবল মানুষ যদি অন্ধ হয়ে যায় তবে তার জীবন বড় অভিশপ্ত। চোখ হ'ল মণি। দেহের মূল্যবান জিনিসগুলির অন্যতম।

দয়াপরবশ হয়ে পরলোকগতা ইন্দিরা গান্ধী তাঁর চোখ দুটি মৃত্যুর পর কোনো দৃষ্টিহীনকে দান করার কথা বলে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হয়নি বোধহয় তাঁর প্রতি অধিক মমত্ব বোধের জন্য তাঁর লৌকিক শরীর দাহ করে ফেলা হয়। চোখ দুটি কোনো দৃষ্টিহীনের চোখে থাকলে নিশ্চয়ই তা ঐতিহ্য হয়ে থাকত। একটি অন্ধ জগৎ—সংসারকে রূপে রঙে কতটা রমণীয় তা দেখতে পেত।

কোনো ধার্মিক মুসলমানের চোখ পাওয়া যাবে না। কারণ শরিয়তে কোথাও চক্ষুদানের কথা নেই। তাছাড়া পরকালে চোখেরও কৈফিয়ত আছে। সে কি মন্দ জিনিস দেখেছে। আর কিয়ামতের দিনে চোখ হারিয়ে উঠবে? যদি বেহেশ্‌ত লাভ হয় তবে তার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য 'হুর' (কিশোরী) উপভোগই ব্যর্থ হয়ে যাবে।... মরা লোকের চোখ ওপড়ালে বিকৃত দর্শন মড়াকে প্রকৃত মুসলমান বলে হয়ত আল্লাই এ্যালাউ

করবেন না!

সরকার অন্ধদের সম্পর্কে অন্ধ নন, বরং বাক্যে-ব্যবহারে দয়ার অবতার, তাই অন্ধদের পথঘাট থেকে তুলে নিয়ে (না, সাবাড় করে দিতে বলছি না) কোনো সেবাশ্রমে রেখে তাদের শিক্ষিত কর্মক্ষম করে তুলতে পারেন না?

যে অন্ধ বিনা টিকিটে সারাদিন ট্রেনে ভিক্ষে করার অধিকার পেয়েছে এই গরিব দেশে তার একটা ন্যূনতম রোজগার আছে, তাই বউও জুটেছে আর ছেলেমেয়েও হয়েছে—সেই অন্ধের টিকি ধরে টান দিলে শেকড়েও টান পড়বে। তার বউ ছেলেমেয়েদের খাওয়াবে কে?

তাই গণতন্ত্রে সম্মানিত গণ দেবতারা যে যা করে করুক—সবাই স্বাধীন—ধনী হতে চাও হও—গরিব হতে চাও হও। গরিব হয়ে অনাহারে থাকলে যে ধরে নিয়ে গিয়ে কোনো দেশপ্রেমিক জেলে পুরে দেবেন এমন আইন এখনো হয়নি।

কাজেই অন্ধরা সংসারে থাকুক বা পথে ঘাটে ঘরুক অথবা মরে পড়ে থাক আমাদের উদার গণতন্ত্রে করার কিছু নেই।

বড় বড় চোখঅলা জ্যান্ত বি-এ, এম-এ পাশ যুবক যুবতীরা যে দেশে চাকরি পায় না, বেকার, সে দেশে অন্ধরা কোন আক্কেলে সুযোগ চাইতে আসে? আর আসবে তো কোনো চোখঅলা লোকের কাছে। সেই বা অন্ধত্বের প্রতিকারহীন ব্যথা-বেদনা জ্বালার কতটুকু কি বুঝবে?

অন্ধ কবি মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' স্বর্গচ্যুত আদম ইভের কাহিনী হলেও আসল স্বর্গ হারান তিনি নিজেই—তা হ'ল তাঁর চোখ।

তবে চোখ বন্ধ করেই মানুষ ধ্যানের বা ভাবনার গভীরে নামে। চোখ না থাকলেও মন থাকে, অনুভূতি থাকে। শিক্ষিতের মনন বা অনুভূতি পৃথিবীর অনেক কাজে লেগেছে। তবে তা সংখ্যায় অতি অল্প।

সভ্য দেশের (আমাদের দেশ অসভ্য?) অন্ধরা নিশ্চয়ই পথে পথে মগ নেড়ে নেড়ে লাঠির সাহায্যে হাঁটা-চলা করে গান গেয়ে কেঁদে কেটে বাঁচে না-তারা কিভাবে জীবন যাপন করে অনেক বিদেশ সফরকারী বিত্তবান ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই জানেন কিন্তু বলেন না কেন না সেসব কথা এখানে রূপকথা শোনাবে—তাছাড়া অন্ধরা শুনলে তাদের জীবন-জ্বালা অসহ বোধ হবে—হঠাৎ হাজার খানেক মরে বসতেও পারে—নতুবা অন্ধদের মিছিল, ঘেরাও!...

অন্ধ, কানা, খোঁড়া, ন্যাংড়া, গোঙা, হাবা, বোবা, ট্যারা, কালা—সবরকম বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সর্বভারতীয় একটা পার্টি এখনো কোনো আধ পাগলা রাজনীতিক তৈরি করেন নি—করলে সেই পার্টির নাম মাকর্সবাদী কংগ্রেস করা যেতে পারে।

গান্ধীজীর হরিজন করুণায় প্রতিবন্ধীরা বিশ্বাসী এবং দলবদ্ধ হয়ে আমরণ অনশন নামক মার কাট্টা মারক্সীয় বিদ্রোহ করবে—আর তাদের কয়েক দফা দাবির মধ্যে থাকবে একটি অন্ধ বা প্রতিবন্ধী প্রদেশ। এসব করলে বিদেশ তাদের টাকা দিতেও পারে।....

আমাদের দেশ এমনই অসচেতন যে কোনো পরিবারের একমাত্র উপায়দার যদি হঠাৎ অন্ধ হয়ে য়ায় তো সেই পরিবার ভেসে যায়, হাজারটা চিঠি দিলেও প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী সেসব চিঠি পান না, পেলেও ফেলে দেন।

এইভাবে বহু সংসার ভেসে গেছে এবং যাচ্ছে। কারণ প্রোটিনের অভাব বাড়ছে ক্রমাগত দুঃস্থ দরিদ্র পরিবারগুলিতে দ্রব্যমূল্য বাড়ার ফলে, জিনিসের দাম বাড়তে থাকলে চুরি ডাকাতি ছিনতাইও বাড়বে কিন্তু সেসব কাজে তো অন্ধ প্রতিবন্ধীরা অক্ষম। তাদের পকেট মারার মতো ক্ষমতাটুকুও নেই। তাদের চোখের নোনাজলে খানিকটা অংশ ভিজলেও উন্নয়নশীল দেশের কিছু এসে যায় না বলে যেসব পরিকল্পনাবিদ্‌রা সুখের স্বর্গে পা তুলে বসে আছেন তাঁদের স্বর্গ রচনাই ব্যর্থ। ভারত যে সপ্তম পরিকল্পনার পরও ভিখারী, বেকার, অন্ধ, প্রতিবন্ধীদের দেশ, উন্নত দেশগুলির একথা বলা বন্ধ হবে কি? বিশটা পরিকল্পনা উঠলেও বোধহয় নয়। ততদিনে আরো অন্ধ প্রতিবন্ধী বাড়বে।

তবে মাঝে মাঝে কোনো কোনো ডাক্তার তাঁর হাত-যশ বা প্রতিষ্ঠান বাড়ানোর জন্যে বিনা খরচে চোখের ছানি কাটছেন। বয়স বাড়লেই প্রায় সব মানুষের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, ক্রমেই লেখার অক্ষর জড়িয়ে যায়, চশমা আঁটতে হয় কিন্তু ব্যাপকভাবে আমরা 'চল্লিশে' বাধার পর থেকে ব্যক্তিগত খরচে চক্ষু পরীক্ষার জন্য সচেতন বা সক্রিয় হই না। বাধ্যতামূলক সরকারি কোনো সংস্থাও নেই। তাই চোখের দৃষ্টি কম হওয়া মানুষের সংখ্যা বোধহয় অর্ধেক, যাঁরা প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ—সব সংসারের হাল ধরে বসে আছেন। যে বয়সে খালি চোখে আর সূঁচে সুতো পরানো যায় না সেই বয়সের বাবা কাকারাও অন্ধদের গলা পচা বিকৃত চোখ দেখে ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেন। ভাবেন ঈশ্বরের কী বীভৎস সৃষ্টি।

সাহিত্যিক তাঁর বিকৃত বীভৎস চরিত্র সৃষ্টির জন্য দায়ী হন কিন্তু ঈশ্বর সর্বদাই দায়মুক্ত। তাঁর খেয়ালের ওপর তো মামলা চলে না। তবু তাঁর মহিমাকীর্তন করো। এবং অভিশপ্ত অন্ধ প্রতিবন্ধীরাই তা করে বেশি। সারা জীবন। তবু ঝড়ে তাদের কুঁড়েঘরটাই উড়ে যায়। সুদখোর কালোবাজারী মহাজনের পাকাবাড়িটা ঠিক থাকে।

দুঃখ, ভয়, হতাশ, বিতৃষ্ণা থেকে যে ধর্মের জন্ম সেই অন্ধকার কারাগারের মধ্যে পড়ে লক্ষ লক্ষ আর্ত-অসহায় কাঁদছে ভারত জুড়ে—অযুত পরিকল্পনায় তাদের উদ্ধার করতে না পারলে কপাল দেখানো ছাড়া উপায় কী?

তালগাছ

চোরের অত্যাচারে কিছু দূরের জমি থেকে যদি ফসল আনা না যায়, যদি পতিত ভাগাড় অথবা পরিত্যক্ত খালধার বা শ্মশানের পাশের জায়গা হয় তবে হয় বাঁশ বসাও, না হয় তো তাল আঁটি। পাকা তাল কুড়িয়ে আনার পর এক জায়গার জমা করে বা সামান্য উঁচু মাচায় তুলে রাখলে 'কলা' বেরুবে। 'কলা' হল অংকুর। লম্বা একটা শিকড়। মাটিতে গেঁথে যাবার পর গাছ গজাবে। কলা গজিয়ে বেশ একটু বড় হলে আঁটি কেটে ভেতরের 'তালকলা' খেতে বেশ মজাদার। ভাদ্দর মাসে তাল পড়ে। তাল কানা। ভারী। হঠাৎ মাথায় পড়ে যেতে পারে। নারকেলের চোখ আছে। আসলে হাল্‌কা, উড়ে উড়ে বেধে বেধে পড়ার সময় পাতায় শব্দ আর দেরি হয়। নারকেল ছাড়ালে তিনটে চোখ দেখা যায়। আস্ত একটা বাঁদরের মুখ। নাকের শিরাও আছে। কলা বেরুক বা না বেরুক তালের আঁটিগুলো সারি দিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে দিলে গাছ গজাবে। কয়েক পছর পরে তালবনের সৃষ্টি হবে। মাঝপাতা রেখে সমস্ত পাতা কেটে বিক্রি করলে মোটা টাকা আয় হয়।

২৪ পরগণার মায়াপুর, হাঁসনাচা, বাগানবেড়িয়া, আলমপুর, চক বাঁশবেড়িয়া, চড়া ডোঙ্গাড়িয়া—এইসব গ্রামগুলোয় অসংখ্য তালগাছ—নিবিড় সবুজ বনানী। তাল কুঞ্জ শুধু শোভার জন্য জমি জোড়া করে ফেলে রাখা নেই। মাদি গাছের তাল বিক্রি হয় শাঁসের জন্য। পেকেও ঝরে পড়ে। রস কাটার জন্য কেউ কেউ জমা নেয়ও। তালগাছ দু-রকম। 'এ্যাঁড়া' বা পুরুষ জাতেব আর 'মাদি'। পুরুষ জাতের তাল গাছের মোচ নামে দীর্ঘ মোটা আঙুলের মতো পাঁচ ছ-টা করে। গায়ে গুঁড়ি গুঁড়ি ফুলও হয়। এই মোচ দলে হেঁসোর সাহায্যে মাথাটা চাকা চাকা করে কেটে সব ক'টা ডাগুা ভাঁড়ের ভেতরে গুঁজে দিয়ে 'কানাচি'র দড়ি তালের কাঁদিতে আর পাতার ডাগুায় বেঁধে রাখতে হয়। অল্প খানিকটা চুনের জল থাকে ভাঁড়ের তলায়। নইলে ঝরে পড়া রস চোত বোশেখের তাতে টকে যাবে। মাদি মোচের গায়ে চারিদিকে ছোট ছোট কচি তাল থাকে। মোচের মাথা তাল সমেত পেঁচিয়ে কেটে দিলে কয়েকদিন পরেই রস নামে। মাদি গাছেই রস নামে বেশি। যে বাঁশের দু'দিকে প্রত্যেকটি গাঁট থাকে ঝাড় থেকে তাকে বাছাই করে কেটে এনে কঞ্চি ছিঁইয়ে তালগাছের গায়ে মজবুত করে বেঁধে দিয়ে কোমরের আঁকড়ার চারটে ছটা ভাঁড় আর তাতে হেঁসো নিয়ে সিউলি রোজ সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় তিনবার গাছ বেয়ে রস নামায়। গাছের মাথা ঝোড়ো হাওয়ায় তারস্বরে

গান গায়। মজাদার কোনো লোকসঙ্গীত।.... তালের রসে চুন থাকার জন্য খেলে অম্বল হয় না, খেজুরের রসে অম্বল হয়, এতে জলীয় অংশও থাকে বেশি কিন্তু তালের রসে গুড়ের পরিমাণ হয় অনেকটা। তালের পাটালি এ বছর সাড়ে চার টাকা থেকে এখন পর্যন্ত ছ-টাকায় পৌঁছেছে। আর রস হবে না—তাল বড় হয়ে গেছে।

তালগাছের সবটাই কাজে লাগে। গাছ পাকলে করাত করে নিলে ভাল মজবুত আড় কাটা হয়। তক্তপোশ করলে তো পাঁচশো বছরেও তার ক্ষয় নেই। তালগাছের গোড়া ঢেঁকি 'পো' হয়। ডাঁটার ছাল তুলে দড়ির কাজ করা হয়। পাতা থেকে হয় হাতপাখা। শুকনো ঝরা পাতা তো জ্বালানী হয়ই, কাঁচা পাতায় আবার ঘর ছাওয়াও যায়। তালগাছ পাকতে লাগে আশি থেকে একশো বছর।

শীতের সময় যখন মানুষ কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকে তখন আর কে ভাবে সামনে আসছে দুঃসহ গরমকাল। কিন্তু সত্তার মিয়ার মতো কিছু লোকের ঘুম থাকে না আমন ধান ওঠার পর সেই পৌষ মাস থেকেই। সাগর দ্বীপের কোল থেকে গ্রামের পর গ্রামে চাষীর বাড়ি গিয়ে সে তালপাতা কাটতে শুরু করে। ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে যাবে সে ওড়িশা পর্যন্ত। পায়ে গুণের চিহ্নের মতো ফের-দেওয়া ছোটা গলিয়ে কাছি বেড় দিয়ে ধারালো কাটারী হাতে নিয়ে সত্তার মিয়া এই ষাট বছরেও বীরবিক্রমে গাছে উঠে তালপাতা কেটে ফেলে দেয়। ষোল বছর বয়সে সে এই কাজ শুরু করেছে। এত ইলেকট্রিক এলো, বাবুদের ঘরে ঘরে পাংখা ঘুরছে তবু কই তালপাতার পাখার টান কমেছে? বরং বেড়ে যাচ্ছে। কেন না মানুষ বাড়ছে। সংসার বাড়ছে। লোড শেডিং হলে কোন্ বাবা তোমাকে বাঁচাবে—তালপাতার পাখা!' আবলুস কালো পেশীবহুল আদিবাসী চেহারার সত্তার মিয়া বলে, 'ধাতুর তৈরি হাঁড়ি-পাতিল হল বলে কি মাটির হাঁড়ি কলসী উঠে গেছে? উড়ো 'জাহাজে' সংসার করে নাকি মানুষ? ভূঁয়ে কোমর ঠ্যাকাতে হবে তো? চর্বিঅলা চেহারা এলিয়ে ঘাম গড়ানো 'শরীলে' এট্টু পাখার বাতাস লাগালে যে আলু সেদ্ধ হয়ে মরবে বাবুবিবিরা।'

সত্তার মিয়াকে এক শীতকালের খুব সকালে গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের ধারে হাওড়া জেলার খাদিদান গ্রামে গাছকাটারী ঘষে কোমরের খুঁয়ির মধ্যে রাখতে রাখতে টোঙের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে শুনি, 'কি ব্যাপার, আপনি এখানে?'

বলি, 'আমারও তো প্রশ্ন তুমি এখানে কেন?'

'তালপাতা কাটতে কাটতে চলেছি ভাই, যাব সেই ওড়িশা মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত। তালপাতা কেটে ফেলে দিই সকালে। রোদে এক দুপুর শুকোয়। দুপুরে টোঙে এই বাচ্চাটা রান্না করে। খেয়ে এট্টু গড়িয়ে নিই। বিকেলে আধ শুকনো পাতাগুলো চিরে ফেলে ছেঁটে কেটে মুটি বেঁধে নিই। তারপর সাঁজের বেলা গুনে হাজারটা করে

পড়পা বাঁধি। চাষী মালিক দশ হাজার কি বিশ হাজার মুটি হল তার দাম নিয়ে নেয়। মুটিতে চারখানা। পাইকেরা চলে আমার পিছনে পিছনে। তারা গাড়ি বোঝাই করে মাল নিয়ে গিয়ে যেসব অঞ্চলে পাখা বাঁধা হয় সেখানো পৌঁছে দেয়। তারা এবার মুটে শুকিয়ে অল্প দু-একদিন পানিতে ডুবিয়ে রেখে সিল বা যাঁতা চাপিয়ে সোজা করে মিস্ত্রি বা কারিগর দিয়ে ছাঁটকাট করে দেবে। পাখাতে কাঠি বাঁধার পর গরিব মেয়েরা শ' দরের পাখাতে কুঁসি দেবার জন্যে নিয়ে যাবে। তারপর মহাজন আর্টিস্ট দিয়ে ছবি আঁকিয়ে হাজার দরে পাইকেরকে বেচবে। তারা গাড়ি করে নিয়ে যাবে শহরে-নগরে। দেবে দোকানে দোকানে। বাবুরা কিনে নিয়ে গিয়ে 'শরীলে' হাওয়া মারবে। বিবিরা আঁচে হাওয়া লাগাবে।'

'এত কাণ্ড, তো এই ঠাণ্ডায় বুড়ো বয়সে গাছ বাইছ?'

বুড়ো বয়েস কোথা হে, সবে তো বাষট্টি—এখনো তিনপো চালের খ্যাঁট মারি, আর গোস্ত এক কেজি। কব্জির যা তেজ আছে, পারবে আমার সঙ্গে?

'সংসার করো কখন?'

'রোজগার তো আগে—সব সময় কি ডিমে তা ঘষতে হয়? জমিদারী আছে, না চটকল আছে আমার?'

'তুমি তো এত তালপাতা কাট, পাখার বাতাস খেয়েছ কখনো?'

হ্যা হ্যা করে হাসল সত্তার মিয়া। চলে যেতে যেতে বলল, 'ভাগ্যে থাকলে তবে তো? আল্লার বাতাসই আমাদের মতন চেহারার লোকদের জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া বসে আরাম করে বাতাস খাব, সময় কোথা? মেয়ে-মানুষের ধাত যাদের তারা আরামের হাওয়া খায়'।...

বললাম, 'ভদ্দরলোকদের ওপরে তোমার রাগ। ভদ্দরলোক হলে খুব জব্দ হতে'।

বাগান বেড়িয়ার বড় পাখার কারবারী রশীদ মোল্লা তালপাতার পাখা ক্ষুদ্র কুটির শিল্প—তাতে সরকারি অনুদান দেওয়া দরকার একথা একদিন আলোচনা করছিলেন। ফ্রন্টের এক নেতাও সায় দিয়েছিলেন। শত রকমের ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মধ্যে তালপাতার পাখার উল্লেখ না থাকলে ব্যাঙ্কের খাতায় কি লেখা হবে? 'ইত্যাদি' বলে কোন খাত না থাকলে অর্ধ শিক্ষিত বেকার যুবক দশ হাজার টাকায় মাইক ভাড়া খাটিয়ে রোজগার করতেও যদি না পায় তবে কি ছাগল পুষে অন্যের ফসল ধ্বংসাবে?

পাখার হাওয়া মেরে এসব বাড়তি কথা উড়িয়ে দাও। রশীদ মিয়া একখানা বিরাট গোটা পাতার ঐরাবত পাখায় চিত্রকলা এঁকে গণদেবতাদের একটু হাওয়া খাইয়ে এলে তালপাতার পাখা ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের জাতে উঠতে পারে।

তালগাছগুলো এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে ড্যাবডেবে চোখ মেলে তাকিয়ে

আছে গ্রামের বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া ইলেকট্রিক তারগুলোর দিকে। তারা বিজলী এনে পাখা ঘুরোচ্ছে—তবে কি তাদের দিন ফুরোল? করাত-কলে গতি হবে তালগাছগুলোর?

সত্তার মিয়াকে একথা শুধোলে নিশ্চয়ই সে জবাব দিত, 'এখনো একশো বছর তার দেরি আছে। সব গ্রামে এখনো ইলেকট্রিক পৌছয়নি। একটা গ্রামে তা গেলেও গরিব পাড়া এখনো বঞ্চিত। গরিবরা যখন রয়েছে, তালগাছ তাদের ভরসা! তালগাছ গেলে তালের রস, গুড়, পাটালি, তালের কচি শাঁস, তালকলা, পাকা-তালের পিঠে এসব জুটবে কোত্থেকে? আড়-কাটা লাদনা হবে কিসের? কুঁড়েঘর ছাঁইবে কি দিয়ে তালপাতা না পেলে? তাল কানা হয়ে যদি তালগাছগুলো করাত-কলে পাঠাও তবে তাল কেটে যাবে বর্তমান হযবরল জীবনের। অতএব ফ্যানও ঘুরুক আর হাতপাখাও চলুক। দেড় টাকার ভাল একখানা ডান হাতের হাত পাখা যার বিছানায় নেই এই ঘন লোড শেডিংয়ের দিনে দুরন্ত গরমে তার কপালে অশেষ দুঃখ আছে।

বাঁশ-বাঁখারি-ডোম

বাঁশ থেকে ঝোড়া, ঝাঁকা, চুবড়ি, ধুচুনি, কুলো, চ্যাঙাড়ি, চালুনি, বাজরা ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলি যারা তৈরি করে তারা 'ডোম' কিন্তু মাছধরা যন্ত্রপাতি ঘুনি, আটল, ঝাঁঝরি, মুগ্রি, খালুই, পোলো ইত্যাদি বানায় যারা তারা 'তিয়োর' সম্প্রদায়। দুটি সম্প্রদায়ের মানুষ কাজ কারবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলেও তিয়োরদের সঙ্গে গ্রামীণ পুকুরে-জেলেদের সঙ্গে মিলজিল বেশি। জেলেদের দুটো ভাগ, একদল থাকে গ্রামেই যারা পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুকুরে খালে বিলে আধাআধি বা দশআনা ছ'আনা বখরায় মাছ ধরে বেড়ায়। আর গঙ্গায় বা নদীর ধীবর সম্প্রদায় আলাদা। চূড়জাল, মহাজাল, বেড়জাল, ইলিশে-জাল আর নৌকো নিয়ে তাদের বিচরণক্ষেত্র নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত। সাধারণত নদীর কিনারেই তাদের বাড়ি।

তিয়োর সম্প্রদায় বাঁশ্নি বা তাল্‌তা বাঁশ থেকে ঘুনি, আটল, মুগ্রি, ঝাঁঝ্রি তৈরি করে নিয়ে কাঁধে করে বর্ষাকালে নানান হাটে-বাজারে বিক্রি করে বেড়ালেও এরা খালে বিলে জলগলা বাঁধ তৈরী করে তা থেকে মাছ ধরে। এদের মুসলমান সম্প্রদায়কে বলে 'নিকিরি'।

ডোমেরা কাটারি হাতে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে চাষীবাড়ি থেকে বাঁশ বা বড় কঞ্চি সংগ্রহ করে। বেশিরভাগ নেয় কঞ্চি। যেসব কঞ্চি বাঁশের চেয়ে দড়। এগুলো হয় সাধারণত মুড়ো বাঁশে। বাঁশঝাড়ে পুকুরের পাঁক দিতে নেই কারণ বাঁশ তেজে গিয়ে খুব বড় আকারের হয়ে গিয়ে ঝড়ে মাথা ভেঙে মুড়ো হয়ে যায়। যাহোক, বড় কঞ্চি না পেলে ডোমেদের কাজ কারবার বন্ধ। একপণ কঞ্চি এখন পনেরো টাকা। আশিটায় একপণ। ডোমেরা গণ্ডা গণ্ডা করে গুনে নেয়। মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায় তিন চার মাইল দূরে। বোঝা বওয়ার ধমকে তাদের চেহারা খর্বাকৃতি হয়ে যায়। প্রতি রবি আর বৃহস্পতিবার ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে পথে বার হয়ে এসে প্রথম দর্শন হবে ডোমেদের সঙ্গে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই। কাঁধের বাঁকে ঝোড়া, ঝাঁকা, চুব্‌ড়ি সাজিয়ে নিয়ে চলেছে হাটে। পথের মানুষদেরও বিক্রি করতে করতে যায় এরা, কাঁধের ভার হাল্‌কা করার জন্য। তখন ছিল টাকায় পাঁচটা মাটিকাটা ঝোড়া। এখন একটার দাম সাড়ে তিন থেকে চার টাকা। একটা বড় ঝাঁকা পনের টাকা। বাজরা কুড়ি-পঁচিশ টাকা। আনাজ ধোয়া চুব্‌ড়ি দেড় টাকা থেকে দুটাকা।

বুড়ি লালমন কপালে হাত মারে। বলে, বলিস কিরে নন্দ, একটা ধুচ্‌নির দাম

আট টাকা? একটা 'চান্নি' (চালুনি) চার টাকা? তোরা যে গলা কাটা হয়ে গেলি'?

নন্দ দাস কপালের ঘাম মোছে। গামছার হাওয়া খায়। হাঁপানোর ফাঁকে ফাঁকে বলে, 'বাঁশ কঞ্চির দাম যে আগুন হয়ে গেছে, নানী। সস্তায় দোব কি করে? তাও তো মাল পাই না। 'বাখারি শিল্প' হয়েছে। গোটা গ্রাম জুড়ে বাখারি তৈরী হচ্ছে। তার থেকে হাত পাখা বাঁধা হয়, পেটি বাঁধা হয়—কত কারখানায় যায় শহরে। কাজ কারবার ডকে উঠে যাচ্ছে আমাদের। টাকা নেই ছেলেরা কল-কারখানায় চলে যাচ্ছে। তারা একশ' টাকার নোট এনে দেখায় আমাদের কারিগরদের। ইউনিয়ন করো বলে বিগড়ে দিচ্ছে। বড় মহাজনী কারবার ভেঙে যাচ্ছে। নানী, তোমাকে তো আমিই মাল দিই আজ পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে। তখন ছিল বারোটা চুব্‌ড়ি টাকায়। তোমার বউমার একখানা শাড়ি কিনে দোব বলে আজ তিনমাস চেষ্টা করছি—দাম বলে তিরিশ টাকা। বউ কুলো, চালুনি, ধুচ্‌নি, বেচতে যায় হাটে। হাল্‌কা জিনিস। কিন্তু ওগুলো তো বাঁশের চ্যারাটি থেকে তৈরি হয়—বাঁশ কিনতে হয়—এখন একটা ভেল্‌কো বাঁশের দাম পনেরো টাকা।

লালমন বলে, 'তা নেবে না, তোরা তো বাঁশবাগানে ডোম কানা। দুখানা বাঁশ নিবি, তা কোন্‌টা কাটি কোন্‌টা কাটি করে দুঘন্টা বাঁশবাগানের মশাকে ভোগ দিবি। বাছাই বাঁশ নিবি—দাম কি কম পড়বে? গঙ্গার ইলিশের জাল ভাসানোর জন্যে জলধর জেলে আমার কাছ থিঙে দশটা বাছাই ঢুলি ভেল্‌কো আক বাঁশ্‌নি বাঁশ কিনে নিয়ে গেল। তা কুড়ি টাকা করে দাম ধরিচি'।....

'তবেই বোঝ নানী, সস্তায় মাল দোব কি করে আমরা'?

'এক কাজ কর নন্দ, বাঁশ-কঞ্চি নিয়ে যা তুই, পাঁচটা মাটি কাটা ঝোড়া, চারটে গোয়ালকাড়া বা গরুর গড়ায় খড় দেওয়া গোলঝোড়া, দুটো ঘাইঝোড়া, চারটে চুব্‌ড়ি, দুটো ধুচ্‌নি, চারখানা কুলো, দুটো 'চান্নি' বেঁধে দিয়ে যা। মজুরি দিয়ে দোব। আমাদের বড় সংসার।'

বেশি কথা বলা বা গল্প করার সময় নেই নন্দর। সূর্য ওঠার আগেই হাটের জায়গা দখল করতে না পারলে অনেক দুর্ভোগ। হাটে এসে নন্দ দেখে, ঝোড়া ঝাঁকার সমুদ্র। কোথা থেকে এত মাল আসে? ফুলুরি মুড়ি আর একপেট জল খেয়ে সারাদিন রোদে বসে থাকতে হয়। শহরের পাইকের এসে সস্তায় অনেক মাল নিয়ে চলে যায়। ভাল মাল সস্তায় দেওয়া যায় না। চাষীদের কাছে খুচরো বেচতে সাঁজবাতি জ্বলে যায়। রাতে ফিরে জ্বর হয় নন্দর।

লালমন অবাক হয় নন্দ মাস খানেকের ভেতরেও আসে না। কোন্ হাটে যায় কে জানে। লালমনের বুড়ো কানাই মোল্লা বলে, 'মজুরিতে ওরা কাজ করে দেবে না।

কত মজুরি তুমি দেবে? কুড়ি টাকা রোজ ওদের। বউ ছেলেমেয়ে সবাই কাজ করে সেই ভোরবেলা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। তবু দুবেলা ভাত হয় না। মাটির কুঁড়েঘর। হুমড়ি খেয়ে আছে। এক কাঠাও জমি নেই কারো। যারা ওদের মধ্যে ভাগচাষী ছিল জমি দখল করলেও টাকার অভাবে চাষ আবাদ করতে না পেরে বন্ধকে উড়িয়ে দিয়েছে। আমি দেখেছি ঐ নন্দর বউ ঘোষদের মুদি দোকানে থালা হাঁড়ি কাটারি বন্ধক দেয়। সাত আটটা ছেলে। আর পাঁচটা মেয়ে পার করতেই নন্দ ডোম হাভাতে হয়ে গেছে। কতবার মার খেয়েছে পেটের জ্বালায় পরের ঝাড় থেকে বাঁশ কঞ্চি চুরি করতে গিয়ে। ছেলেগুলোকেও লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারল না। যে দুটো ছেলে ক্লাস সেভেন এইট পর্যন্ত পড়েছিল তারা নাকি আরও অমানুষ হয়ে গেছে—হিন্দি সিনেমা দ্যাখে, ফুলপ্যান্ট পরে, পকেট মারতে যায় শহরে, ডোমের কাজ করতে এখন তারা অপমানবোধ করে'।

ডোম, তিয়োর, বাগ্‌দি, জেলে, মুটি, কুমোর, তেলি, মালী এসব শব্দগুলোকে তুলে দিয়ে শুধু তফসিলী বললে এদের সম্প্রদায়গত বৃত্তি এখনও উঠে যায়নি। কাজের ভাগ যেভাবে ছিল এখনও আছে—তবে সব সম্প্রদায় থেকে এখন শিক্ষিত মানুষ তৈরি হচ্ছে, অনেকে কলকারখানায় সর্বজনীন শ্রমিকে পরিণত হয়েছে—মূলত এরা চাষী গেরস্থ। দক্ষিণবাংলায় এরা ছেয়ে আছে। তবে কাঠের ঘানি উঠে যাওয়াতে তেলিরা এখন বিভিন্ন বৃত্তি নিতে বাধ্য হয়েছে। বাগ্‌দিরাও শেষ হয়ে যাচ্ছে—যদিও এরা জেলেদেরই একটা অংশ। যতদিন বাঁশ আছে, বাঙালিরা 'বিলসে মাছ' খাচ্ছে, মানুষ ঝোড়া, চুব্‌ড়ি ব্যবহার করছে, ততদিন ডোম বা তিয়োররা থাকবে।

ড্যাবডেবে চোখ, ডাগর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ভরত ডোমের বউ কালীদাসী এখনও পাড়ায় আসে কয়েক ডজন কুলো আর চালুনি নিয়ে। তাদের ঘিরে মেয়েদের হাট বসে যায়। কালীদাসী বলে, 'য়াখো মা এট্টা কুলো, চাল পাছড়াতে, ধান পাছড়াতে, ধানে কুলোর হাওয়া মারতে লাগবে। কেনা চাল এখন ঘরে ঘরে—কাঁকর ভর্তি। চেলে নেবে এই চালুনিতে। আমার নিজের হাতেগড়া মাল পাকা। কাঁচা মাল দিয়ে আমি ঠকাইনি।'

দুটো চারটে কুলো চালুনি বিক্রি হয়। কিন্তু তার চাইতে কালীদাসীর সংসারের খবর বিক্রি হয় বেশি। গ্রামের বন্দী সংসারের মেয়েরা বাইরের কোনো মেয়ে পেলেই দুটো কথা বলে প্রাণ জুড়োয়। কালীদাসী বলে, 'ডোমের ঘরেও মা এখন সোনা আর পণের চাপ। কত জায়গা থেকে দেখাশোনা হ'ল পার করতে পারছি না।'

একটি বউ বলে ফেলে, 'তাই বুঝি সঙ্গে নিয়ে বেরোও—যদি কারো মনে ধরে'?

কালীদাসী বলে, 'তা নয় মা, বাড়িতে 'য়েখে' আসতে ভয় করে। যা দিনকাল

হয়েছে'।

শুধু বাঁশবাগানে ডোম কানা নয়, দক্ষিণবাংলার অসুস্থ সমাজে বেঁচে থাকার দায়ে এখন্ ডোমেরা কানা হয়ে গেছে। চোখ কান বুজে, দিনভর খেটে কোনমতে আধা দিন গুজরান করে চলে।

হনুমানের খাদ্য / কলা এখন শহুরে বাবু বিবিদের ভোগ্য

'হুনোমান' কলা খাবি, বড় বোয়ের বাবা হবি?' কলা বাঁদর-হনুমানের প্রিয় খাদ্য, তাই হাওড়া-হুগলি জেলার নানা জায়গায় ডারউইনের পূর্বপুরুষদের দৌরাত্ম্যে কলার কাঁদিকে পাকার আগে রীতিমতো চট জড়িয়ে রাখতে হ'ত, তারপর গাছপাকা কলার রেওয়াজ উঠে গেল কারবাইড সভ্যতার যুগ এসে পড়াতে। বাগান মুড়িয়ে কাঁচা কলা ব্যাপারীরা কেটে নিয়ে যায়, বাঁদর-হনুমানের গালে হাত। তাই তাদের পুঁই চারার ডগা, কাঁকুড়-ফুটিক, তরমুজ, বেগুন, চিচিঙ্গে, পটল, নানান ফল-ফসল খেয়ে দিন-গুজরান করতে হয়।

পৃথিবীতে মানুষ এত বেশি হয়ে গেছে যে বন-জঙ্গলে কলা পেকে থাকারও এখন উপায় নেই, বাঘের ভয় ত্যাগ করে মানুষ জঙ্গল-ঝাঁট দিয়ে হাঁস-মুরগির ডিম নিয়ে এসে শহরের সর্বভুক হাঘরে মানুষদের খাওয়াতে যায়। যখন রাম রাজত্ব ছিল তখন ছিল হনুমানদের সংখ্যাধিক্য, আর নানারকম কলারও প্রাচুর্য। বনে জঙ্গলে অজস্র কলা পেকে থাকত। খেত বাঁদর-হনুমান আর বাদুড়। তারপর ক্ষুধা তাড়ানোর এহেন কদলী অমৃতকে সমাজ-সংসার পাতা মানুষ তাদের বাসগৃহের চারপাশে গণেশের বউরূপে এনে বসালো। 'একশো আশি ঝাড় কলাগাছ রুয়ে, থাক রে চাষা মাচায় শুয়ে'—খনার প্ররোচনায় মানুষ অঢেল জায়গায় কলাগাছ বসিয়ে মাচায় শুয়ে রইল স্বর্গে ঠ্যাং তুলে। পাশে তার হনুমান তাড়ানোর লাঠি।

হনুমান আগে না কলা আগে, মুরগি আগে না ডিম আগে এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসী মানুষই সর্ব অধম প্রাণী যাকে সবায়ের ওপর নির্ভর করতে হয়।

অণু থেকে বীজ—বীজ থেকে প্রাণ। প্রাণী জন্মাবার পর বাঁচার দায়ে নানান পদ্ধতি গড়েছে, প্রকৃতি পালটেছে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, আইন আর ধর্ম এসেছে, ভগবানকে কলা খাইয়ে বলেছে তুমি আমাদের রক্ষা করো।

ছোটছেলে পাকা কলা খেতে যত ভালবাসে দন্তহীন ফোগ্‌লা দাদুও তেমনি। চোদ্দ বছর কেন, সারাজীবন জঙ্গলে কলা খেয়ে রামচন্দ্রের ভালই কাটত অযোধ্যা শহরের জটিল রাজনীতি ছেড়ে কিন্তু বেচারার বউ চুরি করে নিয়ে পালাল একজন রাজা। জঙ্গলেও রাজনীতি। কলাগাছ লণ্ড ভণ্ড করে হুপহাপ করে বেরিয়ে এলো হনুমানরা। ন্যাজে আগুন জ্বালিয়ে যখন সে লঙ্কা পোড়াচ্ছিল নিশ্চয়ই রাক্ষসের দেশে আদৌ চোখে পড়েনি তার পাকা কলার কাঁদি। সে মর্তমান, কানাই বাঁশি, রামকানাই, চাঁপা

কিংবা কাঁটালি যে কলাই হোক।

অনেকরকম কলা মানুষ বন-জঙ্গল আর দেশ-বিদেশ থেকে ঘরে এনেছে। যত রকমের কলা আছে তার মধ্যে সেরা হল মর্তমান। ঢাকাই মর্তমান সবচেয়ে বড় হয়। ছ'টার বেশি কেউ খেতে পারবে না। চাঁপা কলার সবচেয়ে সুঘ্রাণ। কালীবউ কলা-এর উত্তম জাত। কাঁটালি কলাই প্রচুর হয়। পুজোয় ব্যবহার হয়, অর্থাৎ ব্যাপকভাবে চাষ করো। এতে বিচিও হয় কখনো কখনো। যার মধ্যে বীজ হয় তার তলার দিকটা মোটা। অর্থাৎ গলাটা সরু। কৃমি হলেও যেমন বাচ্চাদের গলা সরু হয়ে যায়। যে শসা তেতো হয় তারও গলা সরু হয় অর্থাৎ রোগাক্রান্ত। কিন্তু বোচ্চে কলার ভেতরে অসংখ্য বীজ। একটা কলা খেতে দশ বারো মিনিট লাগবে। বোচ্চে কলার সরবৎ খুব ঠাণ্ডা। এই কলার গাছ হয় সবচেয়ে প্রকাণ্ড। এর থোড় আর মোচার জন্যেই বাড়তি জমিতে চাষ করে চাষীরা।

রান্না করে খাবার জন্যে কাঁচকলার চাষ হয়েছে ব্যাপকভাবে। কাঁচকলার মধ্যে ভুষ্‌নো, বাঁখারী আর লস্বী এই তিনজাত। পাকা কাঁচকলাও বেশ টকটক মিষ্টি মজাদার। কচি কাঁটালি কলাও তেতো বা শুতো রেঁধে খাওয়া হয়।

সিঙ্গাপুরী কলার গাছ সবচেয়ে ছোট ছোট। কাঁদি মাটিতে ঠেকে যায়।

কিন্তু শহরের হোটেল, শ্রাদ্ধবাড়ি, পুজো পার্বণ কলাচারা আর পাতার ছাদ্দ করছে রোজ—আর আছে ঝড় বন্যা—তাই কলার এতো টানাটানি—এতো দাম।

কলাচাষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হয়েছে। সারিবদ্ধভাবে কতদূর ছাড়া ছাড়া লাগাবে, কি সার দেবে, কতদিন পরে ঝাড় তুলে ফেলবে ইত্যাদি। কিন্তু এখনো টবে কলাচাষ করা যায়নি।

মানুষ যে বাঁদর হনুমান থেকে হয়েছে ডারউইনের এই মেরুদণ্ডবাদ বিশ্বাস হয় যখন মনে পড়ে ছোটবেলায় কলা চুরি করে খাওয়ার কথা। গোছা কাঁদি আমরা চুরি করে বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখতাম। আর দিন-পাঁচেক পরে গিয়ে বার করে দেখতাম, পেকে সমস্ত মনজুরে হয়ে গেছে। গলা পর্যন্ত খেয়ে বাকিগুলো মামাদের যারা বলে দেবে না তাদের বিলিয়ে দিতাম। লুকিয়ে তাড়াতাড়ি আধগেলা করে খাবার জন্যে গলায় উঠে আসত আবার। দু-ছড়ার বেশি কি খাওয়া যায়? তাই তো দুপুরে ভাত খাবার সময় ধরা পড়ে যেতে হ'ত।

ধানের গোলার মধ্যে বিশ পঁচিশ কাঁদি কলা কেটে এনে রাখা হ'ত। তাও চুরি করে খেতাম। আধ পাকা কলা হাতে ঘষে ঘষে নরম করে নয়, কাল্‌চে খোসার 'লুলে' যাওয়া পাকা কলা দিয়ে মুড়ি খেতাম আর গাই দুধ দিয়ে কলা চটকে ভাত দিত নানী। সেদিন গয়ায় গেছে। একন পাকা কলা গ্রাম থেকে বিদায় নিয়েছে। শহরের

রাস্তায় এখন কলা পাকে। ফেল কড়ি মাখো তেল। দুটো ভালো মর্তমান দেড় টাকা। বাঁদর হনুমানের খাদ্য এখন শহর নগরের ওপরতলার বাবুবিবিদের ভোগে লাগছে। বাঙালির পেট খারাপ, কলা খেলে পেট আঁটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য কাঁচকলার ঝোল, খাবে—তাও এক টাকা জোড়া? ও হো, কলার কী পরম ভাগ্য!

কলা রুক্ষ মরুভূমি বা পাথুরে জায়গা ছাড়া সরস মাটিতে পৃথিবীর বহু দেশে জন্মায়। কলার রকম চেহারাও আলাদা আলাদা। রামকানাই বা বামসিঙ্গা পাহাড়ী বনজ কলা। পাকলে বাদামী লাল হয়ে যায়। বাকি প্রায় আর সব পাকা কলা হলদে। তবে সিঙ্গাপুরী বা কাবুলী কলা পাকলে কিছুটা হলদেটে হয়, সবুজাভা থেকে যায়। সিঙ্গাপুরী কলার কাবুলী কলা নাম কেন হ'ল বলা শক্ত। কাবুলীদের বড় সড় চেহারার সঙ্গে এর কী সাদৃশ্য আছে? আর কাবুল থেকেও তো আসেনি কলাটা। 'তেলাপিয়া মোজাম্বিক' যেমন হয়ে গেল আমেরিকান কই!

বারুইপুরে লিচু পেয়ারা লেবু চাযের প্রাধান্য থাকলেও কলাচাষের রেওয়াজ বাড়ছে। এরজন্য প্রচুর জায়গা চাই।

কেমন করে কি চাষ করতে হবে রেডিও টেলিভিশন খবরের কাগজ দু-বেলা পাঠ দিচ্ছে, (সরকার লোনও দিচ্ছে অবশ্য পার্টির লোকদের) কিন্তু জমি কোথা পাওয়া যাবে সে কথা আদৌ বলছে না।

যাদের জমি আছে তারা শুনুক পড়ুক কিন্তু যারা ক্ষেত মজুর তাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা অত শোনার ধৈর্য্য কোথা—দামকড়ির জন্যে যাদের সন্ধ্যার পর মশা চাপড়াতে হয়। যাদের জমি থাকে তারা কি কোনোদিন নিজের হাতে চাষ করেছে না করে? তারা তো বাবু। শহরে গ্রামে দু'দিকে দুটো ঠ্যাং তাদের। মাঝখান দিয়ে বিজ্ঞানের সমস্ত আয়োজন বয়ে চলে যাচ্ছে।

বেহুলার ভেলায় আমাদের নিয়ন্ত্রিত ভাগ্য ভেসে চলেছে। তার কোলে একছড়া পাকা কলা দেবারও কেউ নেই।

এক ভদ্রলোক বলছিলেন, 'কলার গল্প যখন বার করলেন তখন শুনুন, আমি গেছি একবার অন্ধ্রপ্রদেশে। গ্রামের পথে হাঁটছি। মাথায় রোদ। ভীষণ ক্ষুধার্ত। পথের পাশে দেখি সুদীর্ঘ বিরাট বিশাল কলা বাগান। ইয়াহিয়া আখাম্বা কলা সব পেকে আছে কাঁদিতে। হতভাগা হনুমানরাও সন্ধান পায় না। লঙ্কাকাণ্ডে তারা কি সব মরে গেল? হঠাৎ দেখি কালো মাজাভাঙা এক বুড়ি চশমা চোখে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে চকচকে রূপোলী ছড়ি হাতে আসছে। আমি গ্র্যাজুয়েট ইংরেজিতে বললাম, মা-জননী, আমি একজন বহিরাগত বাঙালি ব্রাহ্মণ—বড় ক্ষুধার্ত—এই বাগানে যে কলা কাটছে, আমি কি কিছু কিনতে পাব?

বুড়ি মা বলল 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এসো আমার সঙ্গে, ওই তো আমার কটেজ—এসো বাছা ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ, তোমাকে কলা খাওয়াচ্ছি।....'

বুড়ি মায়ের মুখে ইংরেজির যেন খই ফুটছে। কটেজে এসে আমাকে বসিয়ে চাকু দিয়ে সেই বুড়িমা এক ছড়া কলা কেটে দিল। বসে বসে ছ-টা কলা মাত্র খেতে পারলাম। উদর একেবারে পরিপূর্ণ। বাকি অপার ছ-টা কি হবে? ব্যাগের মধ্যে ভরে নিতে উপদেশ দিল বুড়িমা। পথে কাজে লাগবে। দাম দিতে গেলাম। বুড়িমা নিল না। বলল্ 'তা কি হয়? মানবধর্মে বলে এক কথা? ক্ষুধার্তকে কলা খাইয়ে পয়সা নেব এমন অধম খৃষ্টান আমি নই বাপধন। তায় আবার তুমি একজন ব্রাহ্মণ। শুধু আশীর্বাদ করো, কলাবাগানটায় যেন আমার লোকসান না হয়—পঞ্চাশ হাজার টাকা ঢেলেছি। আমার মাস্টারী করা সারাজীবনের সঞ্চয়।'...

দেশের প্রো-হিন্দু কালো খৃস্টান - বুড়িমা কি তাল বুঝে তার একছড়া পাকা কলা দিয়ে পুজো সেরে নিল?

খনা কি এখন ওইরকম আধুনিক কলাচাষী খৃষ্টান বুড়ি হয়ে গেছে অন্ধ্রে গিয়ে ?

আর বাংলায় বেহুলার কলার ভেলা ভেসে চলেছে মরা লখিন্দরকে নিয়ে কোন্ নিরুদ্দেশে তার কোনো হদিস নেই।

গ্রামের যেসব লোকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এখনও বাবুদের কবি

বর্ষাকালকে রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে বন্দনা করেছেন মূলত তিনি শহরের বাবুলোক ছিলেন বলে। গ্রামের শতকরা সত্তরভাগ মানুষ যারা এখনও মাটির ঘরে বাস করে, ঝড়-বাদলে বা বন্যায় যাদের ঘর পড়ে যায়, গলে যায়, ভেসে যায় তাদের কাছে বর্ষার বন্দনা বড় করুণ মৃত্যুহিমশীতল মনে হয়। কাদা রাস্তায় তাদের কাব্য আসে না। খালি পায়ে শুঁয়োপোকার কাঁটা লাগে, চুলকে চুলকে ব্যাথায় পা ফুলে যায়। বাচ্চাদের পা অপারেশনও করতে হয়। বর্ষায় জিউলি বা সজনে গাছে পাতা গজায়, এই দু'টি গাছে শুঁয়োপোকা ছেয়ে যায়। বেয়ে বেয়ে আসে ঘরে দোরে। গায়ে লাগে মানুষের। ডাঙ্গায় কাজ করতে গিয়ে চোখে পড়লে হাসপাতালে দৌড়তে হয়।

বর্ষায় খানা ডোবা ভরে গেলে লতাগুল্ম পচে ওঠে। অসংখ্য মশা জন্মায়। মশার কামড়ে সন্ধ্যার পর মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ধান রুইতে গেলে হেঁতো জোঁক পা বেড় দিয়ে ধরে জলের তলায়—গরু এবং মানুষের। খসখসে ডুমুর পাতা দিয়ে তাকে চিপ্‌টে ধরে টেনে তুলতে হয়। তারপর তার মুখে নুন ঢেলে দিলে গলগল করে শোষিত রক্ত বেরিয়ে যায়। শীত বা বর্ষায় ঘাসের আগায় থাকে শিশিরে জোঁক। এমনভাবে প্রাণীদের দেহে বসে কাটে যে তারা কিছুতেই টের পায় না। রক্ত খেয়ে ঝরে পড়ার পর যখন কিটকিট করে তখন মানুষ টের পায়। রক্তে ভেসে গেছে কাপড় চোপড়। প্রবাদ আছে জোঁক যতটা রক্ত টানবে ততটা আবার ঝরে পড়বে। ক্ষত মুখে ঝাঁটাকাঠির ডগা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। শুঁয়ো লাগলে ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলে পুঁইপাতা ঘষে দিলে কাঁটা উঠে চুলকোনো কমে যায়।

শুঁয়োপোকা খায় পাপিয়া পাখি। নইলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

বর্ষায় আর একটা দৌরাত্ম্য সাপের। শীতকালে সাপ এবং ব্যাঙ গর্তের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে তিন-চারমাস ঘুমোয়। শরীরের চর্বিই তখন তাদের ক্ষুধা নিবারণ করে রাখে ফাল্গুনের গরম পড়লেই মাটির ভেতরকার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। ক্ষুধায় তখন তারা দিশাহারা। সাপেরা বেয়ে বেড়ায় চারিদিকে। অসাবধান মানুষকে ছোবল হানে। ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে যে সমস্ত সাপ দেখা যায় তাদের মধ্যে প্রধান হ'ল চন্দ্রবোড়া, শাঁখামুটি, শিয়রচাঁদা, পদ্মগোখরো, কালকেউটে, তেঁতুলে খরিশ, গৌড়িভাঙা কেউটে বা করাতে সাপ, ব্যানাফুলী কেউটে, কালনাগিনী, উদয়নাগ, দাঁড়াস, জলঢোড়া, মেটুলে, লাউডগা, কাঠসাপ এবং হেলে সাপ।

গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে কত লোক সাপের কামড়ে মারা যায়। বর্ষায় ব্যাঙেরা ঘ্যাঁ ঘোঁ রবে ঐক্যতান তোলে সারা রাত। তাদের বাচ্চা হয়। সাপেরা সেই ব্যাঙ বা মাছ খেয়ে ক্ষমতাশীল হয়। বাচ্চা ছাড়ে ডিম পাড়ে। অজস্র রকম পোকামাকড় জন্মায় এই বর্ষায়। উইচিংড়ি বা 'ওচোঙ্গা' হ'ল প্রধান। চারা গাছপালা কেটে দেয়। গর্তের মধ্যে দিয়ে যায়। শীতেও এরা মরে না। কপি চারা কাটে। বর্ষায় ভিজে দেওয়ালে বা ভিজে বাঁশ, কাঠ, পাতায় উইপোকা লাগে। বর্ষা আসে চাষ-আবাদের জন্য বটে কিন্তু গরু মোষের পায়ের ক্ষুরের মধ্যে এঁশো রোগ আনে। তাতে পোকা জন্মায়। গরু মোষ মারা যায়। মানুষের পায়ে হাজা খায়। কিটোনোর চোটে অস্থির করে তোলে।

কলকাতা শহরে বর্ষা নামলে অস্থায়ী জলে পথ ভেসে গেলেও কিছুক্ষণ পরে তা নদীতে চলে যায়—আবর্জনার সঙ্গে মরা বিড়াল, কুকুর, কাঁঠালের ভুতি, ডাবের খোলা, ঝাঁটা, জুতো ভেসে যায় বটে আবার সব পরিষ্কার হয়ে যায়—কিন্তু তাতে সম্মানিত মেয়রের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করা হয়।

প্রকৃতির মধ্যে বাস করে বলে গ্রামের মানুষরা তার সব রকম দুঃখ কষ্ট এবং ভয়াবহ দৌরাত্ম্যও সহ্য করে নেয়। শীতে তার কাঁথা মুড়ি দিয়ে হাড় কাঁপে, গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে গায়ের চামড়া পুড়ে কালো হয়ে যায়। বর্ষায় আবার ভিজে ভিজে সর্দি-জ্বরে ভোগে। এই বর্ষায় শাকপাতা খেয়ে আসে আমাশা রোগ। আসে ক্রিমি। বসন্তকাল এলে লাগে কলেরা, টাইফয়েড। গ্রামকে বাইরে থেকে দেখতে সবুজ কিন্তু তার জীবগুলো হয় প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচা কর্কশ-কাঠের।

বর্ষায় গ্রামের মোড়ল মহাজনদের ডানচোখ নাচে যাদের আছে গোলাভরা ধানচাল আর সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় মুদিখানাগুলোয়। চাল ডাল তেল নুন আলুর দাম বাড়ে। মুদিখানায় এ্যালোপাথিক ওষুধ বিক্রি হয়—একটা পঁচাশী পয়সার পেনটিড ফোর হাড্রেড ট্যাবলেট এক টাকায়। যদিও তাদের ওষুধ বেচার লাইসেন্স নেই তবু তারা মানুষের দায় দরকারে ওষুধ রাখতে বাধ্য হয়। থানার বাবুরা সন্ধান পেয়ে এসে ধরলে কিছু নজরানা দিতে হয়।

গ্রীষ্ম বর্ষা শীত সব ঋতুতেই তাদের বাঁধা বন্দোবস্ত থাকে।

শহরের মানুষদের বলতে শোনা যায়, গ্রামে তো সবই সস্তা! কিন্তু তা নয়। বরং নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলোর দাম শহরের চেয়ে অনেক বেশি। যেমন লঙ্কা হলুদ তেল ঘি আটা সাবন আলু এমনকি আনাজ পর্যন্ত। এক জায়গার উৎপন্ন দ্রব্য শহর ঘুরে আবার অন্য সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

বর্ষাকাল তাদের জন্য ভাল যাদের গোলায় আছে ধান, পুকুরে আছে মাছ, আছে পাকা বাড়ি আর ব্যবসা-বাণিজ্য। বর্ষায় তারা বেহালা বাজায় ওপরে পা তুলে। তাদের

বুড়ো কর্তারা সকাল সন্ধ্যায় আহ্নিক-পুজো করলেও গরিবদের থালা হাঁড়ি লাঙল কোদাল গহনা জমি কড়ারি বন্ধক রাখে।

কলাবন সাফ করতে গিয়ে কোন চাষীকে ভীমরুল কামড়ালে সোনার বেনের কাছে এ্যাসিডের ছোঁয়া লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতে গেলে দু'টো টাকা লাগে।

কাঁটাল, গুড়ের ডাবরি, আনাজের বাজরা, ধানের বস্তা, মাটির হাঁড়ির ভারি বোঝা মাথায় নিয়ে একহাঁটু কাদা ভেঙে যেসব চাষীরা হাটে-বাজারে যায় তাদের নাভিশ্বাস বয়, মাথার ঘামে পা ভেসে যায়—তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের ভাষা এখনও বাবুদের ভাষা। সাগরদ্বীপের খড়-ছাওয়া মাটির ভুঁইকুড়তে বর্ষায় এখন ভীষণ ঝড়ের দাপট। খালে-বিলে অজস্র চিংড়ি আর কেঁকো বা কাঁকড়ার বাচ্চা। পিঁয়াজ ঝাল দিয়ে তাই চচ্চড়ি করে খেয়ে ওলাউঠোর বান ডাকে। পথঘাট পায়খানায় নোংরা হয়ে যায়। মাছিতে রোগ সংক্রামিত করে।

নদীগুলোয় বান ডাকে, সাগর থেকে ডিম ছাড়তে ছুটে আসে ইলিশ। জাল ফেলে জেলেরা তা ধরে নিয়ে চারটের ভোরে বাসে করে শহরে পাঠিয়ে দেয় বেশি দাম পাবার লোভে।

নদীর ধারের মানুষরা এখন আর ইলিশ মাছ পায় না।

বর্ষা এসেছে সাধারণত ক্ষেত মজুরদের কাজ নিয়ে। ধান রোয়া শুরু হয়েছে, তাই তাদের ডাকাডাকি। কিন্তু দশ টাকা রোজে সংসারের চাল আটাও কিনতে কুলোয় না। ছেঁড়া কাপড়ে কেবলই গেরো বাঁধতে হয়। সেলাই লাগাতে হয়। মশারি বিহনে কত লোক এই আটত্রিশ বছরের আধবুড়ো স্বাধীনতায়ও কুকুরের মত ছেঁড়া চ্যাক্‌ড়ায় পড়ে থাকে। মশা, মাছি, সাপ, জোঁক, শুঁয়োপোকা, ভীমরুল, ডাঁস, কাঁটাখোঁচা, শিয়াল, বাঘ কারও সঙ্গে তাদের আড়ি নেই।

এই বর্ষায় ট্রেন বাস লরি বন্ধ—মালের দাম তাই বেড়ে যায়; মজুরি যখন পাচ্ছ গরিব হলেও নগদ কিনে খাও, মুদিওলা যতই দাম বাড়াক।

তিরিশ থেকে আশি মাইল দূরে কলকাতা শহর, রাত্রে আকাশ আলো হয়ে থাকে। ইলেকট্রিক এসেছে গ্রামে, যারা বাবুক্লাস তা' নিতে পেরেছে, রেডিও টিভি চলছে, রবীন্দ্রনাথের গান তাদের ভাল লাগে। যাদের সামনে এখনও হ্যারিকেন লম্ফ জ্বলে তাদের মঝে মাঝে কেরোসিনের জ্বালায় সাত গেরাম ছুটতে হয়। মাঝে মাঝে পাঁচ টাকা লিটার।

গাঁয়ের হাটে বর্ষা নামলে এখনও ছাতায় ছত্রাকার। কারও কারও মাথায় তালপাতার পেখে ভিখারিরা ভিজে জুজড়ি হয় হাটের বেনামী কুকুরদের মত। বাবুদের নিয়নজ্বলা মোজেক করা বারান্দায় তারা বেমানান। অন্য জায়গায় উঠতে হুকুম চালায়।

তবু বর্ষা বড় ভরসার ঋতু। ভিজে মাটিতে সবুজের সমারোহ। এটাই প্রকৃতির জন্মমাস।

বিজ্ঞানের সুষ্ঠ ব্যবহার তরান্বিত না হলে প্রকৃতিকে জয় করে গ্রাম থেকে দারিদ্র্য দূর করা অসম্ভব। গ্রামীণ দুঃখ কষ্টের স্বাদ শহরের বিধাতা পুরুষরা আদৌ জানেন না সেটাই আরও দুঃখের।

যুধিষ্ঠিরের নন্দনকানন

যুধিষ্ঠিরের নন্দনকাননে প্রবেশ করা গেল। উদ্যানের মধ্যস্থলে তরুচ্ছায়া বেদীর ওপরে বসে আছেন যুধিষ্ঠির। লক্ষাধিক ফুল ফল বাহারী গাছের সুবিন্যস্ত সারির মনোরম দৃশ্য। পাকা রাস্তার গায়েই নার্শারীর মুখেই দোতালা বাড়ি। লরি, ম্যাটাডোর, টেম্পো, রিক্সা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ফুল ফলের চারাভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে নানান পাইকের।

বহুভাষী মানুষের ভিড় যুধিষ্ঠির গায়েনের কাছে। ষাট বছরের মানুষটি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঠায় বসে হুকুম চালাচ্ছেন বাগানের মালিদের। মস্ত বড় বাগানে কে কোথায় কি কাজে ব্যস্ত সবই তাঁর নখ-দর্পণে। মুসলমান মালি মেয়েটিকে তিনি টাকা গুণতে গুণতে বকাবকি করেন 'পঞ্চাশটা বনসাই রাধাচূড়া দিতে তোমার ক'ঘন্টা লাগবে গো বাহারণ বিবি? খরোখরো একটু হাত পা চালাও'।

একটানা কথা বলা মুসকিল। পাইকেরদের সঙ্গে দরের হেচাহিচি। চাষী খদ্দেরদের বোঝাতে হয় কোন ফলের গাছটা কিভাবে লাগাতে হবে। কোন চারার মার নেই।

বৃটিশ সাহেব খদ্দের এসেছেন। বাগানের সিমেন্টকরা পথে ঘুরে ঘুরে গাছপালা দেখছেন দু'জন অনুচরের সঙ্গে। সরু সরু পাইপ লাগানো জলসেচের ব্যবস্থা আছে গোটা বাগানে।

হিন্দুস্থানী পাইকেরই বেশি। নানা জেলার নার্শারির অর্ডার নিয়ে এসেছে। পাঁশকুড়ার পাইকের তরুণ শিক্ষিত ছেলেটির পেট খারাপ হয়ে গেছে শুনে যুধিষ্ঠিরবাবু তাঁর বউমা শিপ্রাকে বললেন, 'আ-যোয়ন' গাছের একটা পাতা অল্প একটু বিট নুন দিয়ে নিয়ে এসে খাইয়ে দিতে। গ্যাসে পেট-আঁকড়ে-ধরা তরুণটি বাস্তবিকই কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে গেল। 'রোড সাইডস' (পথতরু) অর্ডার দিল সে। সরকারি কন্ট্রাকটর। পঞ্চাশটা করে প্রত্যেকটা গাছ। মেহগনি, ছাতিম, শিরীষ, কদম্ব, বট, অশ্বত্থ, দেবদারু, ঝাউ, শাল, সেগুন, পুত্রন্‌জীব, ফ্যাস্‌ফেসিয়া, শিশু, কৃষ্ণচূড়া, গুলমোহর, সোঁদালী, জারুল, কনকচাঁপা, পলাশ, অশোক, মহানিম, কথ্‌বেল, পাঁকুড়, বকুল, নিম, অর্জুন, বাদাম, করমচা, হিজল, তেঁতুল আর বাবলা।

যুধিষ্ঠিরবাবু বললেন, 'বাবলা আর কথ্‌বেল বাদ দাও বাবা, কাঁটাওলা গাছ, ঝড়ে পথে পড়লে অসুবিধা হবে।'

বৃটিশ ভদ্রলোক এলেন। যুধিষ্ঠিরবাবুর আগের পরিচিত মানুষ। পৃথিবীর বহু

জায়গায় নার্শারি আছে নাকি তাঁর। দার্জিলিং, দিল্লী, বোম্বাই, সিঙ্গাপুর, লণ্ডন, ক্যানবেরা, ওয়াশিংটন। তিনি বললেন, 'দিল্লিতে গাছপালা বাঁচানো সবচেয়ে কষ্টকর।' —ভদ্রলোক ভারতীয় জন্মোদ্ভূত কিন্তু বৃটিশ নাগরিক। রঙ সাহেবী। নামও। স্বাস্থ্যও দশাসই। যেসব গাছ তিনি নতুন দেখেন নিয়ে যান।

চা বিস্কুট দিয়ে গেল বউমা। বড়ছেলে সমর গয়েন খাতা পেন্সিল হাতে নিয়ে মালিদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। মেজ ছেলে ভোলা আছে অন্য বাগানে।

যুধিষ্ঠিরবাবু বললেন, 'ছেলেদের ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়িয়েই বাগানের কাজে লাগিয়ে দিয়েছি, পাশ করে চাকরি করতে গেলে খাবি খেত। আমি ছোটবেলায় পরের বাগানে মালির কাজ করতুম। মাত্র দশকাঠা ভিটে ছিল পৈতৃক। তাতেই সবজি চাষ করতুম। জন খেটে পয়সা পেতুম না। একদিন এক সাধু বললেন, পয়সা মাটির নিচে পোঁতা আছে, তুলে নাও। মানুষের উপকার করো, যে ঠকাবে, তাকে অবিশ্বাস করাও পাপ আবার বিশ্বাস করাও কঠিন, প্রকৃতির গাছপালাকে ভালবাস, তার সেবা করো, সে ঠকাবে না।—কথাটা মনে লাগল। আস্তে আস্তে দুটো চারটে করে ফল ফুলের চারা এনে নার্শারি গড়লুম। দশ কাঠা জায়গা কিনলুম। পরের বছর এক বিঘে। তার পরের বছর বন্যায় বাদলে চোট খেলাম। পাঁচ বছর পরে আর একবিঘে জায়গা কিনলুম। দুবিঘের নার্শারি চলতে লাগল। আমি চারা পিছু মাত্র চার আনা লাভ রাখি। সাধারণ গাছে মাথাপিছু দেড় টাকার ওপরে খরচ। খইল সারের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। লাভ করে পাইকেররা। পাঁচ টাকার চারা দশ টাকায় বেচে'।

শুধোলাম, 'প্রায় সমস্ত গাছেরই তো ইংরেজি বা ল্যাটিন নাম অথবা অন্যদেশীয়, আপনি অতি সামান্যই পাঠশালায় লেখাপড়া করেছেন বললেন, কি করে মনে রাখেন?

১৩০০ টাকায় কেনা 'এক ঝোটিকা' নামের একটি পুস্তক আনালেন তিনি বাড়ি থেকে। ১৭০০ ফটো আছে তাতে। বহু বিচিত্র রঙিন ছবিও। হাজার হাজার গাছের নাম। এখন পুস্তকটির দাম নাকি ১৮০০ টাকা। প্রথম খণ্ডে আরও বহু রঙিন ছবি আছে। প্রায় পৃথিবীর সব গাছই আছে এই পুস্তকদুটিতে।

বললাম, 'যাঁরা বোটানীতে ডিগ্রি লাভ করেন, তাঁরা তো সব গাছকেই চেনেন'?

যুধিষ্ঠিরবাবু জর্দা পান গালে পুরে বললেন, 'জওহরলাল নেহরুর বোটানী ডিগ্রি ছিল, করলেন রাজনীতি। ডিগ্রি অনেকেরই আছে কিন্তু বৃক্ষের তত্ত্ব-দর্শন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবেন বৃক্ষবিশারদরা। কজন লোক জানেন বৃক্ষবিজ্ঞান? মাটি, রোদ, জল, আবহাওয়া, সময়, জায়গা, দেশ ও সবকিছুর ওপরে গাছের ইতিহাস নির্ভর করছে। গাছ আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে অক্সিজেন দিয়ে, ফল-ফুল-ফসল, কাঠ-পাতা-জ্বালানী-ওষধি দিয়ে। — বাবা, বড় ছ'হাত উঁচু সবেদা চারা নেবে, ওর মার নেই,

দু'বছর বাদেই ফলবে, ফল ধরেছে এখন, প্রত্যেক বছর নেড়ে রাখতে হয়, না, বারো টাকার কম হবে না'।

মুড়ি তেলেভাজা চা এলো আবার। তিন ঘন্টা কেটে গেছে। মেঘলা দুপুর। পিঁপড়ের সারি চলেছে ডিম মুখে নিয়ে। চোখে পড়তে গেঞ্জি ধুতি পরা মাগুরে রঙের ঈষৎ স্ফীতোদর বৃদ্ধ যুধিষ্ঠিরবাবু বললেন, 'ভারি বৃষ্টি হবে রে সমর, গুল ভাঙা চারাগুলো চালাঘরে বারান্দায় গোছগাছ করে রাখতে বলবি বিকালে।

'গোলাপ কত রকমের আছে'?

'হাজার রকমের। হাইব্রিড, হাইব্রিড পারপিচুয়াল আর টি রোজ (গন্ধ গোলাপ)। টি গোপাল চীন থেকে এসেছে। ইরানের গোলাপ সবচেয়ে বড় হয়। পরাগ সঙ্গম করে বীজ তৈরি করা হয়। চন্দ্রমল্লিকা ৭/৮ শ' রকমের। আমার কাছে আছে পমপম ৫০/৬০ রকম। বিগ ১০০ রকম। ডালিয়াও হয় হাজার রকমের'। হাজার রকমের সিজ্‌ন ফ্লাওয়ার।

'কত রকমের চাঁপা আছে'?

'চাঁপা বিচিত্র রকমের গাছ। বড় বড় গাছ হ'ল নাগকেশর, মুচকুন্দ, পুর্নাগ, রামধন, বৃন্দাবন, নাগেশ্বর চাঁপা, মিঠে মাটির গাছ, অতিরিক্ত গরম সহ্য করতে পারে, এর কাঠই লোহা কাঠ। পাহাড়ি এলাকায় আছে। ছাতিম গাছের মতো নাগকেশর। গাছের গায়ে ফুল ফোটে। আলিপুরের বড় লাইব্রেরির বাগানে আছে। ছোট ল্যাভেণ্ডার চাঁপাও খুব বিখ্যাত। ম্যাগনোলিয়া (গ্রাণ্ডি ফ্লোরা), শাঁখের মতো এই ফুল প্রেমিকার হাতে দিয়ে যান। ম্যাগনোলিয়া আর এরকম আছে, কাঁঠালি চাঁপার ধরণের কিছুটা লতানে গাছ, হাঁসের ডিমের মতো ফুল হয়। এর আবার বেলা সাতটা আটটা পর্যন্ত মাত্র গন্ধ থাকে। কয়েকটা ফুটলে বাগান আমোদিত করে তোলে। তিনদিন থাকে। পুমিলা ছোট চাঁপা, বাংলা নাম জহুরী চাঁপা। শ্বেতচাঁপা বা চীনে চাঁপা। বড় গাছ কনকচাঁপা—ওলটকম্বলের মতো পাতা—একপিঠ সাদা। স্বর্ণচাঁপা তো খুব বিখ্যাত ফুল।

লতা আছে ঃ লবঙ্গলতা, তরুলতা, মালতী, মাধবী, বিগশোলিয়া, ঝুমকোলতা, যুঁই ইত্যাদি।

বাহারী কচুজাতীয় গাছের মেলা ঃ ক্রোরটন, জেসিনা, মানিপ্ল্যান্ট (হস্তীকর্ণলতা) ফিলোডনডন, মনসটেরিয়া, স্যাকুলেন্ট, ক্যালঞ্চ, হাওয়ারটিয়া।

ঝাউ জাতীয় ঃ কর্সিয়া, থুজা, ফেনিপ্রাস, ক্যাসুরিনা (বড় ঝাউ)। পাইনাস -এর কাঠ চিরে ধূপকাঠি তৈরি হয়—নিভবে না। পাহাড়ি বড় গাছ।

বললুম, 'ওগুলো কি গাছ, খেলকদম গাছের মত দেখতে'?

যুধিষ্ঠিরবাবু বললেন, 'ওটা নতুন গাছ, সুবাউল নাম দেওয়া হয়েছে। ওর কাঠি থেকে সবচেয়ে ভাল দেশলাই কাঠি হয়। ছাতিম, শিমূল, ফরোদ গাছ থেকে এতদিন হ'ত। ঐ গাছটার নাম 'বার্ড অব্ প্যারাডাইস'—৫০/৬০ টাকা দাম। পাছ্ পাদপ জাতীয়। ঋজু ডাঁটার মাথায় কেবল পালকের মত পাতা থাকে। পাখির মত ঝোলা ফুল হয় এর'।

চন্দন গাছ দেখলাম। অনেকটা ডালিম গাছের মতো। জ্যাকেরাণ্ডা, গ্রাভেলিয়া। ইউক্যালিপটাস—যার কাঠ থেকে রেলের পাটি তৈরি হয়। তেজপাতার গাছের মতই দারুচিনি গাছ। ঝোলা ঝালরকাটা ঘন সবুজ মহানিম। ইন্দোনেশিয়া, আন্দামান, সিঙ্গাপুরের ছোট ছোট গাছে কত নারকেল ফলেছে। দ্রাক্ষাকুঞ্জ। আপেল, আখরোট, চেরি। কাশ্মীরে একটা পুরনো আখরোট দরখতের দাম সত্তর হাজার টাকা—তা থেকে নাকি দেড় লাখ টাকার আসবাব তৈরি হয়। বরফ-পড়া কাশ্মীরী আর তিব্বতীরা ঘরের ভেতর বসে বসে কাঠে নক্‌শার কাজ তোলায় পৃথিবী বিখ্যাত। ওক গাছের চারা দেখলাম। ভয়ঙ্কর সুন্দর। হাতের চেটোর আকারের বিচিত্র জালিকাটা ঘন সবুজ পাতা। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু হয় যে গাছ তার শিশুকে একটু স্পর্শ করলাম। ওক কাঠ ভীষণ শক্ত আর হাল্‌কা। ক্রিকেট খেলার ব্যাট হয় এর থেকে। কাজু বাদামের চারা দিলেন একটা। বললেন, এখন বসাবেন না। শীতকালে উঁচু শুকনো জায়গায় বসাবেন।

লেবু, পেয়ারা, জামরুল, আ-যোয়ান চারা দিলেন যুধিষ্ঠিরবাবু দশ বারোটা। বিলিতি কুল আর বিলিতি আমড়া পরে নিতে বললেন। চারাগুলো তিনদিন বাদে বসাতে বললেন। গুল শুকিয়ে এলে বাইরের রস সহজে টানার জন্যে। নারকেল সুপারি চারার খুব দাম এবং টান এ বছর।

মজার কথা শুনলাম, 'সেগুন গাছ বসিয়ে এক বছর বাদে গোড়া থেকে কেটে ফেলুন—নইলে বাড়বে না—অনেক গ্যাজ গজাবে—তেজি গ্যাজটা রেখে সব ভেঙে দিন, দেখবেন চচ্চর করে বেড়ে যাচ্ছে'।

যদিও সেগুনকাঠে সবচেয়ে ভাল নক্‌সা হয় তবু শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের মেহগনিই পৃথিবীর মধ্যে সেরা। বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রায় সব আসবাব এখানকার মেহগনি থেকে।

২৪ পরগণার বজবজ থানার মুচিসাহা গ্রামে আসুন ৭৫ নম্বর বাস ধরে আউটরাম ঘাট থেকে—যুধিষ্ঠির গায়েনের সাক্ষাৎ পাবেন। বেশি বিচিত্র ফুলের চারা পাবেন বাওয়ালী গ্রামের মোহন নার্শারিতে। মুচিসাহা উমেদপুরে আরও অনেক নার্শারি আছে। হরিপদ গায়েন, ভঞ্জু মণ্ডল, শিবু পাল, পঞ্চু কুঁতি, সন্তোষ গায়েন, পরিতোষ গায়েন,

শেখ জিয়াদ রহমান, রহেন আলি সেখ—নার্শারি ব্যবসায় সুন্দর জীবন গড়ে তুলেছেন। অনেকে সরকারি ঋণ নিয়েছেন। যুধিষ্ঠিরবাবু নেননি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এগ্রিকালচারকে নাকি ইনকামট্যাক্স দেন। ভারত সরকারও ট্যাক্স চান। কিন্তু তাঁর গাছপালা যদি হস্তান্তরিত হয়ে গোটা পৃথিবীতে চলে যায় তবে সেইসব বড় হাতের ট্যাক্স তিনি দেবেন কেন? বললেন, চারা প্রতি চার আনা মাত্র লাভ। দিনে ৩০০ থেকে ১০০০ টাকার বিক্রি কিন্তু সংসার খরচ যে মাসে ৩০০০। মজুরি, সার খইল আর সব জিনিসের দাম বাড়ানোই যেন আমাদের দেশের মহামান্য সরকারের প্রধান কাজ।

সর্বভুক মানুষের জন্য প্রোটিন চাই নইলে জন্মহার ঠেকানো যাবে না

খাদ্যের অভাব। চাকরি নেই, কাজ নেই, তাই সাঁওতালরা ভাম, ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, খট্টাশ, বাদুড় খায়। গাড্ডায় ফেলার পর বাতিল গরু মারা গেলে তবে তার মাংস খায়। আর বেদেরা সাপের মুণ্ডুটা কেটে ফেলে দিয়ে শরীরটা চামড়া ছাড়িয়ে গরুর ল্যাজের মতো কুঁচিয়ে নিয়ে রান্না করে খায়। সাপের বিষথলিধারক মুণ্ডুটাই যা বিষ কিন্তু টিকটিকির সারা শরীর বিষাক্ত—খাবারে পড়লে সেই খাবার খেলেই মানুষ মারা যাবে।

কোরিয়ার লোকরা শিয়ালের মাংস খায়। একজন বাঙালি খেয়েও এসেছেন। চীনের হিন্দুরা আর আন্দামান-নিকোবরের মুসলমানরা গরু খায়। নাগারা খায় কুকুর। কুকুরের হজমশক্তি খুব জোর বলে তাকে হরদম খাইয়ে ল্যাজ ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার উদরের খাদ্য সব বার করে কুড়িয়ে নিয়ে ভোজবাড়ির মানুষের পাতে পাতে দেওয়া হয়, হজম এতে বেড়ে যায়। উইচিংড়িও খায় নাগারা।

'টিড্‌ডি' বা পঙ্গপাল শস্য নষ্ট করে বলে তাদের ধরে খাবার হুকুম জানানো হয়েছে মুসলমানদের।

আরশোলাও চীনেদের কাছে পরম খাদ্য।

কেনিয়ার জঙ্গলে অপরিচিত, শত্রু বা বিদেশীদের কাউকে পাওয়া গেলে ধরে বেঁধে এনে তার চারদিকে মশাল জ্বেলে নেচে নেচে শেষ পর্যন্ত লোকটিকে পুড়িয়ে তার মাংস খেত জংলীরা।

মাটির মধ্যে যে কেঁচো থাকে রোগীকে তার গায়ের রস খাইয়ে দেয় বিষাক্ত সাপে কামড়ালে কোন কোন সর্পচিকিৎসক। আগে কেঁচো চচ্চড়ি করে খেত নাকি তফসিলী শ্রেণীর লোকরা। 'জলভাঁটি' (শামুক), 'দু-পাটি মাছ' (ঝিনুক), 'দুর্গাবড়ি' (গুগ্‌লি বা গোঁড়ি) তো তফসিলী শ্রেণীর লোকরা এখনো হরদম খায় দক্ষিণ বাংলায়।

শামুকের মুটি কাঁটা দিয়ে গেঁথে মদের টেবিলের উপভোগ্য হ'ল ফ্রান্সে।

আর কল্লোলিনী বুড়ি পিসি কলকাতার অভিজাত হোটেলের চিকেন স্টু মানেই নাকি ব্যাঙের ঝোল! — পাগল ভাল করে দেয় ব্যাঙের ক্বাৎ।

পচা মাছ তবুও খাওয়া যায় কিন্তু পচা মাংস মানুষ গিলতে পারে না। তবে হরিণের মাংস চটে মুড়ে মাটির ভেতর রাখার অন্তত চব্বিশ ঘন্টা পরে খড় দিয়ে সেদ্ধ করতে হয় গাদ জড়ায় বলে—চর্বি নেই, তাই সহজে পচে না। দু'দিন পরে

একটু আঁশটে গন্ধ হয়—তারই কাবাব সুখাদ্য। পৃথিবীতে যত রকমের রাজকীয় খাদ্য আছে হরিণের মাংসের কাবাবই হ'ল সবচেয়ে নাম করা।

তেজি গরুর 'উজ্‌ড়ি' (উদর, উদ্‌রি, উদ্‌ড়ি) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে খাওয়ানো হয়েছিল চীনের 'গণরাজ' খানার টেবিলে। তিনি নাকি বলেছিলেন তোফা!

কি খায় না মানুষ? আমরা যেটা খাই না সেটা অন্য সম্প্রদায়ের লোকরা খায়। কাজেই ঘৃণা করার কিছু নেই।

একটু গন্ধ হলেও ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন কচি পাঁঠার মাংসের মতো সুস্বাদু মাংস আর নেই।

কচি বাছুর এবং শূকরের মাংসের প্রশংসা আছে পুরনো পুঁথি-পুস্তকে।

'জলখাসি' তো অনেকেই অবাধে ভক্ষণ করে—যার নাম কচ্ছপ। ছোট কাছিমের মাংস নাকি আরো ভাল, আরও উপভোগ্য খাদ্য।

খাবার জন্যে চিতি কাঁকড়া কেউ কেউ পুকুরে চাষ করে। দারুপায়ীরা বলে, সমুদ্রে-কাঁকড়ার মালাই গল্‌দা চিংড়ির মতোই মজাদার।

উচ্চ শিক্ষিত মানুষরা অনেকেই আজকাল সংস্কারমুক্ত—দেশে-বিদেশে তাঁদের ঘুরতে হয়, অবাধে নানান খাদ্য খেতে হয়। কেউ এসে বলেন, কেউ আবার বলেন না।

রানী এলিজাবেথের অভিষেকের সময় বিশাল একটি গাভীকে চামড়া আর নাড়িভুঁড়ি মুক্ত করে ঘি মাখিয়ে লোহার দণ্ডে গেঁথে রোস্ট করে পৃথিবীর তাবৎ অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়ানো হয়েছিল— আমাদের প্রতিনিধি হয়ে কে কে ছিলেন জানি না। (ইংরেজি সাহিত্যে বা চলচ্চিত্রে বিফরোস্ট হলে চলে যায় কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এখনো ছুঁচিবাই রুচিশীলা বামুনের বাল্‌বিধবা!)

আল্লার অসীম দয়া তাই আরবের গরম আবহাওয়ার লোকদের জন্য পরম এবং নরম খাদ্য হ'ল মুরগি আর উটের পিঠের কুঁজ। এই কুঁজের মধ্যে থাকে অনেক চর্বি আর খুব নরম মাংস। আরবের মুরগি আধঘন্টার মধ্যে সুগন্ধ নরম মাখনের মতো হয়ে যায়।

বুনো মোষ বা বাইসনের মাংসের 'বাশ-পোড়া' অত্যন্ত তেজস্কর সুখাদ্য। যাঁরা শিকারী তাঁরা এটা অনেকেই খেয়েছেন।

সাঁওতাল বা মুণ্ডারা এবং হো-রাও মুরগির মাংস হলুদ লঙ্কা আদা ধরে পিঁয়াজ রসুন জিরে মরিচ পিষে নিয়ে মাখিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চটকায়—রস ঝরলে তবে রান্না করে। কাঁচা শালপাতায় ভাত আর সেই মুরগির ঝোল রাঁচী বা ঝাড়গ্রামে গিয়ে খেতে পারেন, সাঁওতাল-মুণ্ডা পরিবারের সঙ্গে ভাব করে। খুব ভাল লাগবে। জবাই ছাড়া যাঁরা মাংস খান না তাঁরা জবাই করে দিলেও ওদের আপত্তি নেই।

বেদেদের দেখেছি, ল্যাজে-ল্যাজে-বাঁধা কুড়ি-পঁচিশটা বড় ডামা ইঁদুর ধরে এনে ছাড়িয়ে মালসা খানেক মাংস নিয়ে কড়ায় করে রাঁধতে— বল্‌বল্‌ করে তেলের 'চালতা-ফুট' উঠে কড়া ভরে যায়। মাংসও নাকি দারুণ নরম আর সুস্বাদু।

অধ্যাপক এবং সাহিত্যিক নারায়ণ গাঙ্গুলি একদা বলেছিলেন—'একটা রেস্টুরেন্টে মাংসের চপ দিত খুব নরম আর মজাদার। প্রায়ই খেতাম। একদিন দেখলাম কচিমতো একটা ইঁদুরের মাংসের চপ! তাই তো বলি, নইলে এমন নরম হবে কেন?'

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুনেছি বজবজের ব্যঞ্জন-হাড়িয়ায় থাকার সময় গীতা বৌদিকে নিয়ে ব্যাঙের মাংস খেয়েছেন। আমিও দুটো ব্যাঙ ধরে ছাড়িয়ে রান্না করেছি ঠেসে বেশি মশলা দিয়ে গন্ধ লাগার ভয়ে কিন্তু ছাড়ানোর সময় আঁশটে গন্ধ লাগার ফলে যে ঘৃণাবোধ জাগরিত হয় তাতে তিন-চার পিসের বেশি খেতে পারিনি। অন্য একটি ছেলে প্রায় সব খেয়ে নিয়েছিল। মাংসটি বড় মাছ বা খুব কচি 'চিক ছানা'র (মুরগি-বাচ্চা) মাংসের মতো। দারুণ খাদ্য।

ঘৃণা করে কোনও খাদ্য খেলে পিত্ত পড়ে যায়, পরে বমি হতে পারে।

কুঁচে বা 'বোড়ো' অনেকেই খায়। সাপের মতো দেখতে হলেও সাপ নয়। গোলাকার লম্বা। কেঁচোর বা চিংড়ির টোপ খায়। গলাটা কেটে ফেলে ছাই মাখিয়ে পা দিয়ে মাথার দিকটা চেপে ধরে চামড়াটাকে টানলে চচ্চড় করে উঠে আসে। আঁশটে মেটে গন্ধ লাগে নাকি খাবার সময়।

কুঁচে আর বানমাছে অনেক তফাৎ। যদিও নদীর জল থেকে বানের বাচ্চা এসে পুকুরের মিঠে জলে-কাদায় চ্যাপ্টা বান জন্মায় কিন্তু সমুদ্রের বান খুব বড় আর গোলাকার। সাতটি মহাসমুদ্রের অধিকারী পৃথিবীর মধ্যে কেবল মেক্সিকো সমুদ্রে মাত্র গোটা সাতেক পুরুষ বানমাছ থাকে—এরাই সমস্ত সমুদ্রের মাদী বানের সঙ্গে বছরে একবার মাত্র মিলিত হয়ে আসে— সাগরদ্বীপে এ তথ্য জানিয়েছিলেন প্রাণীতত্ত্ববিশারদ কমলেশ ব্যানার্জি।

বাঘ প্রচণ্ড হিংস্র প্রাণী ঠিকই, সে শিকার ধরেও দারুণ হিংস্রতার সঙ্গে নখ আর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কিন্তু টাটকা মাংস কখনো সে খায় না। খুব খিদে থাকলে নরম কোল্‌জে, ফ্যাঁফ্‌সা, গুরদো, পিলে বা রক্ত খাবে—তারপর শিকারকে পচানোর জন্যে কোথাও গুঁজে রাখবে। মাংস পচলে খুব আরাম করে শুয়ে শুয়ে খাবে ওৎপেতে। যেন মাংস খস্‌খস্‌ করে ছেড়ে আসে। বাঘ অতি চতুর হলেও ফেউ শিয়াল তার আগে আগে ছোটে। ফেউ ফেউ করে ডাক দেয়। বুদ্ধিমান প্রাণীরা সতর্ক হয়। কিন্তু বুদ্ধি—মোটা শুয়োর, গরু, 'অজ' (ছাগল—অজ পাড়াগাঁ—কথাটা আপত্তিকর) ইত্যাদি বাঘের হাতে মারা পড়লে সেই শিকার অনেক সময় ফেউ বা খ্যাঁক শিয়ালের দ্বারা

চুরি যায়।

একবুক কবরের নিচে পাশ থেকে সুড়ঙ্গ কেটে নেমে মড়া খায় খ্যাঁকশিয়াল—ওঠার সময় লাফ দিয়ে উঠতে তার কোনো রকম অসুবিধা হয় না। (বাঁদর, খ্যাঁকশিয়াল আর কাকেদের বুদ্ধি খুব, এরজন্য তাদের য়ুনিভারসিটিতে পড়তে হয় না।)

'মানুষের জাত' অনেক সম্প্রদায়ের লোকদের বাঁদর হনুমান খেতে দেখা যায় না। তবে হংকংয়ে রাজকীয় খানার টেবিলে বাঁদরের মাথায় হাতুড়ি মেরে মেরে তাকে পাগল করার পর তার কাঁচা মগজ খাওয়া হয়। হনুমানও খায় আদিবাসীদের একটা সম্প্রদায়।

প্রকৃতির স্বভাব মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে হারিয়ে ফেলেছে বলে তার পূর্বপুরুষ বনমানুষের দাঁতের গঠন আর তার নেই। সাক্ষীস্বরূপ এখনো চারটে ছুঁচালো কুকুরে দাঁত থাকলেও মানুষ নিরামিষভোজীতে পরিণত হয়েছে। নইলে যদি কাঁচা মাংস খেত দাঁত হ'ত বাঘ, কুকুর শিয়ালের মতো। যারা জিভ দিয়ে চকচক করে জল খায় তারা মাংসাশী। কিন্তু মানুষ মাংসাশী নয় বলে কি সে মাংস খায় না? সেদ্ধ করে খায়। কাজীরা বলেন, 'অসিদ্ধ মাংস হারাম'; আদিযুগে ঈশ্বর যে আরণ্যক মানুষদের জন্য পাঁচশ' বছর টেকার মতো মজবুত কোল্‌জে দিয়েছিলেন আমরা সভ্যতার দাওয়াই খেয়ে খেয়ে তার এমন বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি যে একটু শক্ত রান্না মাংস খেলেই 'ওলাউঠো' হয়ে অক্কা পাই।

'কাক সবার মাংস খায় কিন্তু কাকের মাংস খায় কে'—বলে প্রবাদ আছে। খায় পিঁপড়ে, পোকা মাকড়। এবং মাটি তো সর্বভুক। সে স্বর্গ-নরকের সমাজপালক মূল্যবান ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বছর পঁচিশের মধ্যেই ধার্মিক মানুষের হাড় পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। (একজন বোকা লোক বলেছিল, 'মুসলমানদের যত কবর হয় সবাই আমেরিকায় গিয়ে সাদা হয়ে বেরোয়?)

ফরেন মানি অর্জনের জন্য একটা বাতিল হরিয়ানা বা পাঞ্জাবী গাই বেচে আরবদের কাছ থেকে পনের হাজার টাকা আয় হলেও আফগান বা কাশ্মীরী মুসলমানরা গাই-গরুর মাংস খায় না, খায় নীলগাই। গরুর মতো দেখতে এক কিসিমের হরিণ। ভীষণ চতুর। বন্দুক ওঁচালেই হাওয়া। সামনে শুধু দেখা যায় খানিকটা ধুলো উড়ছে।

নীল গাইয়ের মাংস, কাবাব আর তন্দুরে রুটি কিংবা কিসমিস বাদাম পেস্তা মেশানো কেক বা ক্ষীর কাশ্মীরের বঁড়িয়াখানা।

'মাংসে মাংসবৃদ্ধি, ঘৃতে বৃদ্ধি বল্‌'—কথাটা কিন্তু অচল মাড়োয়ারি বন্ধুদের বেলায়। মাংস না খেলেও তাঁদের কৃশকায় দেখিনি আর ঘিয়ে বল্‌ বাড়লেও সে বল্‌ দশ নম্বরের ফুটবল তৈরি করে মধ্যপ্রদেশে।

পৃথিবীর মধ্যে যেসব দেশে প্রোটিনের অভাব (চীন আর ভারতে) সেখানে ঈশ্বরের কৃপায় জন্মহারও বেশি (এমন হয়ত একদিন হতে পারে, পৃথিবীটা ঘুরতে ঘুরতে পুবদিকে দাঁড়িয়ে গেছে, চীন আর ভারতের মানুষের প্রচণ্ড ভরে আর ঘুরছে না, ঈশ্বরও ঠেলতে ঠেলতে ঘর্মাক্ত—তখন লোক কমানোর জন্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য) সেজন্য প্রোটিনের অভাব দূর করতে আসুন আমরা ব্যাঙ খাই নইলে ৩০/৪০ কোটি হিন্দুর কাছে খাসির মাংসের দাম প্রতিদিন রবারের মতো বাড়ছে। নইলে মুনি ঋষিরা উঠে এসে বিধান দিন, তারা কোথায় প্রোটিন পাবে।

স্বদেশের দুঃখকষ্টের ভাবুক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা তাই সরাসরি ব্যাঙ খেতে না বললেও ব্যাঙের ছাতা খেতে বলছেন। তবে বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা চিনতে না পারলে উদরাময়ে হাসপাতাল দাখিল হতে হবে।

'মনু গরু খেতে বারণ করে হিন্দুদের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছেন নইলে এই জাতটা মার্কিনদের মতো হতে পারতো' এই একজন বিজ্ঞানীর মত। (ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস, বেঙ্গল কেমিকেলের বিজ্ঞানী, লেপ্রসি বা কুষ্ঠরোগের ওষুধের আবিষ্কর্তা, কলকাতা য়ুনিভারসিটিতে তিনি জার্মান ভাষাও পড়াতেন—তাঁর একটা চিঠিতে আমাকে এইকথা জানিয়েছিলেন।)

মানুষ সব খায়, আবার বলছি, কেউ কারো খাদ্য নিয়ে ঘৃণা করবেন না কেন না ঘৃণাও একরকম মানসিক নিচ খাদ্য।

কুমোর কমেছে, কমেনি মাটির জিনিসের টান

সভ্যতার আদিযুগে মানুষ আগুন জ্বালানো শিখলো পাথরে পাথর ঘষে। এই আগুনে দেখেছে সে জঙ্গল পুড়ে যেতে। বিভীষিকাময় সেই আগুন। জঙ্গলের হাতি-গণ্ডার-ভালুক-বাঘ-শূকর সবকিছু দিক-বিদিকে প্রাণভয়ে পালিয়েছে। এই আগুন যে গাছের ডালে ডালে ঘর্ষণের ফলে জন্মাতো মানুষ তো জানতো না। সমুদ্রে অন্ধকার রাতে ঢেউয়ের মাথায় তারা বাড়বানল ছুটতে দেখেছে—দেখেছে নগ্ন জলপরীর আকার নিয়ে তা নাচতে নাচতে টুপ করে ডুবে যেতে। ঢেউয়ের ঘর্ষণে বা মেঘের ধাক্কায় যে আগুন জ্বলে মানুষ অনেক দেরিতে জানলেও মুনিঋষিরা পাথরে ঘষা চকমকির আগুনকে শুকনো গাছের গুঁড়ি জ্বালিয়ে দীর্ঘ সময় তা বাঁচিয়ে রাখতেন। এস্কিমোরা সীল মাছের চর্বিতে অনির্বাণ দীপশিখা জ্বেলে রাখতো। আগুন যখন আয়ত্তে এলো তখন মানুষ শিকার করা জীবজন্তুর মাংস ঝলসে খেতে লাগলো। তারপর কাদামাটিকে পিটে পিটে চ্যাপটা করে মুড়ে ভাঁড় বা হাঁড়ি বানিয়ে তাকে পুড়িয়ে পাকা করলো। সেই পাকা হাঁড়িতে রান্না করতে লাগলো। পাথর ঘষে সূচালো করে অস্ত্র বানালো প্রথম, দ্বিতীয় জ্বাললো আগুন, তৃতীয় বানালো হাঁড়ি, তারপরে বানাতে শিখলো বস্ত্র।

পৃথিবীর সব দেশের আদিবাসীই মাটির হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করেছে। গঠনভঙ্গি তার নানারকম। মাটির তলায় চাপাপড়া জনপদ খুঁড়ে সেসব উদ্ধার করা পাত্র এখন মিউজিয়মে রাখা আছে।

মানুষ জঙ্গল ছেড়ে যখন সমাজবদ্ধ হ'ল, তাদের বৃত্তি নির্ধারিত হয়ে গেল। কামার, কুমোর, নাপিত, ছুতোর, ঘরামি, জেলে, তাঁতি, মালী নানান কিছু।

কুমোর সম্প্রদায় আদিযুগের মাটির হাঁড়ি-কলসী বানানোর কাজ নিয়ে মানব সমাজের সেবা করে এলেও সভ্যতা কখনও বুড়ো হয়ে বসে রইলো না। ধাতব পদার্থ আবিষ্কারের পর তা থেকে শক্ত মজবুত দীর্ঘদিন স্থায়ী পাত্র তৈরি করে ফেললো। তামা, পিতল, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, টিন, জার্মান সিলভার ইত্যাদি থেকে হাঁড়ি-পাতিল কলসী-বালতি নানারকম পাত্রে বাজার ছেয়ে ফেললো।

ক্রমে ক্রমে মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত ঘর থেকে মাটির হাঁড়ি বিদায় নিলো। চাষীবাড়িতেও এলো ধাতব হাঁড়ি-পাতিল কিন্তু তাতে কি কুমোর সম্প্রদায় উৎখাত হয়ে গেছে?

২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার বাখরাহাট কীর্তনখোলার কুমোরবাড়ির ছেলে রামচন্দ্র পাল সোনার মেডেল পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম এ পাশ

করার পর ডক্টরেট হয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান হয়েছিলেন। কুমোরবাড়ির ছেলেমেয়েরা শুধু এখন আর হাঁড়ি-পাতিল গড়ার কাজে দিন গুজরান করতে পারছে না—তাদের মাস্টারি ডাক্তারি কেরানিগিরি, ব্যবসাপাতি নানান কাজে লাগতে হয়েছে কিন্তু তবুও যারা অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত হয়ে রয়ে গেছে জাত-ব্যবসা তাদের ধরে থাকতেই হয়েছে। আগে দেখেছি কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে মাটির হাঁড়ি-পাতিল যেত হাটে-বাজারে। বাজারের পাশে আজও আছে মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান। একজন লম্বাটে, হাত-পা, ঘাড়-কুঁজো চেহারার ওড়িয়া মানুষকে চিরকাল দেখতাম বাঁখারির ঝাঁকায় হাঁড়ি-কলসী নিয়ে ঘামে ভাসতে ভাসতে পা হড়কানো কাদায় অথবা গরম ধুলোয় চলেছে ডোঙ্গাড়িয়ার পালপাড়া থেকে বাখরার হাটে। কত রোজ পেত সে? পেটের দায়ে মাটির হাঁড়ির দুটি চাল-আলু-সেদ্ধ করে খাবার জন্যে সে হাঁড়ির বোঝা বইতে বইতে কবে মারা গেছে খেয়াল করিনি। স্বাধীনতার পর প্রথম বিধানসভার ভোটে ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর পশ্চিম কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়িয়ে বিমল সিংহ না জিতলেও রায়পুর থেকে ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটাকে কথামত পাকা করে দিয়ে যেতে, ডোঙ্গাড়িয়ার পিয়ার আলি গাড়োয়ান গাড়ি-গরু তুলে দিয়ে বাস-চলা পথে এখন রিক্সা ভ্যানে বাঁখারি-ঘেরা বড় ঝাঁকায় হাঁড়ি-কলসী বয়। তাকে একদিন শুধোলাম, 'কি ব্যাপার গো পিয়ার আলি, গরুর গাড়ি তুলে দিয়ে এবার রিক্সা টানছ? প্রৌঢ় পিয়ার আলি ভাঙাচোরা দাঁতের পাটি বিচ্ছুরিত করে বলল, 'কি করবো বাবু, যুগের হাওয়া! গাড়ি-গরু প্যাটে চলে গেছে।'

রিক্সা ভ্যানটা জমার, না সাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের দৌলতে হয়েছে—জানা হয়নি।

প্রবোধ পালের হাঁড়ি-কলসী লরী বোঝাই হয়ে চলেছে কলেজস্ট্রিট মার্কেটে। পালপাড়ায় চনচন করে এখনও চাক ঘুরেছে। গঙ্গার পাতা থেকে কালো এঁটেল মাটি তুলে বয়ে আনা হচ্ছে। চন্দ্রকোণা থেকে 'উপরিবনক' রঙ আসছে। 'আতালি'র জল মেখে পিটুনি দিয়ে পটাপট কাঁচা হাঁড়ি-কলসীর খোল পেটার শব্দ উঠছে কুমোর পাড়ায়। 'কাজঘরে' মেয়েরাই কাজ করছে বেশি! বাড়ির উঠোনে খামারে দরোজায় সর্বত্র কলসী, সরা, ঘট, ভাঁড়, পাতিভাঁড়, ছোবা ভাঁড়, রসের ভাঁড়, ভাতের হাঁড়ি, বেন্‌নে বা 'সেন্‌নে' (ব্যঞ্জন আর আরবীতে 'সালন' মানে তরকারি) হাঁড়ি, চায়ের ভাঁড়, মাটির খুরি, মাল্‌সা, মুড়ির চাল উঁচানো খুলি, গুড় জ্বাল দেওয়া খুলি, জালা, মেটে, ম্যাচলা, ফুলের টব ইত্যাদি সুন্দর সারি দিয়ে উপুড় করা। বৃষ্টি এলেই তাড়াতাড়ি সব তুলতে হয়। এখন প্লাস্টিকের জলকাগজ চাপা দেয় কেউ কেউ।

'পণ' পুড়ছে কারও কারও। একটা চালাঘরের ভেতরে গোলাকার বড় বান বা উনোন। রোদে শুকোবার পর হাঁড়ি-পাতিলগুলো কয়লা দিয়ে থাকে থাকে সাজিয়ে

পণের নিচে আগুন জ্বেলে গোটা পাড়া অন্ধকার করে ছাড়া হ:য়েছে। কুমোরদের পণ পোড়ানোর জ্বালায় নাকি নারকেল পাতা আর কঞ্চির বোঝার দাম ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে।

এত মাটির হাঁড়ি-পাতিল লাগে এখনও? প্রবোধ পাল পেট্রোম্যাচে সিগারেট ধরিয়ে হু হু করে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, মাটির মানুষ এখনও মাটির মায়া ছাড়তে পারছে না। কত কাজে লাগে এসব মাটির পাত্র। মেয়েরা জল নিয়ে যায় টিউবওয়েল থেকে— দেখছ তো, এখনও শতকরা নব্বইটা মাটির কলসীতে—বাকীটা ডাবর। তালগাছ খেজুরগাছের রসের ভাঁড় লাগে মাটির। ধান ভিজানো বা গরুর গাম্‌লার জন্য লাগে ম্যাচলা। বাজারের আনাজ ব্যবসায়ীদের দরকার 'পাতি ভাঁড়ে'র—আনাজে জল দেবে। (পাতি শব্দের ব্যবহার ক্ষুদে বা গ্যাঁড়া অর্থে : পাতিলেবু, পাতিভাঁড়, পাতি ঘাস, পাতিহাঁস, পাতিনেড়ে। নেড়ে শব্দটা আসলে লেড়ে বা লড়িয়ে।) মাটির হাঁড়িতে এখনও অনেক গরিব পরিবার রান্না করে। মাটির হাঁড়ির ভাত ভাল লাগে—জার্মান সিলভার বা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির ভাত জলচোপসা লাগে। ভারী রোগী অসুখ থেকে উঠলে ঘুঁটের জ্বালে পুরনো হাঁড়ি ফেলে দিয়ে নতুন হাঁড়ি ব্যবহার করার নিয়ম আছে অরন্ধন পুজোর সময়। গ্রামীণ নাম 'পান্না'—পান্তা থেকে এসেছে কথাটা। হাঁড়ি-কলসী বাতিল বা 'বারহাঁড়ি' হলেও গরিব মানুষরা ফেলেনা—চাল আটা রাখে। সাপুড়েরা নতুন হাঁড়িতে নতুন ধরা সাপ রাখে। ময়রারা হাঁড়িভরা মিষ্টি বেঁধে দেয়। দই বসানো হয় মাটির হাঁড়িতে। মালসা সরারও হরদম টান আছে এখনও। চায়ের ভাঁড় আর জলের খুরির যোগান দিয়ে কত লোক পাকাবাড়ি করে ফেললো। চোঙ খোলা, পেনটাইল খেলা বা ইঁট ছাড়া কি আমাদের সভ্যতা বাঁচবে ভাই? তবে কয়লার দাম বেশি হয়ে যাওয়াতে আমাদের কুমোর জাতটার কোমর ভেঙে গেছে। কয়লার চেয়ে কাঠের তো আরও বেশি দাম। একটা কলসীর দাম যদি পাঁচ টাকা বলি তো মানুষ বলে, কি হবে মাটির কলসী কিনে দু'দিন পরেই তো ভেঙে যাবে?—না কিনেও আবার উপায় নেই— ডাবরের দাম যে দু'শো টাকা! হাসপাতালগুলোয় অস্থায়ী রোগীর জন্য হরদম কুঁজো বা সোরাই বিক্রি হয়।

প্রবোধ পাল হাইস্কুলে আমার সহপাঠি ছিল। জাত-ব্যবসা নিয়ে সে এখনো টিকে আছে। জমি-জায়গাও আছে কিছু। তাকে ডাবর কেনার একটা বাস্তব ক্ষুদে গল্প শোনালাম।

'এক হিন্দু কাঁসারীর যুবক-ছেলে এমন পোশাক পরে যাকে দেখলে মুসলমান বলে ভুল হবে। দাড়ি রাখা, টুপি আর কালো পীরহান, আর চুস্ত পাজামা পরার তার সখ, ভাল লেখাপড়া জানে। কথায় কথায় এই ডাবরটার দাম কত জিজ্ঞেস করতে বলল,

'ওটা আমার লক্ষ্মী ডাবর। এবুশবার ওকে খালি বেচেছি। বিক্রি করার পর কেবল ভাবি, কবে আমার লক্ষ্মী ডাবর আবার ফিরে আসবে। তিনমাস, ছ'মাস কিংবা একবছর বাদে ফিরে আসে ঠিকই। কেন না ওর বুকের ওপরের জোড়ের মধ্যে খুব হাল্‌কা চিনচিনে একটা লিক আছে। জল ভরে এনে ঘরে বসিয়ে রাখলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে মেঝে দিয়ে গড়িয়ে চলতে থাকলে যে কন্যাব বিয়েতে ডাবরটা তার বাবা বা মামা দিয়েছে সেই কন্যার গালে হাত পড়ে! ডাবর ফেরত আসে। বলি, জল ভরে দেখে তো তখন নিয়ে গেলেন? বলাই বাহুল্য, হঁসিয়ার করা বয়টা খাল থেকে আধডাবর জল আনে। কেন না খালে জল কম বৈশাখ মাসে—উপুড় হয়ে বাচ্চাটা তুলতে পারে না। ডাবর ফেরত নিয়ে নিই। অগে দাম ছিল পঁয়ষট্টি টাকা—এখন দুশ' টাকা। টাকা ফেরত দিই—উপরি এবার পালিশ খরচ। আগে ছিল পাঁচ টাকা এখন পঁচিশ টাকা। কাজেই ওটা আমার লক্ষ্মী ডাবর।'

জয়পুরের বালির মাটির কলসীতে জল খুব ঠাণ্ডা থাকে বলে খানদানী সাহেববিবিরা তা ব্যবহার করেন। সোরাই বা কালো কুঁজো মুসলমানরা, ব্যবহার করতে ভালবাসে। সম্ভবত লক্ষ্ণৌ দিল্লি থেকে এটা এসেছে। এর সরু গলা দেখে অনুমান করা যায় গরম দেশ মিশর-আরবে এর জন্ম। যেখানে জলের প্রাচুর্য কম—ভক্‌ভক্ করে জল পড়লে খরচ বেশি হবে বলে সরু গলা করা হয়েছে। সোরাই বা কুঁজো দু'একজনের জলের জন্যই সাধারণত ব্যবহারযোগ্য। বদনা আরব অঞ্চলের জলপাত্র। সরু নল এর কিন্তু গাড়ুও কি জলবিরল দেশের পাত্র? ব্রাহ্মণরা ব্যবহার করতেন আগে। এঁরাও কি বেদ মাথায় করে বয়ে আনা ইরানী আর্য?

কুমোর সম্প্রদায়ের মানুষ জাত-ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার ফলে অল্প যারা এখনও মাটি কামড়ে পড়ে আছে মালের টান তাদের যে কমেছে এমন কথা বলা যায় না। বরং বেড়ে গেছে। কারণ লোকসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে আর কুমোরেরা কমে যাচ্ছে।

ব্যবসাখাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাউকে কাউকে ঋণ পাইয়ে দিয়েছেন। শোধ হয় না দেখে ঋণ নিতে এখন অনাগ্রহ জন্মেছে কোনও কোনও সচেতন কুমোরের।

হাওড়া জেলার বৃদ্ধ কুমোর জয়দেব পাল মহাশয় বললেন, 'সরকারি লোন নিয়ে হাঁড়ি-কলসীর কারবার করলাম বাগিয়ে। মেয়ের বাপকে উলটে পণ দিয়ে ছেলে বউ করলাম হাঁড়ি পেটার জন্য—এটা আমাদের পুরনো রেওয়াজ—কুমোরের মেয়ে আনতে গেলে পণ দিতে হয়। তা কপালে সুখ নেই—এক লরি মাল খালে উলটে পড়লো। লরির মালিক ইনসিওরের টাকা পেল—আমার লোকসান ব্যাঙ্ক দেখলো না।'

পুষ্টিহীন দেশে মুষ্টিযোগ গুষ্ঠিরোগ সারাতে সক্ষম

প্রকৃতিকে আমরা এখনো পুরোপুরি জয় করতে না পারলেও তার মধ্যে যে সূক্ষ্ম বিজ্ঞান ব্যবস্থা আছে তা করায়ত্ত করে নগর সভ্যতায় এমন বাবু হয়ে গেছি যে এয়ারকণ্ডিশনে থাকতে থাকতে সাদা টিকটিকির মতন হয়ে যাচ্ছি। এমন কিছু ভাগ্যবান আছেন যাঁদের পা কখনো মাটিতে পড়েনি।

রোগের জন্য দশদিকে ট্যাবলেট ক্যাপসুল ইঞ্জেকশনের প্রহরী। তবুও কোন ফাঁক দিয়ে অভিশাপের মতো আসে কঠিন কঠিন দুরারোগ্য রোগ। চোখের দৃষ্টি কমে—চশমা আসে। দাঁত গেলে নকল দাঁত লাগাই। (রাশিয়া অবশ্য অপারেশন করে দাঁত গেঁথে দিচ্ছে মাড়ির মধ্যে।) কানে কম শুনলে শব্দগ্রাহী যন্ত্র লাগাই। চুল উঠে গেলে পরচুলা ব্যবহার করি। নাড়ি দূষিত বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে জোড়া দিয়ে নিই। হাড়ও বদলানো হয়। হার্ট কমজোরী হলে যন্ত্র বসাই বুকের ভেতর।

হনুমানের সঙ্গে মানুষের মগজ বদল করেও দেখা হয়েছে—তাতে অবশ্য মানুষটা হনুমানের মতো কাণ্ড করতে থাকে। ভারী শরীর নিয়ে হুপ হুপ করে লাফ দিলেই মুশকিল! আর হনুমানটা যদি মানুষের ব্রেন দিয়ে বাবু হয়ে যায় তার বিয়ে-সাদি দিতে হবে। তপসিলীর নিচের ক্লাস বলে চাকরিও দিতে হবে তড়িৎগতিতে।।

বিজ্ঞানের রাহু আমাদের গলা পর্যন্ত গিলে ফেলেছে—তাকে বাদ দিয়ে আজ বাঁচা কঠিন। বেশি করে বাঁচতে গিয়ে হয়তো আমরা সুখী হয়েছি কিন্তু পদে পদে আমাদের মারাত্মক সব বিপদও উঁকি ঝুঁকি মারছে। বিদ্যুতে হাত দিলেই আমরা মরব জেনেও তার সাহায্য নিয়ে আলো জ্বালছি, পাখা ঘোরাচ্ছি, মেশিন চালাচ্ছি।

অনিবার্য মৃত্যু জেনেও মানুষ বিষাক্ত সাপের ছোবল খেয়ে ওষুধ পরীক্ষা করেছে। বাঁচার সংগ্রাম মানুষের জন্মের পর থেকেই অনন্তকাল চলে আসছে। যখন এ্যালোপাথিক ওষুধ হয়নি চলত আয়ুর্বেদীয় বা কবিরাজী চিকিৎসা। হেকিমী ব্যবসা।

এই মেঠো চিকিৎসার একটা কাহিনী আছে। বাদশা হেকিমকে পরীক্ষা করার জন্যে ছাগলের পায়ে দড়ি বেঁধে এনে বেগম সাহেবার জ্বর বলে নাড়ি দেখতে দিলে হেকিম বললেন, 'শোভান আল্লাহ্! হুজুর শেষ পর্যন্ত বক্‌রি ব্যবহার করছেন?'

একালের ডবল এফ আর সি এস ডাক্তারের চোখ বেঁধে দিলে সাধ্য কি বলেন রোগীর নাড়িটা চলছে নারীর না পুরুষের।

একালে চিকিৎসার অনেক উন্নতি হলেও মানুষ শতায়ু হতে পারছে না। তবে

দীর্ঘায়ু হচ্ছে এটাও ঠিক। ৭৫/৮০ -তেও যাঁরা কোমর সোজা করে আছেন, খোঁজ নিয়ে দেখুন তাঁরা ছোটবেলায় কত আদা বিড়মির রস, ভাঁটপাতা, বনঝামা বা কালো-মেঘের তেতো খেয়েছেন মা ঠাকুমার পীড়াপীড়িতে। সাপ্তাহিক এ নিয়মটা ছিল সব পরিবারেই। কাঁচা ছাগল-দুধ দিয়ে থুলকুনি পাতার রস খেলে বলা হয় যতটা খাবে ততটা রক্ত হবে। অর্থাৎ খুবই উপকারী। পেটে লিভার পিলেতে গাম্‌বিস হয়ে গেলে পনোদ্দিনের কচি 'কোম্‌লে' বক্‌না বাছুরের চোনা খাইয়ে রোগ তাড়াত আগের যুগের মা-মাসীরা। রাংচিতা পাতার দাগ দিত বুকে পিঠে।

বলাই বাহুল্য চিকিৎসার নামে আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক অনেক ফন্দিফিকির এসে যায় মানুষের মধ্যে কেন না যত দিন যাচ্ছে সে নাকি ততই চালাক হয়ে যাচ্ছে। সেই চালাকির ফলাফল রোগীর ওষুধে ভেজাল, দুধে ভেজাল, আটায় ভেজাল, মাংসে ভেজাল; শিক্ষায় ভেজাল।

তবু পৃথিবীতে প্রতিদিন যত মানুষ মরে তার চেয়ে বেশি জন্মায়। আর তাদের বাঁচানোর জন্যে অ্যালোপাথিক চিকিৎসার রাজতন্ত্র জুটলেও হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, মুষ্টিযোগ, কবিরাজী, আকুপাংচার, জল-চিকিৎসা কতরকম রোগ-নিবারণী ব্যবস্থার ব্যবসা চলেছে আধ পায়ে, এক পায়ে বা দেড় পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। জীন তাড়ানো, ভূত ছাড়ানো, ঝাড়ন-মন্ত্র, জলপড়া-পানিপড়া, মাদুলি-দোয়া তাবিজ ব্যবসাও এখনো চলছে। তবে হার কমে যাচ্ছে শিক্ষার প্রসার ঘটার ফলে।

তবু শিক্ষিত মানুষেরও ভয় আছে। হতাশা আছে, আছে অতৃপ্তি—তাই মাদুলি-আংটি আসে, প্ল্যানচেট বসে। আত্মার খোঁজ হয়।

হাজার হাজার মানুষ মরে কিন্তু কেউ মরতে চায় না। বাঁচতে হলে কি কি খেতে হবে, কেমন আবহাওয়ায় থাকতে হবে, এসবের চার্ট ডাক্তারবাবু অবশ্যই করে দিতে পারেন কিন্তু ডাক্তারবাবুও তো মারা যান। ভদ্রভাবে মেপে জুকে বাঁচতে গেলে অনেক টাকা চাই। কিন্তু টাকাঅলা লোকেরা কি মরে না?

মৃত্যু যখন আমাদের পাশে পাশে হন্যে বাঘের মতো ঘুরছে তখন সাবধান না হওয়াও তো বোকামী।

বিংশশতাব্দী বুড়ি হয়ে মরতে চলল, পৃথিবীর অন্য সব দেশ যখন সভ্যতার সুখের শয্যায় সিংহের মতো ঘুমোচ্ছে তখন আমরা আছি অন্ধকারে ডিবরি জ্বেলে, পেটে দু'বেলা ভাত নেই, পরণে ছেঁড়া ট্যানা, শতকরা ৬৫ জন মূর্খ, মাথা পিছু উপায় মাত্র ১৩ পয়সা—অতএব বাঁচার জন্যে, স্বাস্থ্যটা রাখার জন্যে বিনা পয়সার সাবেকী মুষ্টিযোগ চিকিৎসায় ক্ষতি কি? যারা গ্রামের মধ্যে রয়েছি, গ্রামের মধ্যে জন্মেছি, আবার মরবও। শুধু শহরে ছুটে যাই রোজগারের ধান্ধায়, শহর এখনো কোল দেয়নি গরিব আর

অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত বলে—তাদের জীবন রোগে পঙ্গু হলে সংসারটা দেখবে কে?

পুরনো হাড়পাকা কোবরেজ মান্যবর অধিকারীর কাছে মুষ্টিযোগের যে ফর্দটা পেয়েছি ত বুড়োর মতো পাকা সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য কিছু খরচ করলে দুস্থ দরিদ্র পরিবারের মানুষরা উপকার পেতে পারেন।

(১) সৈন্ধব লবণসহ হরীতকী, পিপুল চূর্ণ খেলে চোঙা ঢেঁকুর ওঠা বন্ধ হয়, অজীর্ণ জীর্ণ হয়। (২) পিত্তরোগে ধনে, পলতা আর ছোলার জল পরম উপকারী। (৩) কাঁচা তেঁতুল পুড়িয়ে সোরার সাথে বেটে ছোপ দিলে আহত স্থানের বেদনা দূর হয়। (৪) ছটাক খানেক দুর্বার রস চিনির সঙ্গে সেবন করলে রক্তবমি বন্ধ হয়। (৫) কাশীমোল্লা বা জিউলী গাছের রস, চুনের জলের সঙ্গে পান করলে পেটের যন্ত্রণায় আছাড়-কাছাড়-করা অম্লশূলের ব্যথা দুর হয়। (৬) কাঁচা হলুদ আর নিমপাতা চর্মরোগে মোক্ষম ওষুধ। (৭) অম্বল, দমকা বমি বা কৃমিরোগ সেরে যায় চুনের জল পান করলে। (৮) বাসকের রস ছটাক খানেক মধুর সঙ্গে খেলে যক্ষ্মা কিংবা রক্তপিত্তজনিত রক্তবমি নিবারণ হয়। (৯) কালি ঝাঁপের পাতা বেটে কামড়ানো জায়গায় লাগালে কুকুর বিড়াল, শিয়ালের বিষ নষ্ট হয়, ঘা ভাল হয়। (১০) আকন্দ আঠা, সরষের তেল, আখের গুড় একসঙ্গে করে ক্ষতস্থানে লাগানে ক্ষেপা কুকুরে কামড়ানো ঘা ভাল হয়ে যায়। (১১) ধুতুরা বা সিমপাতার রসে গলার ব্যথার আরাম পায়। (১২) চাঁপা, আনারসের পাতার রসের সাথে চুনের জল মিশিয়ে পান করলে সবরকম কৃমি নষ্ট হয়। (১৩) বেলপোড়ায় শাঁস, চালুনীর জলের সাথে ভাজা জিরে গুড়ো আর চিনি মিশিয়ে খেলে আমাশাজনিত পেট কামড়ানী ভাল হয়। (১৪) নিমপাতা, হলুদ গুঁড়ো, ঘরের ঝুল আর গন্ধক চূর্ণ সরষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে খোস-পাঁচড়া আরোগ্য হয়। (১৫) মৌরী ভিজোনো জলের সঙ্গে ফুলখড়ি ঘষে খাওয়ালে কচি ছেলেদের অজীর্ণ, দুধতোলা ও বমি বন্ধ হয়। (১৬) এক ঝিনুক আমলকীর রসের সাথে ত্রিশ ফোঁটা পেঁপের আঠা মিশিয়ে খেলে অম্লপিত্ত দমন হয়। (১৭) অসাবধানে কোনো গরল উদরস্থ হলে তুঁতে গোলা জল খেলে উপকার হয়। (১৮) বিট লবণ, গোল মরিচের গুঁড়ো, কর্পূর, সুপারি ভস্ম এক সঙ্গে মিশিয়ে দাঁতের গোড়ায় চেপে ধরলে মাড়ি ফোলা ও মাড়ির ব্যথা ভাল হয়। (১৯) হরীতকী, মৌরী, ধনে, মিছরি, গোলাপ ফুল ভিজোনো জল খেলে শূল ও কোষ্ঠবদ্ধ দূর হয়। (২০) কেঁউ ফলের বীজ শুকনো করে তার নস্য নিলে অর্শ সেরে যায়। (২১) বেলগাছের গোলঞ্চর পালো বা ঝুরি অর্শের ওপরে লাগালে বলি সারে। (২২) কালো তিল আর ডালিম-ফুল সমান পরিমাণ বেটে মাখন এবং মিছরির সাথে খেলে অর্শরোগের আরাম হয়। (২৩) কোকসিমের রসে শিমূল তুলো ভিজিয়ে বলির ওপরে বসিয়ে খানিক রোদ

লাগালে বলি খসে পড়ে যায়। (২৪) সাজিমাটি আর চুন মিশিয়ে আঁচিলের ওপরে লাগালে আঁচিল পুড়ে গলে মূলসমেত উঠে যায়। (২৫) একশিরা বা গোদের ওপর কদমপাতা বাঁধলে উভয় রোগই সারে। (২৬) কতকগুলো আতাপাতা রেড়ির তেলে ভিজিয়ে আগুনে সেঁকে একশিরার ওপরে দিলে কোষ বৃদ্ধি বন্ধ হয়। (২৭) কুরচির শুকনো ছাল পুড়িয়ে গরমির ওপরে প্রলেপ দিলে গরমি শুকিয়ে যায়। (২৮) সোহাগা জলে গুলে ঘায়ের ওপর মালিশ করলে গরমি শুকিয়ে যায়। (২৯) অশত্থ গাছের ছাল পুড়িয়ে অথবা আফিম জলে গুলে লাগালেও গরমি শুকিয়ে ভাল হয়। (৩০) শিমূল গাছের আঠা খেলে বহুমূত্র সারে। (৩১) কাঁচা পিঁয়াজ অথবা সুপারির সাথে নারকেল ফুল খেলে পাথরি ভাল হয়।

প্রকৃতিকে হারিয়ে ফেলা শহরের মানুষেরা এসব জিনিস বাজারে খোঁজ করলেই পাবেন। তবে কে এসব ঝক্কি পোয়ায়? তার চেয়ে তাঁদের ট্যাবলেট গেলাই ভাল। তবে নকল ওষুধ থেকে অন্য আর সব রোগ মরণকে তরান্বিত করতে হাতছানি দিতেও তো পারে।

পান এখন কুটির শিল্প, নেশার এবং বিলাসিতার জিনিস

সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে বিম্বাধরের উল্লেখ আছে অর্থাৎ পাকা তেলাকুচোর মতো লাল ঠোঁট। আর্যদের অবশ্যই তা ছিল। ইরানী, ইরাকী বা কাশ্মীরী মহিলাদের সেটা এখনো আছে। চতুর্দশ পুরুষের ঠাকুরমাদের পাকা গমের মতো রঙ যখন আর্য-অনার্য মিশ্রণে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বা মাগুরে রঙ হয়ে গেল, তাঁদের ঠোঁটও আর পাকা তেলাকুচোর মতো রইল না—তাই তাম্বুল রাগ-রঞ্জিত করতে হ'ল। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করতে গিয়ে দাঁত কালো হয়ে যায় বলে একালের শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মানুষরা পান খাওয়া ছেড়ে দিলেন। জমিদার বা নবাবদের স্বর্ণভস্ম মুক্তোভস্ম দেওয়া পানের ফেলে-দেওয়া ছিবে খেয়ে মাথা ঘুরে তিনদিন বেঘোরে পড়ে থাকতে শোনা গেছে চাকর-বাকরদের। এখন জনপ্রবাহ ছুটেছে অফিসে কারখানায় জাহাজে ট্রেনে ট্রামে বাসে—কাজ না করলে ভাত নেই—ছাদ নেই—নেশা করে বুঁদ হয়ে বসে থাকার সময় কোথা?

তাই বলে কি আধুনিকাদের ঠোঁট লাল হবে না? লিপস্টিক এলো। মেমেরা খুব টকটকে লাল করে রঞ্জনী ঘষে ঠোঁট রাঙায়। অফিস আদালতে কাজ করা বাইরে বেরোনো স্বাধীনা মহিলারা ঠোঁট রাঙাতে লাগলেন। কিন্তু যুবতী রমণীর অধর রক্তিম করার রেওয়াজ ছিল মোগল হারেমের মধ্যেও। লোধ্র ফুলের রেণু দিয়ে প্রাচীন মহিলারা গণ্ডদেশ রক্তিম করতেনও। বাংলাদেশী এক গায়িকার সঙ্গে আকাশবাণীতে আলাপ হবার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনার ঠোঁটের বাহার খুলেছে কিন্তু রঙের মাত্রাটা কি ঠিক এতোটাই হবে?' তিনি হেসে খুব তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'জী হাঁ—এইরকমই হবে।' বললাম, 'কি করে জানলেন?' বললেন 'মোগল আর্টে আছে।' বলে টেপা হাসি হেসে তিনি মরাল গতিতে চলে গেলেন। তাঁর হাসির অর্থ ঃ অধর যার প্রতীক তার অভ্যন্তরস্থ রঙটাই যে আকর্ষণ করতে সক্ষম। চতুরা মোগল মহিলারা রূপচর্চার ব্যাপারে খুবই নিখুঁত মাত্রায় সচেতন ছিলেন—আমরাও আছি।'

ঠোঁট নিয়ে কোর্টে হাজির হবার ইচ্ছে আমার নেই—যার যতটা রাঙাতে ভাল লাগে রাঙাক কেন না যৌবন আর ক' দিনেরই বা ফুল! ফুল ফোটার দিনগুলো চারদিকে ফুলে ফুলে ভরে থাক।

গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে তাম্বুল সেবনের কথায় আসি। পান এখনও লক্ষ লক্ষ লোকের নেশার জিনিস। প্রবাদ আছে, 'ভাত বিহনে যেমন তেমন, পান বিহনে মরি।'

ধুত্‌রো বা বেলফুলের মতো দাঁত সাদা রেখে নির্মল হাসির পবিত্রতা রক্ষা করছেন

যাঁরা, তাঁদের সংখ্যা কিন্তু বেশি নয়। তাহলে সুপারির দাম চল্লিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা কেজিতে পৌঁছত না। ফলনও কম হয়েছে গত বছর। এ বছরও গাছে মাল নেই প্রায়। আধখানা সুপারি এখন পঁচিশ পয়সা। আর 'ফল নেই, ফুল নেই, পাতায় ভরা' পানের দামও আগুন হয়ে যায় শীতগ্রীষ্মে। কেবল অঢেল পান থাকে বর্ষাকালে। শীতে পান ঝরে যায়। গ্রীষ্মে জল না পেয়ে উষ্ণতাপ প্রবাহে পান নষ্ট হয়ে যায়। পানের বরোজ আছে ২৪ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুর জেলায়। গয়া, হাজিপুরেও পান হয়। ওড়িশার লোকরা পানের খুব ভক্ত। দোকানও তাদের ভারতের সর্বত্র। খুলনা জেলার বাগেরহাটের পানও আসত আগে শিয়ালদা বাজারে। হাওড়া জেলার নন্টে বাটুল বা ২৪ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে যত পানের মোট সবই লরি বা ম্যাটাডোর ভর্তি হয়ে আসে শিয়ালদায়। সেখানে থেকে ছড়িয়ে যায় নানান দোকানে। চাষীরা হাটে-বাজারে পান নিয়ে যায়, পাইকিরি বেচে আসে বাঁধা পান দোকানীকে।

দিল্লি লক্ষ্ণৌ-এ পানের বিখ্যাত দোকান আছে। আছে কলকাতাতেও। শত রকমের জর্দা মশলা সুর্তি গুণ্ডি দিয়ে অথবা মিষ্টি পান, ছাঁচি পান বিক্রি হচ্ছে নিয়ত। কাজ বাড়িতে কয়েক কোণা পানের দরকার হয়। বিয়ে বাড়িতে পানের ছড়াছড়ি। খানদানী খাঁ সাহেবদের গানের জলসায় তবক দেওয়া পান এনে দিতে হয়। নইলে মৌতাত জমে না।

পান সুপারি জর্দা বা দোক্তা যারা খায় সংসারে তাদের একটা বাড়তি খরচ আছে। সময়ে এসব না এনে হাজির করলে গিন্নি রেগে খুন হয়। পান খাওয়া লোকদের দাঁত কালো তো হয়ই জামাতেও দাগ পড়তে দেখা যায়। ঋত্বিক ঘটকের পাঞ্জাবিতে পানের পিক লম্বা হয়ে ঝরে থাকতে দেখেছি।

গ্রামের বিত্তবান চাষীবাড়ির নতুন বউকে পান খেয়ে আয়নায় জিভ মেলে কতখানি লাল হয়েছে তা দেখতে থাকলে তার শাশুড়িকে বলতে শুনেছিলাম, 'ভাল মানুষের বেটি যেন কখনও পান খায়নি! চারদিকে পিক ফেলে করেছে কি—এ্যাঁ!'

বউ তখনো আয়নার ভেতরে রাঙা জিভ তুলে বসে আছে।

অতিরিক্ত পানদোষ যাদের আছে, তাদের সারাদিন জাগ্রত অবস্থায় তো পান চর্বণ চলেই রাত্রেও পাশে থাকে পানের ডিবে। ঘুম ভাঙলেই পান পোরে। আর কখনও কখনও পানের পিক গড়িয়ে পড়ে বালিশে-গেঞ্জিতে-ব্লাউজে।

মৌলবী সম্প্রদায়ও পানের পরম এবং চরম ভক্ত। পান খেলে নাকি অজু চটে না। তবে গুণ্ডি জর্দা পানে যদি নেশা হয়, অজু করাই বিধেয়।

পান এখন কুটির শিল্প। দশকাঠা জমিতে পান চাষ করলে সংসার চলে যায়। কথায় আছে ঃ বিনা চাষে পান। অর্থাৎ মাটি না কুপিয়ে কেবল হাল্‌কা সরল ভাঁটিতে

দুটি গাঁট সমেত একটা পান বসিয়ে দিতে হবে আধহাত ছাড়া ছাড়া। সার খইল দিয়ে গাছ উঠলে প্যাকাটি পুঁতে 'জুন' বা 'উলু' দিয়ে বেঁধে দাও। তার আগে অবশ্য বাঁশের উবি পুঁতে তারের টানা বেঁধে কাশ, প্যাকাটি, বা নারকেল পাতা দিয়ে চাল ছেয়ে বরোজ সাজতে হবে। মেলা খরচ। সবসময় পান বরোজে লোক লেগে থাকতে হয়। জল বা পাঁক অথবা মাটি বয়ে বয়ে গতর মাটি হয়ে যায়।

আগে সংস্কার ছিল মেয়েরা পান বরোজ ছোঁবে না। তাহলে পান সব ঝরে যাবে। কিন্তু পবিত্র কাপড়ে সুস্থ শরীরে মেয়েরা পান বরোজে গেলে ক্ষতি কি? বহু মেয়ে এখন পান বরোজে কলসী করে জল বয়ে ঢালে।

স্বামীহারা কত মেয়ে পথের পাশে পান দোকান করে বসে আছে। ঘরের পান সাজা তার উঠে গেছে। স্টেশনের পান দোকানি বিরেশ্বরীকে কতবার নাকি রেলপুলিসে ধরে নিয়ে যায়, মারে, কেস দেয়। তাই ওদের পান সিগারেট পেয়াতে হয় মিনি-মাগনা। ওরা নাকি সাধের সরকারি নাত-জামাই।

গোলদীঘির পাশের কল্পতরু নামক বিখ্যাত পান দোকানটিতে দু'টাকা, চারটাকা থেকে দশটাকা পর্যন্ত পানের খিলি। রাজা মহারাজারা খান সেই পান। দু-চার ঘন্টা নেশার ঘোরে তাঁদের পড়ে থাকলেও চলে। তাঁদের পায়ের তলা দিয়ে দিন চলে যায়, রাত চলে যায়। পানের দোকানে নাম আর ফটো রেখে যাঁরা বিখ্যাত হতে চান মনে হয় তাঁদের জীবনই ধন্য!

পান অসামাজিক নয় বরং পান দিয়ে মান রাখতে হয়। একটা সুপারি দু'টো পান হাতে দিয়ে মুসলিম বিয়ে বাড়িতে কনে পড়ানোর সময় 'উকিল গাওয়া'র মান রাখতে হয়। ডালা সাজাতে হয় পান সুপারি দিয়ে। বামুন ঠাকুর পান-সুপারি হাতে নিয়ে বিয়ের কনের কাছে 'এতে নমঃ' বলে জানান।

পান কত রকমের আছে? শুনুন তাহলে। ঘন গোঁটে, মজাল, ছাঁচি, বাঙাল, ভাবনা বাঙাল, হাতকে বাঙাল, গুলে বাঙাল, হাজিপুরী (ঝাল), গয়া, গেছো পান, হরগৌরি (একচির সাদা একচির সবুজ), বাগের হাটি ইত্যাদি।

ভারতের যে শহরেই পান খেতে চান, পাবেন। তবে সাহেব মেমেদের কখনও পান খেতে দেখিনি। কাবুলীরা এদেশে অনেককাল থাকলেও পান খায় না।

সব সহ্য করা যায় মানুষের মুখের গন্ধ সহ্য করা যায় না। লিভার খারাপ যাদের তাদের মুখে গন্ধ হয়। কণ্ঠনালীর মধ্যে গুলি গুলি সাদা ময়লা জমে। এসব লোকেদের পান খাওয়া উচিত। জর্দা দোক্তায় পাকস্থলী গমর করার ফলে হজমের দোষ বা সুপারি গুণ্ডির কুঁচোর জন্যে পেট পরিষ্কার না হলেও পান খাওযা লোকদের বোধহয় জণ্ডিস হয় না। কারণ পানের রস এবং চুনে ক্যালসিয়াম থাকে। তবে জর্দা বা

দোক্তা চুণের সঙ্গে মেশার পর যে উত্তাপ সৃষ্টি করে তা মাড়ি আর ঠোঁটের ভেতরকার নরম ত্বক হাজিয়ে দেয়। তাতে গুলগুল করাই হ'ল নেশা। দোক্তার পরিমাণ বেশি হলে হিক্কা উঠবে। খালি পেটে যে কোনো নেশাই মারাত্মক। ক্রমাগত চুণে হেজে যাওয়া জায়গায় ক্যানসার হতেও দেখা গেছে—বিশেষ করে যারা খৈনি খায়।

গাড়িতে ধূমপান নিষেধ হলেও পান খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। তবে পিকটা যদি কোন পথিকের মস্তকে ফেলে দাও মিয়া তো প্রহার অনিবার্য!

ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রচণ্ড রকম ধূমপায়ী ছিলেন। তাঁকে কত লোক নিষেধ করেছেন। উত্তরে তিনি বলেছেন ঃ 'কতবার তো ছেড়ে দিয়েছি।' অর্থাৎ আবার ধরেছেন।

এইরকম পান খাওয়া নিয়ে কত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ হয়েছে, সংসার ভেঙে যায় যায় অবস্থা—আবার পান খাওয়া ধরে তবে বংশরক্ষা হয়েছে।

'ননসেন্স পান খাও কেন'—বলে গাল দিলে ভুক্তভোগী মাত্রেই ভিজে বেড়ালের মতো জুলজুল করে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন, অতএব নানা পন্থা।

ভাষার খেলায় প্রবচন রসের ধারা বওয়ায়

সব জাতি বা ভাষার মধ্যে প্রবচন আছে। প্রবচন খুব জ্ঞানগর্ভ আর সারবস্তু। খনার বচন যেমন বাস্তবতার কষ্টিপাথরে ঘষা খাঁটি সোনার মতো তেমনি পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় নানারকম প্রবাদ কথা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। কথায় কথায় উপদেশ দেবার মতো এগুলো প্রয়োগ করা হয়। লোককথা বলেই এসব অশ্লীলতা মুক্তও নয়। কথাবার্তায় গ্রাম্য অশালীনতা থাকলেও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বেদ উপনিষদের মতো জ্ঞানগর্ভ প্রবচনের একটি পাহাড় বিশেষ। প্রবচনের মধ্যে রয়েছে সাহিত্যরস আর দর্শন। অনেক সময় ছড়ার মধ্যে এটা প্রকাশ পায়। তবে খুব ছোট ছোট, নইলে কথার মধ্যে প্রয়োগ করার অসুবিধা। কোনও কোনও প্রবীণ লোকের ভুঁড়িভরা আছে প্রবচনে। সেটাই তাঁর বিদ্যে।

বজবজ থানার হাউড়ি গ্রামের লক্ষ্মণ বাগ এমনই একজন লোক। বিচার সালিশি বসলেই তাঁকে ডাকা হয় সারা অঞ্চলে। কত বছর কত সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে কেটেছে। তিনি কথায় কথায় বলতেন 'মন জানে পাপ, মা জানে বাপ'—তোমার বাপ কে তুমি কি করে জানলে, বলে দিয়েছে তোমার মা। আর মনের অগোচর কোনও পাপ নেই। সেদিন অমল গাঙ্গুলির বি এ পাশ ছেলেটা গেছে আমার কাছে, ওর বাবা ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে আমার 'বহুকালের পীরিত'— জানি কোনও 'সুখের বার্তা এনেছে পারাবত' কিন্তু বটতলায় গিয়ে সাধুর আশ্রম থেকে এক ছিলিম টেনে এসে আমি তখন স্বর্গে আছি। বললাম, 'কে তুমি? বাপের নাম কি? বলল, আজ্ঞে, কাকাবাবু আমি অমল গাঙ্গুলি, বাপের নাম প্রহ্লাদ গাঙ্গুলি। আমি বললাম, ওটা তো 'জনশ্রুতি'। ছেলেটা দেখি রাগে জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে নেয়োপাতা বিড়ালের মতো তাকিয়ে আছে—কেবল আজ্ঞে আজ্ঞে করছে।....

চৌমাথানী রাস্তার মোড়ে চারদিকে দোকানপাট, লোকজনের ভিড়, তার মধ্যেই ছিল আমাদের আড্ডা। নানা লোক আসে তাদের সম্বন্ধে কথা হয়। হঠাৎ শোনা গেল আশুতোষ মান্না বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছে। লক্ষ্মণবাবু বললেন, 'বুড়ো বয়সে বউ করা পরের জন্যে।'

এলাহি বক্স সাপুড়েকে দেখে বললেন, 'সাপ নিয়ে যতই মক্সো দেখাও মিয়া, 'সাপুড়ের মরণ হয় সাপের হাতে'।

পূর্ণ সরদার ঘরামির কাজ করে। সে এসে নমস্কার করলে বলেন, 'তুমি তো শত

শত মানুষের ঘর বেঁধে দাও, তোমার ঘর আছে? কথায় বলে, 'ঘরামির ঘর ফাঁকা।'

খুব মেঘ ডাকছে দেখে লক্ষ্মণ বাগ বললেন, 'যত কড়কায় তত বর্ষায় না।' 'হাসা মেঘে ভাসা পানি হয়'।

মোড়ের ওপর দিয়ে কসাইরা গরু তেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, একটা গরুর লেজ নেই দেখে বললেন, 'নেই বলে খাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে—কি বলো দিকিনি?' নিজেই ব্যাখা করে দিলেন, 'গরুর লেজ নেই তাই মশামাছি রক্ত খাচ্ছে, লেজ থাকলে কোথা পেত। লেজের বাড়ি খেয়ে মরতো'।

একদিন পাঁচটা মেয়ে পাঁচটা ছেলে স্কুলে থেকে ফেরার সময় বাপ বড়, না মা বড় এই নিয়ে তর্ক করতে করতে এসে সালিশি মানলো লক্ষ্মণবাবুর কাছে। তিনি বললেন, 'দু'জনেই বড়। তবে সম্মানের দিক থেকে বাবা বড় কারণ বাবা মায়ের পায়ে গড় করে না, মা গড় করে বাবাকে—কাজেই বাবা বড়। পিতা স্বর্গ মানে ওপরে থাকেন। আর মা জন্মভূমি মানে নিচে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি। বাবার শক্তি আমাদের শরীরের হাড়-কঙ্কাল আর মায়ের শক্তি মাংস নাড়ি ভুঁড়ি। তাই মায়ের সম্বন্ধে বলা হয় নাড়ির টান। আর বাবার উত্তরাধিকার। বাবা জমি-জায়গা না দিয়ে গেলে কি মায়ের আঁচল ধরে ভিক্ষে করবে? তাছাড়া তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বলা হয়, কার ছেলে? মায়ের নাম বলো কি?

সাগরেদকে টপকে পীরের কাছে গেলে বলা হয়, 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাচ্ছ?'

'মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি নাকি?' বিড়াল হ'ল বাঘের মাসি', 'আসলের চেয়ে সুদের ওপরে টান বেশি', 'হাসলে যেন মুক্তো ঝরে', 'মহম্মদ পর্বতের কাছে যান না, পর্বতই মহম্মদের কাছে আসে'। 'গাই নেই তো বলদ দুয়ে দোব?' 'তেলা মাথায় তেল দেয়', 'বাঁশ বাগানে ডোম কানা', 'মক্কায় কি গাধা নেই?' 'কৃষাণ গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর', 'নিকের বউ ঠিকের জমি', 'খেটে মরে হাঁস ডিম খায় দারোগাবাবু', 'কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোবার ইচ্ছা', 'সাপের পাঁচ পা দেখেছো?' 'কলসীর জল গড়াতে গড়াতে ফুরোয়,' 'নারীর যৌবন দু'দিনের', 'বক্না ডাকতে থাকলে গেরস্তর অমঙ্গল হয়,' 'ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো', 'হাটের চাল ঘাটের পানি', 'পীরিতে নাৎজামাই', 'টাকা না থাকলে সব বিদ্যেই ফাঁকা,' 'গোপন কথা সিন্দুক, প্রকাশ পেলেই বন্দুক' এসব হ'ল সাধারণ প্রবচন।

লক্ষ্মণবাবু কোনও গরিব তফসিলী ছেলেকে বাবু সেজে যেতে দেখলে বলতেন, 'বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন'। বলতেন, 'এরা হ'ল 'কলসীবাবু'। মানে জামাকাপড় করেছে হয়তো মায়ের কচু ডাঁটা কলমী শাক বেচা পয়সায় কিন্তু রাখার ট্যাঙ্ক তোরঙ্গ নেই, তাই বাতিল কলসীর মধ্যে রাখতে হয়, নইলে 'ঘরের চালে

খড় নেই', 'জল হলে কাক ভেজা' হবে।'

গ্রামে শাউড়ি বৌয়ের ঝগড়া খুবই বিখ্যাত। লক্ষ্মণবাবু প্রায়ই মীমাংসা করতে যান। তিনি বলেন, 'কোড়ে রাঢ়ী অর্থাৎ বাল-বিধবা হলে সে বড় জ্বালানি হয় কারণ সে থাকে অতৃপ্ত। আর 'বুড়ির খুব রস হয়েছে' কথাটা নিদারুণ লজ্জাজনক।

সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র রসিকতা করে কথা বলেন সব সময়, তাঁকে বহুলোক 'কাকাবাবু' বলেন। একবার এক ভক্ত পাঠক বললেন, 'আমার মেয়েটি বড় ভাল, ছেলেটি হয়েছে বাঁদর।' গজেনবাবু বললেন, 'ঠিকই হয়েছে 'বাবার হাত রেখেছে।' অর্থাৎ তুমি যেমন বাঁদর, তোমার ছেলেও হয়েছে তেমনি বাঁদর।

একবার এক পত্রিকাওলা এম এ পাশ সাঁওতাল ছেলের সঙ্গে জাতীয় আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর 'সুধর্ম' বাড়িতে। বলেছিলাম, 'ঠিক আছে, আপনি যোগাযোগ রাখবেন।' সুনীতিবাবু বললেন, 'ওভাবে বলতে নেই, বলতে হয় আমি যোগাযোগ রাখবো। আমি জ্যোতিবাবুর পাড়ায় বাস করি, বলি না যে জ্যোতিবাবু আমার পাড়ায় বাস করেন। 'রাজার পাড়ায় আমার বাস' কথাটায় থাকে বিনয় আর 'আমার পাড়ায় রাজার বাস'—কথাটায় থাকে স্পর্ধা। রাজা তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে দণ্ড দিতেও পারেন।'

ধর্মেও কিছু কিছু প্রবচন ধরনের কথা আছে। যেমন ঃ 'পাল্লা পাথর ঠিক রাখো, ওজন ঠিক দাও, যখন কথা বলো, হক কথা বলো।'

কোন এক জমিদারবাবু খাজনা আদায়ের জন্যে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'তোরা সব শুয়োরের বাচ্চা।' উত্তরে প্রজাবৃন্দের এক বিনয়ী প্রতিনিধি বলেছিল, 'আজ্ঞে হাঁ হুজুর 'আপনি হলেন আমাদের মা-বাপ'!

প্রবচন আছে, 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন', 'যার এককাঠা জমি নেই তার নাম জমিদার', 'নুনের পুতুল গেছে সাগরে জল মাপতে', 'আহ্লাদে আটখানা', 'ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?' 'জন, জামাই, ভাগ্না—তিন নয় আপনা', 'শয়তানের শিং গজিয়েছে', 'বুকের ভেতর (চিঁড়ের) ঢেঁকির পাড় পড়ছে', 'ভিখারীর আবার বাটপাড়ের ভয়,' 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা', 'যার নেই ধর্ম-কর্ম সেই করে পুলিসের কর্ম', 'ছেলেকে দেবে না যাত্রা দলে, গরুকে দেবে না আখশালে', 'বিয়ে ফুরোলে ছাদ্‌নায় লাথি', 'চহরম দেখলে বাঁচা ভার', 'বুড়ো মেরে খুনের দায়', 'বুড়ির হয়েছে হাঁড়ির হাল'। ঘোড়ার ডিম, বাঙের সর্দি, কুমীরের কান্না, সোনার পাথর বাটি এসব কথা তো আকছার ব্যবহার হয়।

প্রবচনের ভেতর প্রায় সব সময় রসিকতা থাকে। কখনও বা থাকে তাচ্ছিল্য।

'বাবুর চেয়ে চাকরের দাপট বেশি', 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়', 'ভাত বেড়ে কুলোর

হাওয়া দিচ্ছি', 'ছাগলে যদি হাল টানতো', 'ভক্তের বোঝা ভগবান বয়' এসব প্রবচন কথায় কথায় প্রয়োগ হয়।

লক্ষ্মণ বাগ একদিন বললেন, 'রামতারণের দুটো বউ, তার এখন শোবার জায়গা নেই। গোলামনবী মৌলবীর চারটে বউ তাই দাঁড়াবারও জায়গা নেই, গ্রামে গ্রামে ধর্মের শান্তি বিলিয়ে বেড়ান।'

সাহিত্যিক ও সমালোচক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব খুব রসিকতা করে প্রবচনের সাহায্যে কথা বলতেন। একটি নামাজী বিনয়ী বুড়ো মুসলমান একবার বেতের চেয়ার সারতে এসে জানালো যে তার ছেলেটি চোর ছ্যাঁচোড় হয়েছে। কাজী সাহেব বললেন, 'আমিনের ঘরে কোমিনের পয়দা হয়েছে।'

একদিন খাসীর মাংস খুব উৎকৃষ্ট রান্না হয়েছিল, হাড় চুষে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে দিতে তিনি রসিকতা করে বললেন, 'কিছুই রেখে ফেললে না, 'পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে!'

তিনি বলেছিলেন, 'আমার বাবা ছিলেন বদরাগী লোক, স্টেশন মাস্টার ছিলেন, মাঝে মধ্যে কোনও কোনও গরিব মানুষকে টাকাকড়ি কর্জ দিতেন, হঠাৎ এক শীতের সকালে হাতখালি দেখে তেমন এক চাষী বুড়োর কথা মনে পড়ে যেতে নতুন মলিদা শাল মুড়ি দিয়ে বেরুলেন। গিয়ে দেখলেন, বুড়োটা খালি গায়ে কাঁপছে। বাবা বললেন, 'মাঘ মাসের জাড়ে মোষের শিং নড়ে'। তোমার গায়ে কিছু নেই কেন? তিনি তাকে শালটি দান করে বাড়ি এলে মা বললেন, 'কাজীর হাঁড়িতে কালি পড়ে না', এই প্রবাদ বাক্যটি আপ্‌নের নসিবে না জোটে শেষ পর্যন্ত। বাবা বললেন, 'আল্লা যারে দেয়, ছাপ্পোড় ফাড়কে দেয়।'

কাঁকড়া চিংড়ি মদ আর পেটের অসুখের আড্ডা সাগরদ্বীপ

নামেই সাগরদ্বীপ সুন্দরবন এলাকা—কোথাও একটা সুন্দরী গাছের চিহ্ন নেই। শুধু তীরে কিছু বানিগাছ আর খেজুর চারার মতন হেঁতাল ঝোপ আছে নাবাল জলাচরে। আর আছে বিষাক্ত গেঁয়ো গাছ। সাগরের তীরে ঘুরে বেড়ানো উদোম গরুগুলো শোঁক শোঁক করে শুঁকে দেখে যেমন গোবরের তেজে জন্মানো নধর সবুজ ঘাসগুলোকে অখাদ্য জেনে পরিত্যাগ করে তেমনি গেঁয়ো গাছের পাতাও খায় না। গরুর বুদ্ধি নেই বলে অপবাদ থাকলেও বিষাক্ত ঘাসপাতা চেনার ঘ্রাণশক্তি তার প্রকৃতিদত্ত, এর জন্য কোনও ভেষজাগারে তাকে বাঁচার জন্য পরীক্ষায় পাস করতে হয়নি। গেঁয়ো গাছ নোনা জলের নাবালভূমির গাছ। সাদা দুধের মতো আঠা। চুরি-যাওয়া খেজুরের রসের মধ্যে চাষীরা দিয়ে দেয়, যে খায় নাড়ী পচে গলে বের হয়, হাসপাতালের বাপও রক্ষে করতে পারে না।

সুঁদ্‌রি গাছের পচা গোঁড়া কোন্ মান্ধাতা আমল থেকে সাগরের জলের কোলে আধপোঁতা হয়ে পড়ে আছে—পুকুর কাটলে হাত কুড়ি-পঁচিশ নিচে যে 'পাণ্ডব-পোড়া' আধা-কয়লা জাতের মাটি দেখা যায় ২৪ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে তা হ'ল খাণ্ডব দাহে জ্বলে পুড়ে যাওয়া বড় বড় সুঁদ্‌রি, বানি, ঝাউ, হিজল, হাওয়াই গাছের গুঁড়ির অংশ। কালীঘাটের কোল থেকে এটা আছে ৮০ মাইল দক্ষিণের সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত।

সাগরদ্বীপের গাছগুলোর প্রকৃতি ঝড়ে-ভেঙে পড়ার ভয়ে দীর্ঘাকার নয়, মাঝারি গোছের। যদি অনেক বয়সের হয় তো পাশে মোটা হয়ে পাঁড়ে হয়। মোটা লাল সুঁদ্‌রি কাঠের দামও অনেক। সামুদ্রিক এলাকার গাছগুলোর আঁশ পাক খাওয়া, যাতে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও মচ্‌কাবে তবু ভাঙবে না। যেমন বাবলা গাছ। বঙ্কিমবাবুর নবকুমার হরিণবাড়ির খালের পাশের সোজা পশ্চিমে হুগলি নদীর তীরে, যার ওপারে রসুলপুরের নদী সেখানে ধুতি পরেই যে হেঁতাল, ফণী মনসা, তেকাঁটাল, হরকোচ বানিবনের ঝোপজঙ্গলে রান্নার জন্য শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আনতে উদারচিত্ত হয়ে নৌকো থেকে নেমে গেল, এটা গল্পের বাবু লোকেই পারে। তবে জানা যায় বঙ্কিমবাবু এই অঞ্চলের হুগলি নদীতে বোটে করে এসেছিলেন, দূর থেকে জঙ্গলও দেখেছিলেন, নামেননি। স্কটের ' আইভান হো'-র মতো 'কপালকুণ্ডলা'র প্লটও আসে তাঁর মাথায়।

কিন্তু সুন্দরবনের ভেতরে কাঁটা-জঙ্গলে আর গোখরো, করাতে, খরিশ, বেনাফুলি,

কালকেউটের ছোবলের মুখে নামা শক্ত। নবকুমারের পায়ে জুতো ছিল তো? থাকলেও তো তা পলিকাদায় ডুবে যাবার কথা। আর বানিগাছের সুঁড়িপথে বাঘের হাতে পড়ার ভয়ও ছিল। পাক খাওয়া শক্ত গাছের শুকনো ডাল সংগ্রহ করাও কঠিন। তাই তার দেরি হল—আর নৌকো চলে গেল!

কিন্তু সাগর চরে দু'মাইল সেই বিক্ষোভ ভাঙা তীরের জল পর্যন্ত ছোট ছোট কাঁকড়ায় সাগুদানার মতো মোলায়েম মাটিতে জুতো মসমসিয়ে নেমে যাও, কোথাও কাদা লাগবে না। হুড়হুড় করে আশ্রমের পেছন দিয়ে খালের জল নেমে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে, সেই জল পার হয়ে যাও, পা একটু তুলতে দেরি হয়েছে তো পায়ের তলায় কুরকুরুনি বা সুড়সুড়ি দিয়ে বালিগুলো সরে চলে যাবে। বোতল সবুজ সাগর জলে সৃষ্টিকর্তার যেন অনন্ত ক্ষোভের দীর্ঘশ্বাস আছড়ে পড়ছে প্রতিনিয়ত। গর্জন শোনা যায় কত দূর থেকে।

ব্যাঙের থুতুর মতো জমাট সাগর ফেণায় এক সট্ মারতেই তার মধ্যে মেট্লে সাপের মতো এক হাতের কিছু বেশি অত্যন্ত বিষাক্ত সাদা কালো ডোবার সাগর মেট্লে জল সেলাই করতে করতে ছুটে পালাল। দূরের দক্ষিণ-পূবে মেঘের মতো জম্বুদ্বীপ—পশ্চিমের ক্রান্তিরেখায় হাঁড়িভাঙা দ্বীপ। এই দুটো দ্বীপেই শুকো মারতে যায় জেলেরা। সাপের কাঁটারই ভয় বেশি সেখানে! আর আশ্চর্য, মাটি খুড়লেই মিষ্টি জল! কলসী ভরে রাখো। খুব বড় বড় কলসীগুলোতে জেলেরা মিঠে জল নিয়ে যায়? তা নয় ওগুলো জালের দড়িতে বেঁধে উপুড় করে ভাসায়।..

গোটা সাগরদ্বীপে এখন আর ঘর বাঁধবার জন্যে শক্ত গরাণ গাছ নেই। সমূলে আবাদ। এঁটেল দোঁয়াশ না হলে বালি মাটিতে। বাঁশও ভাল হয় না। নারকেল খেঁজুর সুপারি গাছ আছে সর্বত্র। ছোট ছোট নারকেল সুপারি গাছে অজস্র ফল। অজস্র তরমুজ হয় ফালি ফালি জমিতে। জমি সবই নাকি বাইরের বাবুদের। মেদিনীপুরের লোকই বেশি। সাগরদ্বীপে বেশিরভাগই কালো কালো মানুষ। দু'একঘর ব্রাহ্মণ কিন্তু সাহেব ফর্সা।

সাগরদ্বীপে ছিপ ফেলে না কেউ। খালে বিলে অজস্র মাছ। চিংড়ি বেলে ট্যাংরা ধরছে মেয়েরা। কোমরের দড়িতে হাঁড়ি বাঁধা। ছোট ছোট মেয়ে ছোট ছোট জাল। মেয়েরা খ্যাপলা জালও ফেলে। দু'জনে ধরে টানে অনেকেই। এক দঙ্গল করে মেয়ে। ছেলেরা বড় একটা মাছ ধরে না খালে বিলে। তবে বাঁধা পুকুরে আছে পোনা মাছ। আত্মীয় কুটুম এলে কর্তা জাল ফেলতে বলেন পুরুষদের। রুই কাতলার মুড়ো দেন ডাকের থালায়। বেশ চর্বিদার তাজা মাছ।

ইস্টিমারে চড়ে সাইকেল নিয়ে কাঁকড়া-মারি দ্বীপ থেকে সাগরদ্বীপ হয়ে কাকদ্বীপে

উঠে প্রতিদিন করঞ্জলি হাইস্কুলে মাস্টারী করতে আসেন তরুণ ছোকরা সুনীল মিত্র। ঐ অভাগা দ্বীপ থেকে পেটের অসুখের পরিবেশে হলেও ইংরেজিতে এম এ পাশ করেছেন। আছে কচুবেড়িয়ার পরে বামুনগাছির লেবরেটরিতে রিসার্চরত সাগর সন্তান কমলেশ মিশ্র—জিয়োলজিতে ফার্স্ট ক্লাস হওয়া মেদিনীপুরের ফর্সা চেহারার স্মিতভাষী ব্রাহ্মণ সন্তান। প্রায় মাটির সঙ্গে ঠেকে থাকা খড়ের ছাউনি দেওয়া বাঁশের কাঠামোর মাটির ঘর থেকে হুমড়ি খেয়ে বেরিয়ে আসে গরিব মানুষরা বাঁকা মুখের সিক হাতে নিয়ে তিন চার হাত গভীর গর্তের ভেতর থেকে সমুদ্র কাঁকড়া ধরতে। সারা দিন জলা-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বিড়ি টানা আর কাদা মেখে ভোঁদড় হয়ে কাঁকড়া ধরা। সাড়ে তিন টাকা চার টাকা কেজিতে বেচে দিতে হয়। সাঁঝবেলার কোনও হাটে বসে। অথবা দু-তিন দিনের মাল একসঙ্গে জমলে বউ কলসী বা ঝোড়ায় ভরে মাথায় করে নিয়ে যায় ইস্টিমার ধরে কাকদ্বীপের বাজারে। বাবুরা তেলে ঝালে রান্না করে খায়। এক কেজি চাল কিনলে সংসার চলে। নইলে চিংড়ি কিংবা শামুকের মুঠি সেদ্ধ আর ধেনো মদ তাড়িই ভরসা।

রুদ্রনগরে ইলেকট্রিকের সাজসরঞ্জাম বসেছে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেবার কাজ এখনও কিছু হল না। হাইস্কুল বসেছে, বাবুদের ছেলেমেয়েরা পড়ছে। থান ইটের মতো বইপত্রের দাম অনেক। মাইনে না লাগলেও 'ওসনের কড়ি চোষনে মারে'—নানারকম ট্যাকসো আছে। আর যে মাস্টারের সাবজেক্ট, তাঁর কাছে টিউশনি না পড়লে নাকি পাস করা দায়!

২৪ পরগণার অংশ সাগরদ্বীপ থেকে বাঘ হরিণ শুয়োর খরগোশ সাপ ডাকাত পালিয়ে গেছে বটে, আছে দারিদ্র্য। ঘর বাঁধার আর পেটের ভাতের কষ্ট। গতর খাটাতে হয় বেশিরভাগ মানুষদের। উজান হাওয়ায় ভ্যান রিক্সায় উঠলে বাবু হলেও সামনের দু'জনকে দু'পা লাগাতে হয় রিক্সাঅলার সঙ্গে।

এত ধান আর তরমুজ ফলে, যায় কোথা? সবই নাকি বাবুদের পকেটে। বাবুরা থাকেন মেদিনীপুর, কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, কচুবেড়িয়া, ডায়মণ্ডহারবার এমন কি কলকাতাতেও।

সাগরদ্বীপে আড়াআড়ি খাল কাটা—পুবের দিকে মুড়ি গঙ্গা, পশ্চিমে হুগলি নদী। নৌকোয় মোহনা নদী আড়খে মারতে যায় আট ঘন্টা। ওপারে জোনাকীর মতো আলো জ্বলে রাত্রে। দশ কিমি চওড়া আর আঠারো কিমি লম্বা সাগরদ্বীপের মাথায় আছে কপিল মুনির আশ্রম। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর ভিড় হয় এখানে মকর সংক্রান্তিতে। আছে লাইট হাউস। বেতার সম্প্রচারক লৌহচূড়া।

সাগরদ্বীপের মস্ত রোগ পেটের অসুখ। টিউওয়েল থাকা সত্ত্বেও এই রোগ সারানো

যায় না। সায়েবেরাও পালিয়ে গেছে এখান থেকে। নোনা জলের আবহাওয়ায় ক্রনিক আমাশা রোগের জীবাণু মাছিতে ছড়ায়। দরিদ্র মানুষরা কাঁকড়া চিংড়ি মদ তাড়ি খেয়ে পেট ছাড়লে গালে হাত দিয়ে উদারচিত্তে তা পথের পাশে ছেড়ে দেয়। কিছু বললেই ফণা তুলবে। বঁটি নিয়ে তার বউও তেড়ে আসতে পারে।

বিচিত্র রঙের কাঁকড়া আছে সাগরদ্বীপে. সমূদ্রের ধারে। সুন্দর সুন্দর মরা কড়ি শামুক গেঁড়ি কুড়িয়ে এনে রেখে দাও— তারা চলতে থাকবে। কারণ তাদের ভেতরে আছে সন্ন্যাসী কাঁকড়া। একটা দাঁড়া বেরিয়ে থাকে—তাই দিয়ে শিকার করে। সাগুদানার মতো মাটি তৈরি করা বেলাচরের ওপর দিকের খুব ছোট ছোট কাঁকড়াদের সঙ্গে ছুটে মানুষও হার মানে! হাওয়ায় যেমন উড়ে যায় তারা। আর বেলাতটে অসংখ্য যেন জবাফুল ছড়িয়ে আছে, চিল বা সেক্‌রা অথবা কেঁদোচূড়া বক পাখ্‌নায় মারলেই্‌ কাঁকড়াগুলো হঠাৎ যেন জাল গুটিয়ে নেয়—আর নেই। কাঁচা পলিতে গর্তের মুখ ভরে যায়। পুকুরের চিতি কাঁকড়ার চাইতে কিছু বড় চ্যাপটা বিচিত্র রঙের সামুদ্রিক চিতি কাঁকড়ার কী নরম শরীর আর জলে তাদের কী রকম দ্রুত চিৎ সাঁতার দেখলে অবাক লাগে। সমুদ্র শসা ডালিয়া ফুলের মতো ফুটে আছে দেখাল একজন লোক, জিয়োলজির প্রফেসার আর ছাত্ররা গাঁইতি দিয়ে তুলে নিলেন। মাটির নিচে থাকে একরকমের গলদা চিংড়ি। পৃথিবীতে আর কোথাও নেই এমন এক সৌখিন কেঁচোর শরীর পাতলা প্লাসটিকের মতো—তার সূক্ষ্ম ফুটোয় জল ভরে দিলে ফ্লো করে বার করে দেয়। তারপর গাঁইতে মেরে তুলে নিয়ে বালতির জলে কাদায় রাখো। লেবরেটরিতে এনে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখো, দেখবে বড় সাপের মতো, গায়ে কেমন সুন্দর নক্‌শা কাটা।

ছোট ছোট আম গাছেও আম ফলেছে। লাল পিঁপড়ের চাক অজস্র কিন্তু কেউ ভাঙে না। ছিপ দিয়ে মাছ ধরার রেওয়াজ নেই। কলকাতায় পিঁপড়ের টিপের ৫০ টাকা কেজি। মধুর চাক কোথাও চোখে পড়ে না। মিঠে জলের সবরকম গাছ এখানে আমদানি করা হয়েছে। ২৪ পরগণার আর সব গাঁয়ের মত পাকা বাড়িও উঠছে এখানে। বাঁশের সাঁকো থাকলেও কাঠের কালবুত হয়েছে কিছু কিছু। সব লোকই রাজনীতি সচেতন। সি পি এম প্রধান যদি কোনও মানুষের সেফ্‌টি পায়খানা বেঁধে দিতে চান তো কংগ্রেসী সদস্যারা বাধা দেন। খাল কাটার লক্ষ লক্ষ টাকার প্রায় সব গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ফেরত যাচ্ছে, কারণ খাল কাটবে? কাজেই চাষের উন্নতি ক্রমেই পিছু হটছে। যেসব খালবিল আছে ভরাট হয়ে যাচ্ছে, পানায় মজে যাচ্ছে। দুটো মাত্র বাস চলে, একটা যায়, একটা আসে, কচুবেড়িয়া থেকে সাগর বেলা পর্যন্ত।

কাকদ্বীপে নেমে ইস্টিমারে চড়ে সাগরদ্বীপে কোথাও এক রাত কাটিয়ে মশার

কামড়ে পা হাত ছিঁড়ে যদি প্রেমসে হাওয়া খেয়ে রিক্সা ভ্যানে করে এসে সাগরে নামো তবে নোনা জলের জ্বালায় বাপ বাপ করে উঠে আসতে হবে! বঙ্গোপসাগরের সামনের জল বোতল সবুজ কিন্তু এই সাগর যত দূরের গভীরতায় গিয়ে পৌছবে ক্রমেই তত নীলাভ হতে থাকবে। গভীর সমুদ্র তুঁতে গোলা জলের মতো নীল আর স্বচ্ছ! ভেতরে গভীর অন্ধকার।....

এই সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে 'হাতেম তাই' পুঁথির সেই পাহাড়প্রমাণ কাঁকড়াটার কথা মনে পড়েছিল যার কদ্ বা দাড়া দুটো ছিল নারকেল গাছের মতো—বড় বড় দুটো কুমীরকে যে টিকটিকির মতো ধরে নিয়ে চলে যায় সমুদ্রের নিচের পর্বতগুহার ভেতরে!

অত বড় কাঁকড়ার কথা থাক, ছোট ছোট সাগুদানার মতো মাটি তোলা ক্ষুদে কাঁকড়ার পেছনে দৌড়েই যখন পাগল হয়ে যাচ্ছি তখন বৃহৎ সাগরের দুই প্রান্তে দুটো পা দিয়ে ফেরেস্তা হতে চাইলে মধ্যযুগের অনন্ত অধিবাস ঠেকায় কে?

তবু বলি যাঁরা খুব মোটা লোক চলে যান সাগরদ্বীপে—কয়েকদিন খুব দাস্ত হলে স্বাস্থ্য ফিরে যাবে।

পৃথিবীর পাখিদের তীর্থশালা সুন্দরবন

সুন্দরবন অঞ্চলে অরণ্যজাত সম্পদ আছে বহুরকম। কাঠ, মধু, হোগলা, কাঠশোলা, গোলপাতা, হেতালপাতা, নারকেল, সুপারি, পশুপাখি, ডিম, মাছ, কচ্ছপ, কাঁকড়া, তাল, বাঁশ, ঘাস ইত্যাদি।

কুমির, বাঘ, হরিণ, শুকর, খরগোশ, বাঁদর, হনুমান, সাপ, ইঁদুর, কাঠবেড়ালী, খট্টাশ, শিয়াল, খ্যাঁকশিয়াল, ভাম বা উদ্‌বিড়াল, ভোঁদর, গোসাপ, মাছ, বাঘরোল প্রভৃতি ছাড়া প্রধান প্রাণী হ'ল পাখি।

জঙ্গল পাখির কলরবে ভরে থাকে।

নানারকমের হাঁস আছে সুন্দরবনে। কার্তিক মাসে হিম পড়তে আরম্ভ করলে দক্ষিণ মহাসাগর থেকে কেউটে সাপের মত ফণা তোলা লাল ঠোঁট বড় বড় কৃষ্ণমরাল আসে, জঙ্গলের ভেতর ঘাসের বনে ডিম পেড়ে বাচ্চা তুলে শীতকাল শেষ হলে দু'তিন মাসের বাচ্চাদের নিয়ে আবার চলে যায় দক্ষিণ মেরুসাগরের দিকে। মাছের লোভে ঠ্যাং আর ঠোঁট লম্বা সারসরা আসে সমুদ্রতীরবর্তী নানাদেশ আর নানা সরোবর থেকে। দুধের মত সাদা বড় আকারের কেদোচূড়া বক বসে থাকে তাল-নারকেল গাছের মাথাকে বেলফুলের মত বাহারী শোভা করে। ছোট সারস জাতীয় এই সাদা বক প্রচুর দেখা যায় বীরভূম মুর্শিদাবাদেও। ময়ূরাক্ষীর চরে এরা মাছ ধরে খায়। আবার উড়ে চলে যায় সুদূর কোনো জলাশয় অঞ্চলে; কচ্ছ, চিল্কা, মানস সরোবরে। আসে সুন্দরবনে। পাখিদের গোটা পৃথিবী জুড়ে গতিবিধি। কোন্ আবহাওয়ায় সাইবেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া, মেক্সিকোয় যাবে তা তারা ভালই জানে।

সারস, কেদোচূড়া, মানিকজোড়, শামুকখোল পাখিরা যখন ঝাঁকবন্দী হয়ে কক্ কক্ শব্দ তুলে আকাশ পাড়ি দিয়ে চলে তাদের লম্বা পা সরল রেখায় তোলা থাকে পিছনে—আর দীর্ঘ চঞ্চু থাকে এগিয়ে। চমৎকার দেখায় এদের। মাঝে মাঝে এরা ডানার ঝাপট মেরে ডানা গুটিয়ে নেয়, চিল বা শকুনের মত সবসময় ডানা বিস্তার করে সাগরের ওপরে ভাসতে পারে। দরকার হলে লম্বা ঠ্যাং নামিয়ে দেয় চরে। এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে মাছের গতিবিধি লক্ষ্য করে। একটা এক কেজি মাছ গিলে ফেলা কঠিন নয়। তপস্বী বক জলে শিকার ধরার জন্য একপায়ে চুপচুপ দাঁড়িয়ে থাকে—আর একটা পা মাঝে মাঝে নামিয়ে দিয়ে জলের ভেতর সঞ্চালিত করে মাছকে তাড়া করে। মাছ ছিটকে উঠলে ঠোকর মেরে ধরে নিয়ে ঝাঁকরে গিলে ফেলে।

মাছরাঙা সাধারণত তিনরকম দেখা যায়, লাল বড় ঠোঁট সবুজ গা, 'মেঘ হ্ মেঘ হ্' বলে যে চেঁচায়, বারাসাত এলাকার দক্ষিণ চাতরা, রায়পুর ইছামতী নদীর অববাহিকায় সাদা কালো মাছরাঙা আর ছোট এক জাতের সবজে রঙের মাছরাঙা। বক আছে; কেদোচূড়া, গোবক, সাদায় ছাই রঙে মেশানো মেছোবক বা কানাবক, আগুন রঙের বক। পেট সাদা কালো শরীর, হলদে ঠোঁট ডাহুক। সাপের মত মাথা তুলে থাকে পানকৌড়ি— যে ঝট করে জলে ডুবে গিয়ে অনেকক্ষণ মাছ খুঁজে বেড়ায়, আর একটু তাড়া পেলেই উড়ে পালায়। মানিকজোড় আর শামুকখোলও মাছ খাবার রাজা। মাঝারি বড় পাখি। একটা শামুকখোলের মাংস হয় এক মালসা। প্রবাদ আছে, মানিকজোড়ের একটাকে মারলে পরে সহজেই আর একটা পাখিকে মারা যায় কেননা সে জোড়ের সন্ধানে এসে পাগলপারা হয়ে ডেকে ডেকে ফেরে। শিকার পর্যন্ত ভুলে যায়।

সুন্দরবনের জলাশয় অঞ্চলে বা নদীতে হাজার হাজার নারকেলের মত ভাসে জললিপি আর বালিহাঁস। পাতিহাঁস আর পানপায়রা।

দুম্ করে একটা বন্দুক ছুঁড়লে হাজার হাজার পাখি উড়ে আকাশ ছেয়ে যায়—তারা জঙ্গলের সুঁদরি গরাণ, পেয়ারা বানি, গর্জন বানি, আল, হিজল, হাওয়াই, ঝাউ, করমচা, অর্জুন ইত্যাদি গাছের ঘন পাতার ঝোপে বসে পড়ে।

বন মোরগ আর মুরগির ডাক শোনা যায় অসংখ্য। গোখরো, করাতে, তেঁতুলে খরিশ, ব্যানাফুলি, উদয়নাগ, কাল কেউটে বা দাঁড়াশ সাপ মুরগির বাচ্চা খেতে এলে মোরগ মুরগিরা সুন্দরবনে ব্যূহ রচনা করে সাপকে আক্রমণ করে নখে-ঠোঁটে আঁচড়ে মেরে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে। বিড়াল বা বাঘের আকারের পাটকিলে রঙের কালচে ডোরাঅলা খট্টাশ ওৎ পাতলে মোরগগুলো উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসে চিৎকার করে। ধাড়িগুলি সাড়া করে কট্‌কট্ কটাস্। হাঁসগুলো বড় অসহায়। ডিম দেওয়া হাল্‌কা শরীর ক্রুদ্ধ মেজাজের হাঁস কামড়াতে এলেও তা এমন কিছু ক্ষতিকর নয়।

সাধারণ পুকুরে হাঁস তাড়া খেয়ে ডানা ঝটপটিয়ে জলের ওপর দিয়ে ছুটে পালায়। পাতিহাঁস বা বালিহাঁস উড়ে যায় বা ডুবে পালায়। পানপায়রা, জলপিপিও উড়ে পালায়। কিন্তু মুরগির বাচ্চার মত কালো কালো ডাহুক বাচ্চা কোনো কিছু দেখে ভয় পেলেই ডুবে পড়ে আর ওঠে গিয়ে অনেকটা দূরে। চাট্টি শুকনো বাঁশপাতা এনে বড় বড় কচুরী দামের ভেতর বা ঝোপের মধ্যে খয়রা রঙের ফট্‌কা দাগঅলা ডিম পাড়ে ডাহুক তিনটে চারটে করে। ডিমগুলো মুরগির ডিমের চেয়ে কিছু ছোট কিন্তু পাখির তুলনায় বড়। 'জঙ্গল ঝাঁট' দিয়ে অঞ্চলের মেয়েরা হাঁস-মুরগির 'আণ্ডা' (অণ্ড) সংগ্রহ করতে আসে। হাতে থাকে তাদের আগুনের মশাল আর চিমটি। দোয়েল, বুলবুল,

কোকিল, পাপিয়া, শালিক, গাঙশালিক, ছাতারে, বাবুই, স্যাকরা, হাঁড়িচাঁচা, প্যাঁচা, টুনটুনি, বাজ, শঙ্খচিল, কালো চিল, শকুন, কাক, চড়ুই, কাদাখোঁচা, বেনেবউ, পাতকোয়া, ঘুঘু, হরিয়াল, কাঠঠোকরা, নীলকণ্ঠ, বসন্তবৌরি, ফিঙে এসব পাখিও দেখা যায় সুন্দরবন এলাকায়—তবে বাবুই ছাড়া আর সব পাখিরা গ্রামের লোকালয়ের গাছপালায় বেশি থাকে।

চারপ্রহর রাতে চারবার 'ঝাল' দেয় প্যাঁচা, পাতকোয়া, ডাহুক। মাঝে মাঝে গহিন রাতে কানাবক ডাকে—কুব্ কুব্—কুব্ কুব্। নাম না জানা অজস্র অচেনা সামুদ্রিক পাখি আসে অতিথি হয়ে, আবার চলে যায়।

সুন্দরবনের শিকারীরা বেশিরভাগ পাখি শিকার করে। তবে হোগলা, হেতাল, শরখড়ির জঙ্গল ভেদ করে শালতি ঠেলে পাখি শিকার নিরাপদ নয়, সাপের ছোবল খাবার ভয় আছে সবসময়।

হাঁটুজলেও বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে মানুষের ওপরে। লাল-কালচে শরখড়ির জঙ্গলে গায়ের রঙ মিশিয়ে ওৎ পেতে থাকে বাঘ। আর ডাঙার ওপরে আছে ভয়ানক বিষাক্ত ফণী মনসা, হেতাল বা মরা সাপের কাঁটা। ঢুকলে একবার পা পচিয়ে দেবে। সুঁদরি গাছের গজাল আছে, ছুটোছুটি করে আহত পাখির খোঁজে যাওয়াও বিপজ্জনক। ইন্দ্রজালের মত বানিগাছের ঠেস্‌মূল থেকে যেসব চারা বেরোয় তাতে থাকে ধারালো শক্ত মোট কাঁটা। জমাট বাঁধা পাতার তলায় বেড় পাকিয়ে থাকতে পারে খল সাপ চন্দ্রবোড়া। যখন সে ছোবল হানবে কুঁচকে কুঁচকে পেছন হাঁটবে। আর হিস হিস করে শব্দ তুলবে। তবে যতক্ষণ না চোখে চোখে পড়ছে চুপচাপ পড়ে থাকবে।

হয়তো দেখতে পাবে বিরাট দাঁড়াশ বা পদ্মগোখরো মুখে করে একটা ডামা ইঁদুর বা রাজহাঁসের বাচ্চা ধরে নিয়ে সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছে সরু নদীর জল পার হয়ে।

বাঘ এলেই মানুষকে সাবধান করার জন্যে বাঁদর হনুমানগুলো গাছে গাছে ছুটোছুটি করবে। মুরগি-মোরগ হাঁস পাখি সব ডাকতে থাকবে। বাঘ মেঘের মত গর্জন তুললেই সব চুপচাপ। হঠাৎ পলিকাদা মাখা গর্দানে আট ইঞ্চি লোমঅলা কন্দমূল খাওয়া গতরভারী বুনো শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ছুটে বেরিয়ে পালাচ্ছে দেখেও যদি সামনে দাঁড়াও তো ধারালো দাঁতের হুড়ো মেরে উরু ফেড়ে ফেলবে। বাঘ এখন তাড়া করেছে, সরে দাঁড়াও মশায়............!

ঝড়বৃষ্টি এলে পাখিরা সব জোপে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। জঙ্গলে লুটোপুটি খায় তবু পাকখাওয়া আঁশঅলা গাছ বলে ডালপালা সহজে ভাঙে না। শতশত ঠেসমূলের জন্য এবং তাতে গাছ গজিয়ে যাওয়ার ফলে কোনো গাছই ওপড়ায় না। রোদ উঠলে বা রাত কেটে গেলে আবার লক্ষ লক্ষ পাখি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ে জলাশয়ে

ভেসে বেড়ায়।

ক্যানিং গোসাবার নিচে থেকে পাঠানখালি, মোল্লাখালি, ধনেখালি, ঝড়খালি, পাখিরালয়। বকখালি, মুড়িগঙ্গা থেকে হরিণভাঙা নদীর কোল পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় নানারকম পাখির কলরব। জঙ্গল আছে অথচ পাখি নেই এটা যেন হতেই পারে না। যেমন শহর আছে কাক নেই এটাও অসম্ভব।

কলকাতার চিড়িয়খানাতে যেমন নানা মরসুমে বহু পাখি দেশবিদেশ থেকে আসা যাওয়া করে তেমনি সুন্দরবনের জলাশয়গুলোতেও—তবে বড় বড় পাখিরাই বেশি যায় দূর দূরান্তে। একটা সারস বা কৃষ্ণমরাল পৃথিবীকে যতখানি দেখেছে বা জানে মানুষ ততখানি জানে না।

গ্রামের ষোলআনা মুসলমান সমাজ

গ্রামের মুসলমান পাড়াগুলোয় এক একটা আলাদা 'ষোলআনা' সমাজ আছে। তাদের এক একটা আলাদা ঈদ-গা। আলাদা মসজিদ। সব পাড়ায় যে মসজিদ আছে এমন নয়, তবে ঈদ-গা আছে। মোড়ল পাড়া, হালদার পাড়া, শেখ পাড়া, মল্লিক পাড়া, গায়েন পাড়া, মালি পাড়ার আলাদা ঈদ-গা। শরিয়তি বিধানে বলা হয়েছে, ঈদ-গাহে যত বেশি নামাজী জমায়েত হয় ততই নেকি বা পুণ্যের। কিন্তু বেশি লোকের জমাত নিয়ে চালাতে গেলে মুশকিল হয় আর তা দলে দলে ভেঙে যায়। তাছাড়া গরিব লোকের ছেলের বিয়ের সময় খানা খাওয়ানোর ঝক্কিও অনেক। আগে সমাজের 'রেইস' বা প্রধানের বা নিজের পাড়ার মোল্লার ছিল প্রচণ্ড প্রতাপ। বরের বাপকে ষোলআনার লোকদের খানা খাওয়াতেই হত। খুব নির্ধন হলে হাতে পায়ে ধরে মোল্লা রেইসকে সমাদরের সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে হত। তারা ঠিক করে দিত কনের বাপের সঙ্গে চল্লিশজন 'বইরেত' বা বরযাত্রী যাবার ওয়াদা করা থাকলে কোন বাড়ি থেকে কে যাবে। বোনাই, নানা, মামু, চাচা, ভাই, ভাইপো, ভাগ্নাদের ধরে তুমি যে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে চল্লিশজন পূরণ করবে সেটি হচ্ছে না। তাহলে মোল্লা সাহেব গ্যাঁট হয়ে রইল। পুরো ষোলআনার লোককে বড় ব্যাটার বেয়ের সময় যদি না খাওয়াতেও পারে তবে চার ব্যাটার কোনও একটার বেলায় খাওয়াতেই হবে। মেয়ের সাদির বেলায় জোর নেই। কেন না তাকে বরযাত্রীদের মেহমানদারী সামলোতে হয়। তবে যে পারে খাওয়াক। তবে হজরত আয়েষা সিদ্দিকার মতে 'দপ' বাজানো মঙ্গলজনক হলেও 'খ্যাওরা' বাজনা বা ঢোল চচ্চড়ির উদ্দাম বাজনা দক্ষিণ বাংলার মোল্লা মৌলবীদের মতে একেবারে অবৈধ, কুফরী কাজ। কিন্তু ইংরিজি বাজনা হলে আলাদা কথা, কেন না ব্যাণ্ড পার্টি মুসলমানদেরই বর কনের বাপ বড়লোক হলে সাত খুন মাফ।

চল্লিশ বছর আগে দেখেছি ষোলআনার তৈরি করে রাখা একখানা আচ্‌কান বা চাপ্‌কান, পাজামা, পাগড়ি পড়ে একের পর এক অনেকেই বিয়ে করতে গেছে। এমনকি বাপ যে পোশাক পরে সাদি করে এসেছিল বড় ব্যাটা লায়েক হবার পর সার্টিনের সেই বাদশাহী পোশাকে বর্ণাঢ্য হয়ে সাদি মোবারক সমাধা করে একটি ফরজ বা অবশ্য কর্তব্যের পুণ্য অর্জন করেছে। দেশে দেশে মুসলমানদের বংশ বৃদ্ধি করা একটা পবিত্র কাজ বলে তাদের মধ্যে কখনও কাউকে চিরকুমার থাকতে দেখা যায় না। প্রাপ্তবয়স্ক

চিরকুমার কোনও 'মাকড়ার' পেছনে কেউ নামাজ পড়ে না। পাড়ায় পাড়ায় মাঝে মাঝে সাল্লা বা সালিসি বসে। রেইসের বাড়িতে থাকে ডেগহাঁড়ি। তিনটে থেকে ছ'টা সাতটা। থাকে সপ, চাঁদোয়া, বর সাজানী পোশাক, মৃতের লাসবাহী খাট, গোলাপদানী, ছিলিম্চি, খাঞ্জা, বাসনকোসন, সতরঞ্চি ইত্যাদি। এগুলো ভাড়া খাটানোও হয়। গোরস্থানের কবর খেকে বাঁশ গজিয়ে ঝাড় হলে সেই চশমা এঁটে আঙুলে আর উড্পেনসিলের ডগায় থুথু লাগিয়ে হারকেনের আলোয় হিসেবের খাতার পাতা খুলে লিখতে থাকে সামনের শবেবরাতের সময় মিলাদ দেওয়া, মোল্লা পড়ানী, কবর জিয়ারত বাবদ কত খরচ হবে। ঈদ-গা বা কবরস্থান পবিত্র জায়গা, সেখানে বেড়া দেওয়া দরকার। কার বউ ঝাঁটা হাতে নিয়ে কবরস্থানে বাঁশ পাতা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায় সে কথা ওঠে। কলহ কাজিয়া হয়। জরিমানা দিতে হয়।

ছেলেবেলায় দেখেছি সালিসিঅলারা বেজায় রগচটা ব্যক্তি ছিল। বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হলে গরুর দড়ি দিয়ে 'মোড়স্বা' করে বেঁধে মাতাল বদমাসকে আচ্ছা করে গরু সোঁটানী করা হত। এখন কাউকে কিছু বললেই চলে যায় থানায়। অথবা পার্টির লোক হলে বিচার করতে চলে আসে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানবাবু। তার আট লাইনের বারোটা বানান ভুলের চিঠিই এখন বড় দারোগার কাছে সাংবিধানিক ব্রহ্মাস্ত্র। পার্টি রাখতে গিয়ে চোরের পক্ষেও ওকালতি করতে হয় প্রধানদের। এমনি এক গাঁয়ের মোড়ল পঞ্চায়েত সদস্যের বেআইনি অনুরোধে এক থানার বড় দারোগা পঞ্চায়েতের আইনকানুনের বই খুলে (ইংরেজিতে!) পড়ে শোনালেন তাঁদের কর্তব্য কি কি। মশা মারবেন, পানা সাফ করবেন, মাছ চাষ করাবেন, পায়খানা গড়ে দেবেন, চাষের উন্নতি ঘটাবেন, শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণ করবেন ইত্যাদি। কোথায় তাদের থানায় এসে মদতদারী করার হুকুম আছে বড়বাবু দেখাতে বললেন।

গাঁয়ের ভোটে জেতা মহামান্য সদস্য বললেন, 'মানুষের সব কল্যাণ কি চোতায় লেখা থাকে? আপনি থানার বড়বাবু; যাকে ইচ্ছে অ্যারেস্ট করতে পারেন কিন্তু প্রধান বা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের পাকড়াও করুন দেখি।

সেই দারোগার আপাদমস্তক গরম হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

মেয়ের বিয়ের সময় এখন আর ষোলআনার লোককে ডেকে চা পান দিয়ে করজোড়ে কিছু বলতে হয় না। মেয়ে বিদায় যাতে হয়ে যায় যাক। তবে তালাক বা গণ্ডগোল কিছু ঘটলে তখন গ্রামস্থ ষোলআনাকে ডাকলে কেউ আসবে না।

গ্রাম সমাজে যাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা নেই, বেশি পরিমাণে বেকার সেইসব লুঙ্গি ওলটানো হিন্দি সিনেমা নায়কমার্কা তরুণ ছোকরারাই সংখ্যায় থানায় এখন ধরপাকড় হয়ে আসে বেশি।

গ্রামের সেই মুসলমান সমাজও প্রায় ভেঙে গেছে। এখন সবাই রাজা। দুটো ঈদে কেবল জমা হতে হয় ঈদ-গাহে। তাই কারো একটু দেরি হলে চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। এমন সুখশ্রাব্য বাক্য উচ্চারিত হয়ে যাতে অজু থাকার কথা নয়। একঘন্টা একশোজন গ্রাম্য মুসলমানকে আল্লার কাজে এখন বসিয়ে রাখা দায়। তারা যেন কত মহৎ কাজ বাড়িতে বা মোড়ের আড্ডায় ফেলে রেখে এসেছে।

আমরা সাতশো বা হাজার বছরের মুসলমান হলেও এখনও সঠিকভাবে অজু করতে জানি না। নামাজ পড়ার সঠিক বৈঠকগুলিও রপ্ত করতে শিখিনি। দু-রাকাত নামাজ আদায় হবার পরই খোৎবা পড়ার সময় কথাবার্তা বা হাসাহাসি শুরু হয়ে যায়। বুড়ো মোল্লা বা ইমাম কেতাব ধরে কাঁপতে কাঁপতে (আল্লার ভয়ে?) কি পড়ে যান কেউ বোঝে না। নতুন তরুণ ইমাম হলে বাংলায় ব্যাখ্যা করে দেন। আর মোনাজাত বা প্রার্থনা করেন প্রায় রোরুদ্যমান হয়ে।

ঈদ-গায় এখন পুলিশ রাখতে হয়। বাইরের লোকদের ঝামেলার ভয়ে যতখানি নয় তার চেয়ে বেশি নিজেদের ভেতরের দলাদলির জন্য।

ইসলাম অর্থে শান্তি। শান্তির ধারক ও বাহকরা এখন পরস্পরের কলহে মত্ত। তারাই বেশি লোক এখন নাকি কোর্ট কাছারি আর থানাকে রেখেছে।

দুই পাকিস্তানের একদা মালিক আইয়ুব খাঁ বলেছিলেন, 'বাঙালি মুসলমানরা সঠিক মুসলমান নয়।'

কথাটা সত্য। কারণ পশ্চিমী মুসলমানেরা যেমন বিনয়ী, ভদ্র, সত্যভাষী, ইমানদার, পরোপকারী হন তেমন আমরা নই। যেসব অসমুলমান শ্রীনগর, লাহোর, দিল্লি, লখনৌ গেছেন, সম্ভ্রান্ত ভদ্র মুসলমানদের দেখেছেন তাঁরাও স্বীকার করেন আমাদের সঙ্গে পশ্চিমী মুসলমানদের কতখানি তফাৎ।

তবে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের আচার-আচরণে তফাৎ আছে। এর মূলে আছে অর্থনৈতিক সঙ্কট। অশিক্ষা। উত্তরবঙ্গের একটি মুসলিম বাড়িতে তিন চার ভাইবোনে সবাই এম এ পাশ কিংবা অন্তত বি এ। তাদের আনারস, আম বা চা বাগান আছে। আছে তামাক ক্ষেত। পাট ক্ষেত, ধান চাষ।

বিত্তহীন দক্ষিণবাংলার নিম্নশ্রেণী উদ্ভূত মুসলমানরা আজ অত্যন্ত গরিব হলেও তপসিলী, উপজাতীয় বা আদিবাসীদের মতো কোনও সাহায্য পায় না। কেন না মুসলমানরা যে সবাই সমান। সৈয়দ আর গায়েন, হালদার, মোড়ল, শেখ সব একাকার কিন্তু কার্যত কি তাই? আশরাফ আতরাফ নেই?

তিনশো বছর আগে একজন গরিব মুসলমানকে খুঁজে পাওয়া যেত না এটা ইতিহাসের কথা। আর এখন রাস্তায় ঘাটে দরিদ্র ভিখারি মুসলমানদের ভিড়। মুখে

তারা আল্লা আল্লা করলেও শয়তান তাদের উপাস্য হয়েছে।

ক্যানিং, গোসাবা, লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার, বজবজ থেকে যেসব তাড়ি আর মদ আনে তারা কারা?

গ্রামের রেইস হাজার টাকা ধার দিলে কোন এক মল্লিক মসজিদে হাত দিয়ে বা কোরআন শরীফ মাথায় করে 'দিয়ে দিইচি' বলতে যখন ভয় পায় না তখন ধর্মের দ্বারা তাদের নৈতিক চরিত্র শোধনের উপায় আছে কি?

তবু আমাদের কেউ মরে গেলে, কারও বিয়ে হলে, ঈদ-গায় নামাজা পড়াতে হলে এখনও মোল্লা মৌলবীর দরকার। তাই গ্রাম সমাজও আছে। আর ষোলোআনার ডেগ হাঁড়িতে এখনও মাংস রান্না হয়। সপ পেতে বাসন নিয়ে খানা খেতে বসে মুসলমানরা। তবে কনের বাপকে ছাঁদনাতলার খরচ দিত বরের বাপ, এখন আর নয়, উলটে বি এস সি জামাই আনতে নগদ টাকায় পণ আর সোনাদানা, দান দেহাজ দিতে হচ্ছে এটাই যা দুঃখের।

মোচা চিংড়ি বেচলেই এখন মোটা টাকা

বর্ষায় মোচা চিংড়ি চাষের জন্য অনেক জমিতে ধানচাষ উঠে যাচ্ছে সুন্দরবন এলাকায়। নোনা জমিতে আমন চাষে বিঘে প্রতি মাত্র ছ' মণ ধান হয়। বোরো চাষে প্রচুর খরচ আর চোত-বোশেখে জল থাকে না, তাই বর্ষায় চিংড়ি চাষের হিড়িক লেগে গেছে। যারা ভূমিহীন বর্গাদার ভাগচাষী ছিল, তেভাগা আইন পাশ হলেও আধা আধি ধান খড়ের বখরায় মাত্র এক বছর করে জমি চষতে পাচ্ছিল মালিকদের কাছ থেকে। পরপর একই জমি এক জনকে তিন বছর চষতে দিলে জোত দাঁড়িয়ে যায়—বর্গাদার দখলী স্বত্ব দাঁড় করিয়ে নেয়—তাই বছর কাবারি ব্যবস্থা। লেখাপড়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। মুখে মুখে। যতই সৎলোক হও একই জমি দু-তিন বছর এক লোকে চাষ করতে পারে না। না পেলেও জমির বাবুরা তবু কিছু কিছু জমি নিজে ট্রাকটর বা হাল লাঙল দিয়ে চষিয়ে জল খরচ করে চাষ আবাদ চালায়। বাকি কিছু জমি ভাগ চাষে থাকে। যেসব জমি খারাপ, নিচু, জলে ডুবে যায়—যার মেরামতির জন্য মালিক পক্ষ কোনোরকম খরচ-খরচা করে না সে সব জমিও এখন হাতছাড়া হয়ে গেছে। ভাগে আর জমি মেলে না। কারণ ব্যাপকভাবে মোচা চিংড়ির চাষ লেগে গেছে চারদিকে।

এক লপ্তে তিন বিঘে জমিতে যদি মোচা চিংড়ির চাষ করা যায় তো দু'তিন মরসুমেই বড়লোক। মাছ ভাল হলে লাখ টাকার উপায়। কি হবে ধান চাষ করে?

আষাঢ়ে বর্ষা শুরু হলে নদীর নোনা জলে মাছের ডিম থেকে সবেমাত্র বার হওয়া 'ম্যাতা' খালবিল থেকে মেয়েরা কাপড় টেনে 'ছ্যানা' বা 'ছাক্না' দিয়ে হাঁড়িতে সামান্য জল দিয়ে ধরে এনে দেয়। তার মধ্যে থাকে নোনা জলের সবরকম মাছ। ভেক্‌টি (ভেকুট), ভাঙন, পারশে, গল্‌দা চিংড়ি, পাটি চিংড়ি, বান, নোনা ট্যাংরা, মাগুরে ট্যাংরা, চেলা, পুঁটি, বেলে, চেঙো। এসব ম্যাতা যখন কোনো পুকুরে ফেলে কিছুটা বড় হয়ে যায় জাল দিয়ে কেবল মোচা চিংড়িগুলো ধরে বাছাই করে নিয়ে ফেলা হয় চিংড়ি চাষের ঘেরির মধ্যে। লক্ষ্য রাখতে হয় রাত্রে 'গাহাড়গেল' বা গোসাপ, ভোঁদড় বা শিয়ালে মাছ না খেয়ে নেয়। শীতকালে মোচা চিংড়িরা জলের ধারে এসে অর্ধেক শরীর ডাঙায় তুলে আধমরার মতো পড়ে থাকে আর শিয়ালরা তাদের ম্যাচ ম্যাচ করে ধরে খেয়ে পেট বোঝাই করে। শিয়ালরা কাঁকড়ার গর্তের মধ্যে লেজ ঢুকিয়ে দিয়ে যখন কাঁকড়া চিপ্‌টে ধরে দাঁড়া দিয়ে তখন তাদের টান মেরে তুলে মড়মড় করে চিবিয়ে খায়। শীতকাতর গলদা চিংড়িদের শত্রু কাঁকড়াও।

কেঁচো বা পিঁপড়ের ডিম গেঁথে লম্বাটে বঁড়শি দিয়ে মোচা চিংড়ি ধরে নেওয়া যায়। মোচা চিংড়ি টোপ দেখলে প্রথমে দুটো দাঁড়া দিয়ে ডোর ধরে। তারপর টেনে টেনে পিছন হটে। অন্য পাগুলো দিয়ে টোপটাকে আনে মাথার খোলসের নিচেকার মুখের ওপরে।

তখন ছিপ তুলতে হয় খুব আস্তে আস্তে। মোচা চিংড়ি ধরে ধরে উঠে আসতে গিয়ে হঠাৎ ঝট্‌কা মারে আর গেঁথে যায়। তবে কাঁটা লেগে ঘায়েল হয়ে একবার ছেড়ে গেলে সে মাছ আর সেদিন সহজে টোপ ছোঁয় না। মোচা চিংড়ির খেলাও চমৎকার। দৃষ্টি চলার মতো স্বচ্ছ হাত দেড়েক জলের নিচে পিঁপড়ের ডিম ছড়িয়ে পড়লে মোচা চিংড়িরা যখন এসে জড়ো হয় তখন যদি পুঁটি, বেলে, কই, ট্যাংরা, চুনো মাছ আসে তবে সামনের করাত বাগিয়ে তীর বেগে তাড়া করে আবার পিছু হটে এসে খাদ্যের কাছে বসে।

শাল, শোল, ল্যাটা. চ্যাং, তেলাপিয়া, এরা যখন ঝাঁক ছাড়ে মা-বাবা বাচ্চা যতদিন সাবালক না হয় ততদিন চরাট খাইয়ে সঙ্গে থাকে আর শত্রু নিপাত করে কিন্তু কাঁটাঅলা কই, মাগুর, শিঙি, ট্যাংরা মাছ ডিম ছেড়েই খালাস—এদের বাচ্চাদের সাপ ব্যাঙ ধরে খায় না। খেলেই মরণ হবে। বর্ষার সময় এরা অবাধে বেয়ে চলে।

প্রবাদ আছে, 'কই মাছ তালগাছ বায়'—শুকনো আড়ায় যেখান দিয়ে বেয়ে বেয়ে যায় এদের ডিম পড়ে পড়ে যায় আর অনেকদিন বৃষ্টি না হলেও তা মরে না। বৃষ্টিতে ধুয়ে স্রোতে নেমে এলে চারদিকের ডোবার জলে বাচ্চা ফোটে। মানুষ বাড়ার ফলে খানাডোবায় আর পুরোনা মাছ থাকে না—পাঁক ঘেঁটেও মানুষ মাছ ধরে নেয়—গর্তের মধ্যে দৈবাৎ ক্রমে যেসব কই-মাগুর শিঙি-ট্যাংরা প্রাণ বাঁচাতে পারে আমাদের মতো বুভুক্ষু মানুষের দেশে তারাই কোনোরকমে বংশ রক্ষা করে চলেছে। তার ওপর আবার ধান চাষের পোকা মারার অথবা ধানক্ষেত মাড়িয়ে লুকিয়ে মাছ ধরার জন্য চাষীরা ফলিডল বা এনড্রিন প্রয়োগের ফলে মাছের বংশও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আগে দেখা যেত সুন্দরবন এলাকার একশো মাইল এলাকায় খানাডোবায় বর্ষাকালে কই মাছ ভাত ফুটত।

গলদা চিংড়ি চাষের ব্যাপকতার ফলে অন্য মাছের ওপরে মানুষের লোভ কমে যাচ্ছে। একমাত্র পোনা মাছ ফেলা হয় পুকুরে। তার মধ্যেও গলদা চিংড়ি ঢালা হয়। কারণ এক কেজি গলদা চিংড়ি পঞ্চাশ টাকা। মুণ্ডুহীন করে নিলে ৭০/৭৫ টাকা কেজি। এসব মাছ জাহাজে করে বিদেশে চলে যায়। তাই মোচা চিংড়ি বাজার থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছে। চিংড়ির মেছো ঘেরি ছাড়াও বাঁধে বাঁধে যেখানে আটল ঝাঁঝরি বসানো হয় পাইকেররা রোজ ভোরবেলায় গিয়ে হাজির হয়। তারা মাথা কাটা মোচা

চিংড়ি ব্যাগ ভরে সংগ্রহ করে নিয়ে ছোটে সকালে ট্রেনে বা বাসে—কলকাতায়। মাছের আড়তে এসে মেলা দামে দিয়ে গিয়ে বিকেল বা মাঝরাতটা পর্যন্ত বিশ্রাম নেয়। মাঝরাতের পর মোচা চিংড়ির খোঁজে বের হয়।

টনকে টন এত মোচা চিংড়ি যায় কোথা? জাপান নাকি সবচেয়ে বড় খদ্দের?

কিন্তু মাছ উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে জাপানের স্থান প্রথম—ভারত আছে পাঁচ নম্বরে—তাহলে জাপান চিংড়ি মাছ নিয়ে কি ব্যবসা করছে পৃথিবীর বাজারে?

চিংড়ি নরম হয়ে গেলে ভেতরে কাঠি গুঁজে দেয় চতুর ব্যবসায়ীরা। তাও ধরে ফেলে আড়তদাররা। পচা মাছ হলে ফেলে দেয়। দোরাস লোকসান। তাই বরফ ব্যবহার করতেই হয়।

কেবলমাত্র মোচা চিংড়ির মুণ্ডু বিক্রি হয় হতভাগা বাঙালি মৎসজীবীদের জন্য। আগে গোটা মোটা চিংড়ির মাথার খোলসের ভেতরে তর্জনী আঙুল গলিয়ে দিয়ে জমিদারবাবুরা যে ঘি খেতেন সে ঘি এখন ধড়মুণ্ডু আলাদা করার জন্য মাঠে মারা যাচ্ছে।

মোচা চিংড়ি চাষের জন্য সুন্দরবন এলাকার ধান জমি নিয়ে জমির মালিক আর বর্গাদার চাষীদের মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে। সরকার ভাগচাষীদের পক্ষে মদত দিচ্ছে—মোচা চিংড়ি ধানক্ষেতে উৎপন্ন করা চলবে না। ধান জমি চাষ করতে হবে।

জমির মালিকরা বলছে, 'আমার জমিতে আমি যা চাষ করি করব, তুমি খবরদারী করবার কে হ্যা?

একজন মোচা চিংড়ি ব্যাপারী গাঁজা টেনে বেশ জমপেশ একটু নেশা হতে বলল, 'একদিন ভোররাত্রে স্বর্গের দেবতাদের জন্য রাজা ইন্দ্রদেব নাকি স্বয়ং মোচা চিংড়ির জন্য এসে হাজির—পাবে কোথা?

আমরা তখন ট্রেনে করে নিয়ে চলেছি কলকাতায়। জাপানে জাহাজ চলেছে মোচা চিংড়ির। মেছো ঘেড়ির মালিকরা এখন মোচা চিংড়ি বেচে মোটা হাতী হয়ে গেল।

কাঁচা চামড়ার বিশাল জগৎ ভারত

মানুষ ছাড়া প্রায় সমস্ত রকমের জীবজন্তুর চামড়া কাজে লাগে। সাপ গোসাপের চামড়া ছাড়াতে দেখেছি সাপুড়েদের। ফিয়ার্স লেনে যেখানে চামড়ার জাবনাদারদের ঘাঁটি সেখানে বিক্রি করে আসার পর ব্যাগ, জুতোর নক্শার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নেউল বা বেজি অথবা খ্যাঁক শিয়ালের লোমশ চামড়া থেকে সুন্দর ঘড়ির বেল্ট তৈরি হয়। সরকারের উচ্চ পদস্থ অফিসার অজিত গড়াই মশায় রাইটার্স বিল্ডিংসয়ে তাঁর দপ্তরে বসে একদিন বলছিলেন, "বাণিজ্যিক পরিভাষায় "ব্ল্যাক বেঙ্গল" বলে পশ্চিমবাংলার যে অংশগুলোকে, সেখানের কসাইরাই মাত্র একবছর দেড় বছর বা দু-বছরের খাসি পাঁঠা-ছাগল কাটে—এই চামড়া রাশিয়া, জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ইটালি, সুইডেন, নরওয়ে, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের মহিলাদের পোশাক, জুতো বা ব্যাগের জন্য ভীষণ চাহিদা। কয়েক লক্ষ বিদেশী মুদ্রা আসে এ থেকে। গ্রামের গরিব মানুষদের ছাগল পালার জন্য সরকারি ঋণ দেওয়া যেতে পারে।"

নিম্নবিত্ত মানুষরা গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধান বা সদস্যদের পার্টিভুক্ত বা মনোনীত ব্যক্তি হলে ছাগল পোষার জন্যে টাকা পেয়েছেও এবং সে ছাগল পেটেও চলে গেছে অনেকের। ঋণ আর শোধ দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

অজিতবাবুকে বলেছিলাম, "আপনি তো মশায় লাভের দিকটাই দেখছেন, ছাগলের উৎপাত বিশেষ করে সরকারি ছাগলের (যার পাছায় ব্যাঙ্কের সীল থাকবে?) অত্যাচারে মানুষের ফসল নষ্ট হবে না? তাছাড়া খাসির মাংসের দিনদিন এত দাম বাড়ছে যে ঋণ না দিলেও গরিব মানুষরা এমননিতেই ছাগল পুষবে। ছ-মাস ছাড়া দুটো চারটে করে বাচ্চা হয় ছাগলের। ছাগল পালতেও নেয় কেউ কেউ। বাচ্চা হলে সেগুলো নিয়ে আবার গাবিন করে মালিককে ফেরত দিতে হয়"।

যাহোক, ছাগলের চামড়ার চাহিদা দেশেও কম নেই। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাড়া অন্যত্র বিশেষ করে বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশের লোকরা নাকি একটু বেশি 'বক্‌রি-প্রিয়'—(গুজরাটের মানুষ গান্ধীজী মহামানব তুল্য বক্‌রি-প্রিয় ছিলেন) তাঁরা বড় হোমরা চোমরা চেহারার ছাগল খাসি না হলে কাটে না।

চিকাগোর অটোমেটিক স্লটার হাউসের গিলোটিনে একদা একজন কর্মী বুট হ্যাট কোট সমেত চলে যায় আর তার মাংস হোটেলে আসে। এক সাহেবের খেতে গিয়ে সন্দেহ হয়। একটি টুকরো কাগজে মুড়ে নিয়ে গোপনে তিনি বাড়িতে এনে পরীক্ষা

করে জানতে পারেন সেটি মানুষের মাংস। এই নিয়ে লেখা হয় উপন্যাস। খবরের কাগজেও স্লটার হাউসের এই ঘটনার নাকি সংবাদ ছিল কোনও একদিনের পাতায় একটুখানি। মার্কিন সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু লেখক বিখ্যাত হয়ে যান। তাঁকে এটা ফিক্‌শান বা 'বানানো ঘটনা' বলতে বলা হলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

কি আমরা হোটেলে খাচ্ছি তা সঠিক করে বলা কঠিন। ভাল চিকেন স্টু হয় নাকি ব্যাঙের। আর ডালডার ভেতরে খাঁটি গরু-মোষের চর্বিই থাকে বলে এতদিন দেখেছি এবং জানতাম, হঠাৎ শোনা গেল, ময়াল সাপের চর্বিই নাকি ডালডার বেশি অংশ। কিন্তু কথাটা মনে হয় ঠিক নয়। কারণ একটা ময়ালের দাম অনেক। আর তা সহজ প্রাপ্যও নয়। যেমন বলা হয় সরষের তেলে শিয়ালকাঁটার বীজ ভেজাল দেওয়া হয়। জনৈক তেল-মালিক বলেন, "পাগল নাকি! এক কেজি সরষের দাম সাড়ে তিন টাকা আর এক কেজি শিয়াল কাঁটার বীজ সংগ্রহ করতে কমপক্ষে ষোল টাকা মজুরি পড়বে।"

"করোমচার তেল ভেজাল দেওয়া হয় কিনা"—শুধোতে তিনি অবশ্য বলেছিলেন, "সেটা কারা করে আমরা জানি না।"

"করোমচার বীজ চোত-বোশেখ মাসে মাত্র পঁচাত্তর পয়সায় বিক্রি হয় দেখেছি, এর তেল কি কাজে লাগে?

"জ্বালানি হতে পারে, চামড়া তৈরির কাজে লাগে।"

হাড়, মাংস, চর্বি, চামড়া, চুল বা লোম ইত্যাদির প্রত্যেকটির বিশ্বজোড়া এক একটি বাজার আছে এবং তা বহু ব্যাপকও। খাসির চামড়ার জুতো, জামা, ব্যাগ, সুটকেস, বল, বেল্ট নানান কিছু হয়।

তেমনি গরুর চামড়ার ব্যবহার হয় আরও বহু ব্যাপক কাজে। বিশ্বজোড়া এর বাজার। ভারত গরুর চামড়ার ব্যবসায় বিরাট একটি দেশ। পৃথিবীতে যত গরু আছে তার আটভাগের সাতভাগ আছে ভারতে। সংখ্যা তার ৪০ কোটিরও ওপরে। কিন্তু গরুর মাংস খাওয়ার লোক এখানে মাত্র পনেরো থেকে বিশকোটি। কাজেই গোধন নষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

এদিকে গরুর চামড়া না পেলে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। মেশিন-পাটে বহু চামড়া লাগে। জুতো কারখানাগুলো ডকে উঠবে। কলকাতার চার নম্বর ব্রিজের কাছের পাঞ্জাবী হিন্দু ট্যানাররা ভিখারী হয়ে যাবে। ফিয়ার্স লেনের বহু মুসলমান আর চীনা জাবনাদারদের হাঁড়ি চড়বে না।

গরুর চামড়া সংগ্রহ করবার কাজে শুধু যে মুসলমানরাই লেগে আছেন এমন নয়। বাটানগরের প্রাক্তন কংগ্রেসী এম এল এ ভূপেন্দ্রনাথ বিজলীর ভাই নৃপেন্দ্রনাথ বিজলীও একজন চামড়া সংগ্রহকারী। তাঁর লোকরা নানান কসাইখানা থেকে কাঁচা চামড়া

সংগ্রহ করে ট্যানার পটিতে পাঠান। তারজন্য তাঁকে নাকি সনাতন হিন্দুদের পাল্লায় পড়ে প্রথম দিকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি টিকে গেছেন। এটা নাকি তাঁর ব্যবসা। তিনি তো আর গরু খাচ্ছেন না বা মাংসের ব্যবসাও করছেন না।

গরুর চামড়ার জুতো পরা কি আজ কোনও ভদ্র-সন্তান ত্যাগ করতে পারবেন? প্রথমে এই পবিত্র খড়মের দেশে মুসলমানরাই চামড়ার জুতোর আমদানি করেন। আরবের লোকরা প্রথম দিকে শুধুমাত্র শুকতলাঅলা উটের চামড়ার জুতো পরতেন দড়িবাঁধা অবস্থায়। পরে তাঁরা গ্রীসদেশের জুতোর অনুকরণ করেন। আফগানদের দেড় কেজি ওজনের চপ্পলের মতো ভারি জুতো ক্রমে নক্শাদার সেলিমশাহী জুতোয় পরিণত হয়। হয় নাগরা জুতো। বেহারী হিন্দুদের জল-চল নয় এমন একশ্রেণীর লোকরা জুতো তৈরি কাজে যোগদান করে। যদ্দিন মুসলমান শাসকরা ছিলেন সেইসব মুচিদের গায়ে হাত তোলা যায়নি। দেশ ইংরেজদের হাতে চলে যেতে মুচিরা মাঝে মাঝে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে নিগৃহীত হয়েছে। তবে তারজন্যে কড়া শাস্তিও হয়েছে। বর্ণহিন্দুদের মতলব জুতো তৈরি না হলেই বোধহয় গরু কাটা বন্ধ হয়ে যাবে। গান্ধীজীর দয়ার মুচিরা হরিজন হলেও স্বাধীন ভারতের সিংহাসনে আরূঢ় বর্ণহিন্দুরা তাদের মেরে কেটে উড়িয়ে দিচ্ছেন। সংখ্যালঘুদের ভালাই সম্পর্কে আমার এক প্রশ্নের উত্তরে বিগত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংখ্যালঘুদের কথা তিনমিনিট আশাব্যাঞ্জক কথা বলার পর চার মিনিট হরিজন দুর্দশার জন্য অশ্রুপাত করেন। তারা নাকি স্বপ্রদেশেই এম এ পড়ার জন্য বর্ণহিন্দু ছেলের পাশে বসতে পারে না—অন্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হতে হয়।

গরুর চামড়ার ব্যাগ, জুতো, বেল্ট, বল, খেলনা, বাক্স, বেড-কভার ইত্যাদিতে আজ তো যে কোনও ভদ্র হিন্দু বিত্তশালী পরিবারের সংসার ভরা—তাঁরা কি তা ত্যাগ করতে পারবেন?

মোষের চামড়াও জুতোর হিল তৈরি করা হয়। মোটা শক্ত ফিতে তৈরি হয়। হরিণের মতো ঢলঢল-চক্ষু মায়াময় চেহারার জীবের চামড়া থেকে যে সুন্দর জুতো তৈরি হয় তা তো কত মানবতাবাদ সুদর্শন ব্রাহ্মণ ব্যক্তির পদশোভা করতে দেখেছি।

গরুর চামড়ার মশকে ভরা ভিস্তিঅলার পানি চলে যায় কত হোটেলে বাড়িতে। চামড়ার মশকে ভেসে বাদশা হুমায়ুন প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। অহোদরে যুদ্ধে হজরত মোহম্মদ (দঃ) যখন আক্রান্ত হয়েছিলেন আহতদের শিবিরে পানি বইতে মশক ফেলে দিয়ে ভিস্তিঅলা যে মহিলাটি প্রাণপণ যুদ্ধ করে শহিদ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নাম হজরত উম্মেআমারা।

মরুভূমির দূরপথে মশকের ভেতরে করে দূরের কূপ থেকে পানি বওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

অতএব জুতো কারখানাও চলবে, হরিজন মুচিরাও থাকবে, দু-বছরের কচি খাসিও কাটা হবে। কেন না তা থেকে বিদেশী টাকা আসে, রাশিয়া এখন ভারতের তৈরি জুতো কিনছে মেলা টাকা দাম দিয়ে। অন্য প্রদেশগুলো থেকে গরু জবাই বন্ধ করার আইন তুলে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত নইলে গোধন রক্ষা করা কঠিন হবে—বিদেশে চোরাপথে তার পঙ্গপাল চলে যাচ্ছে। সেজন্য কাঁচা চামড়ার বাজারও তারা দখল করবে। ধর্মের গোঁড়ামির জন্যই আমরা ফতুর হয়ে যাব।

কাশিবাটী গ্রামে ঘরে ঘরে ব্রাশ তুলি তৈরি হচ্ছে

জাড়ের চোটে মানুষ কোঁ কোঁ করতে করতে গায়ের ওপর শুকনো ঘাসপাতা, গাছের ছাল, পশুর চামড়া চাপা দিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমে তার বুদ্ধি গজালো, তুলো থেকে সুতো তৈরি করে কাপড় বুনল, পশুর লোম থেকেও বানালো মোটা মজবুত কম্বল চাদর। গরম দেশের লোকরা বানালো ঠাণ্ডা সিল্কের কাপড়। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা বিনিময় করলো এক দেশের লোক আর এক দেশের কাপড়-চোপড়, অস্ত্রপাতি, জিনিসপত্তর।

গাছপালা আর পশুপ্রাণীই আগাগোড়া সব কিছু দিয়ে মানুষকে বাঁচার সুযোগ করে দিয়েছে। পশুর মাংস খেয়ে তার চামড়া পরে বা গায়ে দিয়ে বা জুতো করে, তার হাড় দিয়ে যুদ্ধ করে অথবা চওড়া হাড়ে কাব্যকাহিনী ধর্মকথা লিখে, আসবাব করে, হাড় গুঁড়িয়ে সার করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, চুল বা লোম যে বাদ যাচ্ছে না তা ২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানার কাশীবাটী গ্রামে এলে দেখতে পাবেন। নানান রকম ব্রাশ তৈরি হচ্ছে গোটা গ্রামের ঘরে ঘরে। বাঁশ, নারকেল, সুপারি, আম, জাম গাছে আচ্ছাদিত সবুজ গাঁয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মানুষের ঘর, পাকাবাড়ি, কাঁচাবাড়ি, বাগান, সবজি বা ফলের চাষ — ধানের মাঠ — দোকানে হাটে বাজারে চলেছে মানুষ—রিক্‌শ ভ্যানে বা টেম্পোতে অথবা সাইকেলে ব্যাগভরা ব্রাশ চলেছে শহর কলকাতার উদ্দেশ্যে—বাসে মোট তুলে দেওয়া হবে। যাদের বড় ধরণের ব্যবসা — বাটা সু কোম্পানিতে বা জাহাজে মাল সাপ্লাই দিতে হয়, সেইসব মহাজনরা লরি ভর্তি মাল চালান করেন সপ্তায় একবার অথবা দু'বার মহাজন দাদন খাটাচ্ছেন। সমবায় গড়ে উঠেছে। কুটির শিল্প হিসাবে সরকার ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দিচ্ছে।

মানুষের বাড়ি বাড়ি দরজায় দরজায় বহু মানুষ খাটছে। আম কাঠ আসছে কাঠের আড়ত থেকে। কাঠের দামও বাড়ছে দিনকে দিন হু হু করে। এক কিউবিক কাঠ থেকে ক'টা কোন মাপের ব্রাশের ছাউনি হবে মিস্ত্রি হিসেব করে কেটে দেয়। গ্রামে ইলেকট্রিক এসে পড়াতে বোর করার মেশিন বসেছে—গরিব ঘরে যারা এখনও ইলেকট্রিক নিতে পারেনি তারা কাঠ বোর করে আনে বাখরা হাট থেকে। মেশিনেই আজকাল কাঠ চেঁছে সাইজ করে নেওয়া হচ্ছে। মেয়েরা লোমের গুছি বাঁধছে, গুছিগুলো কেউ বা কাঠের ছেঁদার মধ্যে পরিয়ে দিচ্ছে। কেউ তার দিয়ে আঁটছে। নানান কাজ ব্রাশ তৈরি করতে গেলে। নানান হাতে ফিরছে।

বাখরা হাটে বি. এ. পাশ আধুনিক একটি ছেলে ব্রাশের ব্যবসা ফেঁদেছেন, জনা পনের লোক খাটছে, মেশিন চলেছে। তার সঙ্গে কথাবার্তায় জানা গেল, পশুর লোমই শুধু নয় ওড়িশা থেকে ইমিটেশন ফ্যাব্রিকও আসছে, লোমের মতোই কৃত্রিম জিনিস আসছে।

কাশিবাটী গ্রামের ভেতরে এক বাড়ির দরজায় বসতে মালিক মহাদেববাবু বললেন, 'আগে এই ব্রাশের ব্যবসা ছিল দু'চার ঘর মাত্র। তারপর কর্মীরা কাজ শিখে নিজে নিজে ব্যবসা করে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে'।

'কত রকমের ব্রাশ হয়?'

'এর কি শেষ আছে? যে রকম অর্ডার পাই করে দিই। জুতোর ব্রাশ, গরম কাপড় ঝাড়ার ব্রাশ, চুল আঁচড়ানোর ব্রাশ, প্রেসের মেশিন পরিষ্কার করা ব্রাশ, জাহাজে রঙ করার ব্রাশ, রাস্তায় আঁচড় টানা ব্রাশ। নানান রকমের তুলি-ব্রাশ'।

'এগুলো তো ছাগলের লোম, তো ধুচ্ছে কেন?'

'ঐতো! গুছি ধরে গামলায় ধুয়ে আবার শুকোতে হবে—নুন ভর্তি! রাজাবাজার থেকে 'বক্‌রির' লোম কিনে আনতে হয়। কসাইদের কাছ থেকে চামড়া কিনে এনে 'জাবনাদার'রা নুন দিয়ে ট্যানিং করার সময় লোম তুলে ফেলে দেয়। আগে এই সব লোম গাদা করে ফেলে দিত। এখন কেজি দরে বিক্রি হয়। নুনে ভর্তি। আনতে গিয়ে গা-হাত করকরে হয়ে যায়। মাথায় তুলে আনলে টাক পড়ে যাবে। —ব্যবসায় আর শান্তি নেই বাবু। ছ'জন লোক নিয়ে কাজ করলেই এখন ইউনিয়ন। পার্টি। আন্দোলন। রোজের দাম বাড়াও। বোনাস দাও। যেই ব্যবসা জেঁকে উঠল অমনি নানান দাবিতে বন্ধ। তাই বাইরের লোক না নিয়ে নিজেদের ভাই-ভগগোর, বউ-ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিজেরাই খাটছি। সংসারে টানাটানি, তাই ব্যবসার কড়ি ফুরিয়ে যায়। সরকারি লোন পেতে গেলে প্রধানবাবুদের পার্টির লোক হওয়া চাই'।

মহাদেব মণ্ডল একটা ব্রাশ দিলেন। দাম দিতে গেলে নিলেন না। ইলেকট্রিকের বাবুরা এসেছেন বারুইপুর মেন লাইন থেকে। গ্রামের হাঁটুরে পথে ইট পড়েছে।

ভরত দাস বললেন, 'অধিকাংশ ব্রাশ ব্যবসায়ীর কাছে দাদন খাটাচ্ছে বড় একজন মহাজন। ধরুন, বাটা কোম্পানি এক গ্রোস মালে দাম দেয় দেড়শো টাকা—সেটা অর্ডার ধরেছেন মহাজন অনন্ত মণ্ডল—বছরে বিশ লাখ ব্রাশ দেবেন, গ্রোসে এবার পঁচাত্তর টাকা দাম দেবার ওয়াদা করে অনন্তবাবু টাকা দাদন দিলেন। শ্রাবণ ভাদ্দর আশ্বিনের অভাবের দিনে টাকা দিলেন, মাল নেবেন সেই মাঘ-ফাল্গুনে। তখন হয়তো আরও মালের দাম উঠেছে কিন্তু ঐ আগের রেটে মাল দিতে হবে। চুরি করে মাল বেচলে মান-অপমান হতে হয়। র' মেটিরিয়াল কেনার হয়তো পয়সাই নেই তখন।

সমবায় গড়ে উঠল—তাও ভাল চলছে না। জার্মানীর একটা সংস্থা সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু মহাজনের কাছে অনেকের টিকি বাঁধা আছে আগে থেকে।'

মেশিনে বোর কাটছে ইলাহি বক্স—কপালে নামাজ পড়ার দাগ—মুখে সাদা দাড়ি—তাঁর বাবুর হাতে গ্রহ ফাঁড়া তাড়াবার জন্যে নীলা, পলা, গোমেদ, পোখরাজের পাঁচটা আঙটি—রেস খেলেন ভদ্রলোক, খবরের কাগজের আদ্যপ্রান্ত পড়েন, চশমার আড়ে দেখলেন যখন ইলাহি বক্সকে শুধোলাম, 'আপনাদের রোজ কি রকম?'

বাবু বললেন, 'আমাকে জিজ্ঞেস করুন কি চাই আপনার?'

বললাম, 'ব্রাশের একটা কারখানা যদি সরকার খোলে রাজ্যের গরিব কর্মীদের নিয়ে কেমন হয়?'

নিশীথবাবু বললেন, 'গরিবদের সরকার তা করতে পারে। মন্দ যুক্তি নয়। তাদের কাছ থেকে মাল কিনতেও বাধ্য করবে কিন্তু কম দামে ভাল মাল দেবে তো? মজুরি বাড়াবার জন্যে লাগাতার ধর্মঘট লাগবে না? সরকার ঘাটতি ব্যবসায় কতদিন বাড়তি টাকা দেবার দুঃখ খেঁচবে? সরকারি কোন্ ব্যাবসাটাই ভাল চলছে? আর এই যে ইলেকট্রিকের ওপর ব্যবসার ভরসা—সেটা ক'ঘন্টা থাকে? গাছের মূলেই যখন গণ্ডগোল, মাথায় ফুল ফোটে কি করে? দু'নম্বরী না করে এদেশে বাঁচার উপায় আছে? তাতেই তো বুদ্ধি বাড়ছে আমাদের। আর প্রাণে বাঁচার জন্যে বিশটা পার্টিকে আমাদের চাঁদা দিতে হয় না?

ইলাহি বক্স হঠাৎ মেশিন বন্ধ করে বললে, 'সেইজন্যেই তো অনেক মানুষের দেবতা এখন শয়তান আজাজিল।'

বাক্স ভরা, পেটি বাঁধা এত ব্রাশ যায় কোথা গাড়ি ভর্তি হয়ে? লোকে কি শুধু ব্রাশই ঘষছে সারাদিন ধরে?

সদাই হাসি মুখ চাঁদি ফাঁকা সাদা চুল কালো চেহারার তিনমাথাঅলা বুড়ো হোসেন মিয়া বললেন, 'সবচেয়ে দামী হল প্লাসটিক পেস্টের ব্রাশ। এক জাতের বুনো শুয়োরের ঘাড়ের সাত আট ইঞ্চি লম্বা শক্ত লোম থেকে এটা তৈরি হয়। এই লোমের ভরি একশো টাকা। একটা ব্রাশের দাম পঞ্চাশ টাকা থেকে সত্তর টাকা। ঘোড়া, গরু, মোষ, উট, শিয়াল, খ্যাঁক-শিয়ালের লেজ থেকেও ব্রাশ হয়। উটের লোমের ভাল তুলি হয়। আমরা তুলি করে দিলে তবেই তো পৃথিবীর সব চিত্তির বিচিত্তির ছবি আঁকা হয়। সাগরের জলে ভাসল যে 'হংসমিথুন' জাহাজটা তার অমন সাদা ধবধবে রঙটা হল কি করে? আমাদের হাতের ব্রাশ দিয়ে।